প্ল্যাটফরম

ত্রিপুরার গল্পকারদের
পঞ্চম ছোটগল্প সংকলন
২০১১
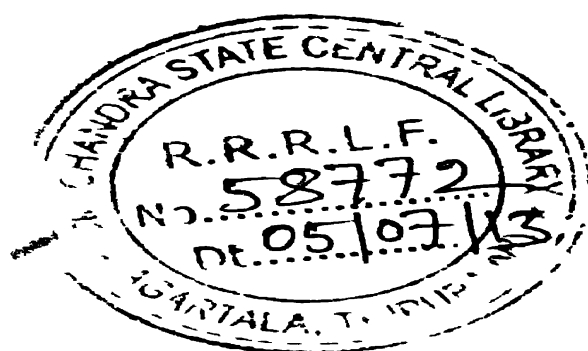
সম্পাদনা : চুনী দাশ

কাকলি প্রকাশনী
আগরতলা ত্রিপুরা

প্ল্যাটফরম

PLATFORM

a Collection of Bengali Short-storines of Tripura

প্রথম প্রকাশ	ঃ	ডিসেম্বর ২০১১
প্রচ্ছদ	ঃ	প্রবীর সাহা
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	মমতা গোস্বামী (বণিক) ধলেশ্বর রোড নং ৮, আগরতলা।
প্রকাশক	ঃ	কাকলি প্রকাশনীর পক্ষে পারুল দাশ কর্তৃক ধলেশ্বর নতুনপল্লী রোড নং ৭, আগরতলা ৭৯৯০০৭, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ফোন (০৩৮১) ২৩২ ১৮৪৭
মুদ্রক	ঃ	বেঙ্গল লোকমত প্রকাশন ১০ বি, ক্রিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪

মূল্য ঃ ৮৫ টাকা

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

বিভাস পাল চৌধুরী : ১৯৪২ সালে শ্রীহট্ট জেলার (বাংলাদেশ) ফুলবাড়ি নামক গ্রামে জন্ম। স্বনামধন্য ডাক্তার। ডাঃ বি আর পাল চৌধুরী, এম বি বি এস, এফ আই এইচ এফ (লন্ডন), ত্রিপুরা সরকারের হেলথ সার্ভিস-এর অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম-অধিকর্তা। ধর্মনগর মহানাম সেবা সদন নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্যানুরাগী। কবিতা, গল্প রচনা প্রিয় নেশা।

সুখেন্দু দাস : ১৯৪১ সালে কুমিল্লার (বাংলাদেশ) নলধারোরা নামক গ্রামে জন্ম। তেলিয়ামুড়া বিবেকানন্দ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক। ১৯৯৯ সালে শিক্ষকতার জন্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত। সাহিত্যানুরাগী। তার লেখা— ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, শিশু শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা, কালচক্র (কাব্যগ্রন্থ), জি বি হাসপাতালে আটান্ন দিন, উৎকৃষ্ট রচনা। সাহিত্য রচনা ও সমাজসেবা তাঁর প্রিয় নেশা।

প্রহ্লাদ দাস : ১৯৪০ সালে নরসিংদী (বাংলাদেশ) পূর্ব দত্ত পাড়া নামক স্থানে জন্ম। ত্রিপুরা সরকারের হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, সবজি বাগান ও ফুল বাগান করা, পশুপাখি পালন প্রিয় সখ এবং গল্প রচনা প্রিয় নেশা।

সোমনাথ চক্রবর্তী : ১৯৪৬ সালে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশ) দিগম্বরীতলা নামক গ্রামে জন্ম। রানিরবাজার বিদ্যামন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। সাহিত্যানুরাগী। গল্প, কবিতা রচনা প্রিয় নেশা।

গোপাল বিশ্বাস : ১৯৬২ সালে তেলিয়ামুড়ার (পশ্চিম ত্রিপুরা) উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম। কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগে স্নাতক। বর্তমানে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সাহিত্যানুরাগী। গল্প, কবিতা, নাটক রচনা প্রিয় নেশা।

নৃপেন্দ্র কুমার রায় : ১৯৪১ সালে শ্রীহট্ট জেলার (বাংলাদেশ) কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে জন্ম। আগরতলার স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির বিষয় শিক্ষক। তাঁর লেখা— অতি সহজে ইংরেজি শিক্ষার মূল কথা, **Pleasing Didactic Stories** ছাত্র ও পাঠকমহল প্রশংসিত।

চুনী দাশ : ১৯৩৬ সালে শ্রীহট্ট জেলার (বাংলাদেশ) মোড়াকরি নামক গ্রামে জন্ম। ত্রিপুরা সরকারের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক। কাকলি প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা। ছোটদের এবং বড়দের ছড়া কবিতা গল্প রূপকথা উপকথা পরমকথা ইত্যাদি বহু বইয়ের লেখক।

বিভাস পাল চৌধুরী

সঞ্জয়

সঞ্জয় ক্লাশ এইটে পড়ে। বিক্রম বাহাদুর পাড়ায় তার বাড়ি। সে গ্রামের স্কুলেই পড়ে। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। খেলাধুলোয় তার খুব ভাল দখল। যেমন ফুটবলে তেমন ক্রিকেটে। এথলেটিকস এবং সাঁতারেও সে সমান পারদর্শী। সে স্কুলের ও গ্রামের গর্ব। প্রতিবৎসর তার দৌলতে অনেক পুরস্কার আসে স্কুলে। শুধু স্কুল এবং গ্রামে নয়, সে সমস্ত জেলাতেই এক পরিচিত নাম।

ফুটবল সঞ্জয়ের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলে। ডান ও বাম পা তার সমান চলে। বল তার পায়ে পড়লে দুই-তিন জন বিপক্ষ খেলোয়াড় তার কাছে কিছুই নয়। ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্টে গত বৎসর সে শ্রেষ্ঠ ফুটবলার এবং গোলদাতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার খেলার মান এবার আরও বেড়েছে। রাজধানীর বড় ক্লাবগুলির নজর তার দিকে। যে কোন মূল্যেই তাকে তুলে নিতে রাজি তারা। সঞ্জয় পড়াশুনা শেষ না করে স্কুল ছাড়তে রাজি নয়। তাই কোন প্রলোভনকে সে আমল দেয়নি।

ক্লাশ নাইনে যখন পড়ে তখন তার খেলার মান সেরা। রাজধানীর এক বড় ক্লাব প্রচুর টাকা দিয়ে বায়না করেছে তাদের ক্লাবে খেলার জন্যে। পড়াশুনার দায়িত্বও তারা নিতে চায়। হোষ্টেলে রেখে পড়াশুনা করাতে রাজি তারা।

সঞ্জয় ক্লাবের কর্মকর্তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু পড়াশুনা সে গ্রামের স্কুলেই করবে। মাধ্যমিক পাশ করার আগে সে গ্রামের স্কুল ছেড়ে শহরে যাবে না পড়তে। স্কুলের প্রতি তার ভীষণ ভালবাসা। স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্ররা : ‚ এত ভালবাসে যে সে তাদের ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকতে পারবে না।

ক্লাবের হয়ে খেলায় সে খুব নাম করলো। টুর্ণামেন্টে শ্রেষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে চিহ্নিত হলো সে। স্কুলের এবং গ্রামের মানুষ এতে খুব খুশি।

ক্লাশ টেনে যখন পড়ে তখন মাষ্টারমশাইরা তাকে খেলাধুলোর সাথে সাথে পড়াশুনোয়ও মনোযোগ দিতে বলেন। পরের বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই ভাল প্রস্তুতির জন্যে শিক্ষকরা তাকে আলাদা কোচিং এর ব্যবস্থা করেন।

খুব কষ্ট হলেও সঞ্জয় খেলাধুলোর সাথে পড়াশুনাও সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে থাকে। মাষ্টারমশাইদের সাহায্য এবং স্পেশাল কোচিং-এ ভাল পরীক্ষা দেয় সঞ্জয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন পড়াশুনোর কোন চাপ নেই। তাই সঞ্জয় খেলায়

স্পেশাল কোচিং নেয়ার জন্য রাজধানীতে চলে যায়। সেখানে ফুটবল ক্রিকেটের সাথে দৌড় ও সাঁতারের প্রশিক্ষণও নেয়। ফলও পায় আশানুরূপ। দৌড় প্রতিযোগিতায় সে দ্রুততম পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অনুরূপ সে সাঁতারেও শ্রেষ্ঠ পদক জিতে নিয়েছে।

এখন সঞ্জয় রাজ্যের খেলার জগতে এক গালভরা নাম। সঞ্জয়ের নাম জানে না এমন লোক রাজ্যে খুব কমই আছে।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সঞ্জয় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। সঞ্জয়ের পরীক্ষার ফল দেখে তার মা-বাবা খুব খুশি। খুশি হয়েছেন স্কুলের শিক্ষক। তাকে রাজধানীতে গিয়ে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে তাঁরা পরামর্শ দেন।

সঞ্জয় আগেই ঠিক করে রেখেছে রাজধানীর একটি ভাল স্কুলে ভর্তি হবে এবং পুরোনো ক্লাবের হয়েই খেলবে। পুরোনো ক্লাব তার পড়াশুনার খরচা, থাকা এবং খাওয়ার দায়িত্ব নেবে বলেছে।

শহরে যাবার আগে স্কুল থেকে সঞ্জয়কে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করে। এই বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সঞ্জয়ের এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সে বুঝতে পারে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমশাইরা এবং গ্রামের মানুষ তাকে কত ভালবাসেন।

শুভদিন দেখে সঞ্জয় শহরে চলে যায় এবং রাজধানীর একটি ভাল স্কুলে সে ভর্তিও হয় ।পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাধুলোয়ও সে মনোযোগ দেয়। ভালো কোচের অধীনে সে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার তালিম নিতে থাকে।

খেলাধুলোয় তার অনেক উন্নতি হয়েছে। তার খেলা দেখার জন্যে এখন লোক দল বেঁধে মাঠে আসে।

এভাবে খেলার জগতের শীর্ষ স্থানটি সে দখল করে নেয়। দুই বৎসর এভাবে চলার পর সঞ্জয় কিছু কিছু অসুস্থতা অনুভব করতে থাকে। পায়ের বুড়ো আঙুলের গোড়াতে একটা জায়গায় অনুভূতির অভাব বোধ করে। জায়গার পরিধি দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ডান পায়ের জোরটাও একটু কম অনুভব করে। প্রথম প্রথম এসব গায়ে মাখেনি সঞ্জয়। ভেবেছে কোন চোট থেকে এরকম হয়েছে। সেরে যাবে বলে প্রায় দু'মাস অপেক্ষা করে।

পায়ের অবশতা একদম কমলো না বরং আরও একটু বেড়ে গেলো। কিছুদিন পর সঞ্জয় দেখে অবশ জাগয়াটার মাঝখানে একটি ছোট ঘায়ের মত হয়েছ। ঘাবড়ে যায় সঞ্জয়। সে স্থানীয় ঔষধের দোকান থেকে কিছু ঔষধ এনে ঘায়ের জায়গাটাতে লাগায়।

নিরাময়ের আশায় সঞ্জয় অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ভাল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখে না সে। খেলাধুলো করতে তার খুব অসুবিধে হয়। পায়ের জোর কমে যাওয়ায় পায়ের সূক্ষ্ম কাজ করতে তার কষ্ট হয়।

সব সময় জুতো এবং মোজা পরেই থাকতে হয় তাকে যাতে পায়ে কোনো চোট না লেগে যায় এবং ঘাটা অন্যরা দেখতে না পায়। এভাবে কিছুদিন চলে। খেলাধুলোয় যোগদান করছে না দেখে অনেকে অনেক কিছু ভাবে এবং বলে। চিকিৎসায় কোন পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয় বাড়িতেই চলে যাবে। ওখানে স্থানীয় ডাক্তার দিয়েই চিকিৎসা করাবে। সে ছোটবেলায় দেখেছে গাছের লতাপাতা ব্যবহার করে এরকম অনেক রোগীই সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সুস্থ হওয়ার আশায় সে শহর ছেড়ে বাড়িতে চলে আসে। বাড়িতে এসে প্রথমেই সে স্থানীয় একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করে। চিকিৎসক মহাশয় তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভাল হয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন। কিছু ঔষধ খাওয়ার জন্যে এবং লাগানোর জন্যে দেন।

স্থানীয় চিকিৎসকের ঔষধ একমাস একমাস করে তিনমাস ব্যবহার করে সঞ্জয়। কোন পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এদিকে রাজধানীর ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাকে তাড়াতাড়ি শহরে যেতে অনুরোধ করে খবর পাঠিয়েছে।.তার অভাবে ক্লাবের অবস্থা এবার খুব খারাপ।

সঞ্জয়ের অসুস্থতার খবর গ্রামে, পাহাড়ে চাউর হয়ে গেছে। অনেকেই তাকে দেখতে এসেছেন। নানারকম পরামর্শও দিয়েছেন ওঁরা। গ্রামে এক বন্ধুর বাবা তাকে দেখতে এসে কেঁদেই ফেলেছেন। তিনি মানত করেছেন, সঞ্জয় সুস্থ হলে কালীপুজো দেবেন।

পাড়া থেকে তার এক আত্মীয় তাকে দেখতে এসে বলেন, চিকিৎসা তো হলো অনেক, কিন্তু কিছুই তো হলো না! এবার অন্য লাইনে একটু চিন্তা করা দরকার। কোন অপদেবতা ভর করছে হয়তো তাই কোন কাজ হচ্ছে না।

তিনি সঞ্জয়ের বাবাকে পুজো দেয়ার কথা বলেন এবং এও বলেন, পুজোর সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। সঞ্জয়কে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে হবে।

সঞ্চয়ের অসুস্থতা গ্রাম ও পাহাড়ের মানুষের কাছে একটা অশান্তির কারণ হয়ে গেছে। কিভাবে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে সেটাই এখন সবার চিন্তার বিষয়।

সঞ্জয়ের সুস্থতার আশায় গ্রামে পুজোর আয়োজন হয়ে গেলো। পুজো যাতে নিষ্ঠার সাথে হয় তার জন্য বিশিষ্ট পুরোহিত আনা হয়েছিল বাইরের এক বড় মন্দির থেকে। কোন ত্রুটি হয়নি পুজোর। গ্রামের পাহাড়ের মানুষ সবই যোগ দিয়েছন এই পুজোয়। ঠাকুরের কাছে তাদের একান্ত প্রার্থনা সঞ্জয়কে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন।

সব চেষ্টাই করা হলো । কিন্তু সঞ্জয়ের সুস্থতার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। পায়ের ঘায়ের আরও বিস্তৃতি হয়েছে। অবশতা আরও বেড়েছে। পায়ের জোরও কমে গেছে।

সঞ্জয়ের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেলো। তবে কি সে আর ভাল হবে না কোনদিন?

এভাবেই কি তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে? কি এমন হলো যে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চুপচাপ বসে বসে শুধু চোখের জল ফেলে আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

সঞ্জয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে তার পুরোনো স্কুলের শিক্ষকমশাইরা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একদিন তারা সবাই সঞ্জয়কে দেখতে এলেন। সঞ্জয় তাঁদের দেখে খুব খুশি। সবাইকে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁদের কাছে আশীর্বাদ চাইলো। সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে চায়। এভাবে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আর সে পারছে না। শিক্ষকমশাইরা তাকে আশীর্বাদ করলেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করলেন, সঞ্জয়কে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন।

একজন শিক্ষক সঞ্জয়ের পাশে এসে বসলেন। পায়ের মোজা খোলে তার পায়ের ক্ষতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তার মনে হলো তিনি এরকম একজন রোগী দেখেছেন তার গ্রামে। চিকিৎসার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

তিনি সিদ্ধান্ত নেন আর দেরি না করে কালই সঞ্জয়কে নিয়ে একজন ভাল চিকিৎসকের কাছে যাবেন। তাঁর একজন পরিচিত চিকিৎসক আছেন তাঁর কাছেই প্রথম নিয়ে যাবেন তাকে।

ডাক্তারবাবু সঞ্জয়কে পরীক্ষা করেন । তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেন পায়েব ঘা-এব সাথে অন্য কোন অসুবিধে আছে কিনা।

পরীক্ষায় ধরা পড়ে দুই পায়ের নার্ভগুলো শক্ত হয়ে গেছে। সেটা খালি হাতে অনুভব করা যায়। এই নার্ভগুলো কাজ করছে না, তাই পায়ের অবশতা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ডাক্তারবাবু বুঝে গেলেন সঞ্জয়ের কুষ্ট রোগ (Leprosy) হয়েছে। আর দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার চিকিৎসা শুরু করা দরকার। সঞ্জয়কে তাই পরদিনই মেডিক্যাল কলেজের লেপ্রসি ক্লিনিকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে একটি হাত চিঠিও দিয়ে দিলেন।

পরদিন মাস্টারমশাই সঞ্জয়কে নিয়ে লেপ্রসি ক্লিনিকে গেলেন। লেপ্রসি ক্লিনিকের ডাক্তারবাবু সঞ্জয়ের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনলেন। সঙ্গে ডাক্তার দত্তের দেয়া চিঠিটাও পড়লেন।

লেপ্রসি ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার দাসেরও ধারণা সঞ্জয়ের লেপ্রসি হয়েছে। পায়ের ঘা থেকে একটা অংশ নিয়ে পরীক্ষার জন্যে পাঠালেন। রিপোর্ট আসতে প্রায় তিন দিন লেগে যাবে। সঞ্জয় যাতে এই ক'দিন বিনে চিকিৎসায় না থাকে তার জন্যে কিছু ঔষধ দিলেন।

তিনদিন পর সঞ্জয় রিপোর্টের জন্য ডাক্তার দাসের ক্লিনিকে এলো। সঞ্জয়ের রিপোর্ট ডাক্তার দাসের কাছে আগেই এসে গেছে। রিপোর্টে তার লেপ্রসি হয়েছে বলেই বলা হয়েছে। সঞ্জয়ের রোগ ধরা পড়েছে। এখন চিকিৎসা শুরু করলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ডাক্তার দাস সঞ্জয়কে একমাসের ঔষধ দিয়ে একমাস পর আবার আসতে বলেন।

কুষ্ঠরোগ হয়েছে শুনে সঞ্জয় একদম মুষড়ে পড়েছে। সে শুনেছে কুষ্ঠরোগ হলে কেউ আর ভালো হয় না। সমস্ত জীবনই তাকে পুঙ্গ হয়ে থাকতে হয়।

কেঁদে ফেলে সঞ্জয়। ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে,আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো তো ডাক্তারবাবু? যদি না হই, তা হলে কিভাবে সমস্ত জীবনটা কাটাবো তাও বলে দিন। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো!

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন তার হতাশাগ্রস্ত মনের অবস্থা। বলেন, তোমার রোগ ধরা পড়েছে। চিকিৎসায় তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

তুমি হয়তো জানো না সঞ্জয়, আমি তোমাকে চিনি। তুমি তো আমাদের গর্ব। তোমার মত একজন কৃতি খেলোয়াড়কে সুস্থ করার দায়িত্ব আমাদের। গতকাল তোমার ক্লাবের কর্মকর্তারা আমার কাছে এসেছিলেন। তোমার চিকিৎসার যাতে কোন ত্রুটি না হয় তারজন্যে সব রকম সাহায্য করতে তাঁরা রাজি। আমি তাঁদের আশ্বস্ত করেছি, তোমার জন্য আমি সব করব!

কৃতজ্ঞতায় সঞ্জয়ের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। ডাক্তারবাবুকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে সে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না।

ডাক্তার দাস বুঝলেন, সঞ্জয় মানসিক দিক দিয়ে একদম বিদ্ধস্ত। তাকে রোগ সম্পর্কে আরও বুঝানো দরকার। নাহলে ঔষুধ ঠিক মত কাজ করবে না।

ডাক্তার দাস সঞ্জয়কে পাশের রুমে নিয়ে গেলেন। আলমিরা থেকে কয়েকটি এলবাম বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো দেখো। এই এলবামগুলো আমার নিজের হাতে তৈরি। ছবিগুলো সব আমার রোগীদের। এক এক জন রোগীর চিকিৎসার শুরু থেকে শেষ অবধি ছবিগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে রেখেছি। অধিকাংশ রোগীই তোমার চাইতে খারাপ অবস্থায় এসেছিল। চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

এলবামগুলো সঞ্জয় খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলো। রোগীরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে সে খুব আশ্বস্ত। সেও তাহলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। এতেই তার অসুখের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উপশম হয়ে গেলো।

সঞ্জয় মাষ্টারমশাইকে বললেন, আমি আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি, স্যার। সময়মত ডাক্তারবাবুর কাছে এলে এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতাম।

সঞ্জয় আর দেরি করলো না,পরদিন থেকেই ঔষুধ খেতে শুরু করে দিলো। হাসপাতালে থেকে মাসে মাসে ঔষুধ এনে নিয়মমাফিক খায় এবং ডাক্তার দাসের সাথে যোগাযোগ করে। এভাবে এক বৎসর ওষুধ ব্যবহারের পর সঞ্জয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

ডাক্তারবাবু সঞ্জয়কে আবার পরীক্ষা করেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে ডাক্তারবাবু সঞ্জয়কে জড়িয়ে ধরে বলেন, সঞ্জয়, তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কাজকর্ম, খেলাধুলো তুমি এখন আগের মতই করতে পারবে। আর দেরি করো না, কাল থেকেই মাঠে যাও। প্রেকটিস শুরু করে দাও। অনেক মূল্যবান সময় তোমার নষ্ট হয়ে গেছে!

সঞ্জয় ডাক্তারবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললে, আশীর্বাদ করুন স্যার, যাতে আমি পুরেনো দিনগুলি আবার ফিরে পাই।

আব্দুল রফিক

উনিশ শ' একাত্তর সাল। বাংলাদেশ (পূর্বতন পূর্ব পাকিস্থান) স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন — আমাদের এ লড়াই স্বাধীনতার লড়াই, এই লড়াই বাঁচার লড়াই। আপনারা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন ইত্যাদি। শেখ মুজিবর রহমানের এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলো না বাংলাদেশের যুবক বৃদ্ধ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের আপামর জনতা। লোক দলে দলে মুক্তিফৌজে যোগ দিলো। দেশকে স্বাধীন করাই তাদের একমাত্র কথা, একমাত্র চিন্তা।

অন্যদিকে পাক সেনারা এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে, প্রতিহত করতে মরিয়া। তারা বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে। সাধারণ মানুষও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দল বেঁধে পাক সেনারা গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে হত্যা করছে নির্বিচারে। মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, শ্লীলতাহানি করছে। পাশবিক অত্যাচারে বৃদ্ধরা, শিশুরাও বাদ পড়ছে না।

ভয়ে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতবর্ষে আশ্রয় নিচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার অতিক্রম করে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় এসে দলে দলে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ।

ভারত সরকার এই নিরীহ লোকগুলিকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করছে। বিভিন্ন স্থানে রিলিফক্যাম্প খুলে, মেডিক্যাল টিম তৈরি করে তাদের খাওয়া থাকার ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের প্রায় আটশ' কিলোমিটার আন্তর্জাতিক বর্ডার। এই বর্ডার অতিক্রম করে আর্ত মানুষ অবিরাম এসে রাজ্যে ঢুকছে। এ রাজ্যের লোকজন তাদের স্বাগত জানাচ্ছে, আপন করে নিচ্ছে।

এসময় ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সাথে মুক্তিফৌজ ও আওয়ামী লিগের রাজনীতিবিদরাও এসেছেন।

সমস্ত রাজ্যে তখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। নিত্যনতুন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল রাস্তাঘাটে। সাথে অসুস্থ মানুষও আসছেন চিকিৎসার জন্যে। স্বাস্থ্য দপ্তরে তখন এক জরুরি অবস্থা। সমস্ত হাসপাতালগুলির ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্টাফদের ছুটিছাটা বন্ধ।

আমি তখন জি বি হাসপাতালে সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। প্রতিদিন প্রচুর রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। এদের মধ্যে একটি ভাল সংখ্যকই বিভিন্নভাবে পাকিস্থানের সেনাদের হাতে নিগৃহীত হয়ে, মাইন ফেটে, পাক সেনার গুলিতে বা মারধরের জন্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। এসব ছাড়া মেয়েদের ওয়ার্ডে বিভিন্ন যৌন হেনস্তার শিকার হয়েও ভর্তি হয়েছে প্রচুর সংখ্যায় মহিলারা ও মেয়েরা।

সর্বশক্তি দিয়ে আমরা এদেরে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, চিকিৎসাও করছি। সার্জিক্যাল ও অর্থপেডিক ডিপার্টমেন্টের ডাক্তাররা দিনে বার ঘণ্টা করে হাসপাতালে ডিউটি দিচ্ছেন। আমিও তাদের মধ্যে একজন। বাড়িতে থাকি বার ঘণ্টা আর হাসপাতালে বার ঘণ্টা।

আত্মরক্ষার জন্যে প্রতি বাড়িতেই একটি ট্রেন্স বা বাংকার কেটে রাখা হয়েছে। বিপদের সময় আশ্রয় নেয়ার জন্যে। অবসর সময় একটা কথা সব সময় খুব মনে পড়তো, কি হবে আমাদের ? যুদ্ধ লাগলে পাক সেনারা তো আমাদের ক্ষমা করবে না। পাক সেনার কাছে তো আমরাও শত্রু। তবে একটাই সান্ত্বনা ছিল যে, আমরা তো তাদের কোন ক্ষতি করছি না। অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা করিছ, সাহায্য করছি। এই চিন্তা আমাদের মনের জোর অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

একদিন দুপুরে যখন ইমার্জেন্সিতে বসে কাজ করছি তখন কসবা (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলের একজন নাগরিক তলপেটে বুলেটের আঘাত নিয়ে ইর্মাজেন্সিতে এলো। পরীক্ষা করে দেখলাম তলপেটে একটি গুলির আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু গুলি বেরিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই। ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম আঘাতটা প্রায় চব্বিশ ঘন্টার পুরানো। বুলেটটা পেটের ভেতরেই রয়ে গেছে। নাভির নিচের অংশটাতে বেশি ব্যথা। শক্ত হয়ে আছে জায়গাটি। কিন্তু বুলেটের আঘাতের পর যে রকম খারাপ অবস্থা হওয়ার কথা সে রকম কিছু হয়নি।

সিদ্ধান্ত নিলাম এখন অপারেশন করব না। অপারেশন না করেই চিকিৎসা করব। যন্ত্রণা আস্তে আস্তে কমে আসছিল। প্রস্রাবের সাথে রক্তপাতও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেলো। এক্সরে করে দেখলাম বুলেটটা পেটের ভেতরেই রয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম দু চারদিন পর শরীরটা আরও একটু ভাল হলেই অপারেশন করবো।

দু'দিন পর আমি ওয়ার্ডে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় আমার রোগী আব্দুল রফিক হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে — তার প্রস্রাবের রাস্তায় এসে কি যেন একটা আটকে গেছে। এতে প্রস্রাব করতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

পরীক্ষা করলাম রফিককে। দেখলাম একটা শক্ত জিনিস তার প্রস্রাবের মুখে এসে আটকে গেছে। এটাকে বের করে না দিলে সে প্রস্রাব করতে পারবে না। জরুরি ভিত্তিক অপারেশনই করতে হবে।

রফিককে অপারেশন থিয়েটার নিয়ে গেলাম। প্রায় দশ মিনিট লাগলো অপারেশন শেষ করতে। একটি ঝকঝকে সুন্দর মার্বেলের মত মসৃণ বুলেট বেরিয়ে এলো তার প্রস্রাবের রাস্তা থেকে। বুলেটটি দেখে অবাক হয়ে গেলাম; বুলেট অনেক দেখেছি। সব বুলেটই সামনের দিকে সরু আর পেছনের দিকটা খুব অমসৃণ থাকে। উদ্দেশ্য আঘাতটা যেন মারাত্মক হয়।

এই বুলেটটা কিন্তু একটু অন্য ধরনের। এত সুন্দর বুলেটটা সংরক্ষণ করে রেখে দিলাম। একটা দর্শনীয় জিনিস হিসেবে সবাইকে দেখাতে পারব। আর মনে একটা ইচ্ছা, আমার বন্ধু মিলিটারী ডাক্তারকে দেখাব এবং তার মতামত নেব এই বুলেটটা এত মসৃণ কেন?

খবর দিলাম মিলিটারী ডাক্তার বন্ধুটিকে একবার আসার জন্যে। ডাক্তার বন্ধু আসলে তাঁকে বুলেটটা দেখলাম এবং এটা এতো মসৃণ কেন তার কারণ জানতে চাইলাম।

ডাক্তার বুলেট দেখে হেসে বললে— এই বুলেটগুলো এক বিশেষ ধরনের বুলেট। এর উদ্দেশ্য শক্রুপক্ষকে জখম করা, মেরে ফেলা নয়। একজন শক্রুসৈন্য জখম হলে তার পেছনে চারজন সৈন্য রাখতে হয় তাকে শুশ্রূষার জন্য ও অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তাই এই একটি বুলেট দিয়ে পাঁচজন প্রতিপক্ষ সৈন্যকে আটকে রাখা যায়। এই বুলেটের এটাই বিশেষত্ব। ধন্যবাদ দিলাম ডাক্তারবন্ধুকে। তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামতের জন্যে।

রফিক আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলো। আটদিন পর তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। যাওয়ার সময় সে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তার কৃতজ্ঞতা জানালো। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো তার চিবুক বেয়ে। বলল, ডাক্তারবাবু, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনার ঋণ জীবন দিয়েও শোধ করতে পারবে না। **(বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিতে ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমি হতে নেয়া আমার এই ছোটগল্প)**

চন্দ্রা

কিছুদিন হলো সুলেখার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। মেয়ের বিয়ের পর শারীরিক এবং মানসিক ভাবে একদম বিদ্ধস্ত হয়ে পড়েছে সে। সুলেখার শরীর কোন দিনই খুব সুস্থ ছিল না। প্রায়ই গিঁটে গিঁটে ব্যথা হতো। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে। সুলেখার গেঁটে-বাত হয়েছে বলে ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, নিয়ম মেনে এবং ওষুধ খেয়ে থাকতে হবে সমস্ত জীবন।

সুলেখা মাঝে মাঝে মানসিকভাবে একদম ভেঙ্গে পড়ে। ভাবে সমস্ত জীবন এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন। এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। মেয়ের বিয়ের আগে মেয়েই সব কাজকর্ম সামলে নিতো। সুলেখা মোটামুটি বিশ্রাম পেতো। এখন সেটা আর হয় না। সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করতে হয়। খুব কষ্ট হয় তার। এভাবে কতদিন চালাতে পারবে এটাই তার দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে স্বামী ও ছেলে বিপুল তাকে সাহায্য করে। কিন্তু তারা তো পুরুষ মানুষ, কত সময় আর বাড়িতে থাকতে পারে তাকে সাহায্য করতে। তাদেরও তো কাজকর্ম আছে।

সুলেখার স্বামী বারীন বিশ্বাসের আর্থিক অবস্থা তত ভালো নয়। কৃষিকাজের উপরই নির্ভরশীল। বড় ছেলে বিপুল সকালে কৃষি কাজ করে, আর বিকেলে স্থানীয় বাজারে সব্জীর দোকান চালায়।

সুলেখার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, এতে বারীন খুব অশান্তিতে আছে। শরীরের অবস্থা দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে। চলাফেরা করতে পারে না একদম। কষ্ট করে কাজ করলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়। কাজ করলে পরদিন বিশ্রাম করতে হয়। সেদিন ঘরের কাজ বারীনকে না হয় ছেলে বিপুলকেই করতে হয়।

বারীন ভাবে এভাবে তো সংসার চালানো মুশকিল। বিপুলের বয়স তো বাইশ বছর হয়েছে। তার বিয়ের কথা তো এখন চিন্তা করা যায়। নতুন বউ ঘরে আসলেই এসব সমস্যার সমাধান হবে।

বারীন বিপুলের বিয়ের ব্যাপারে সুলেখার সাথে আলাপ করে। বারীনের কথা শুনে সুলেখা হকচকিয়ে যায়। বিপুল তো ঐদিনের ছেলে! জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিয়ে করে কি করে সংসার চালাবে!

বারীন সুলেখাকে বোঝায় — তুমি ঠিকই বলেছ। বিপুলের বিয়ের সময় এখনও হয়নি। কিন্তু আমাদের সংসারের কথা চিন্তা করে তাকে বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে— মেয়েটার মতামত নেয়া দরকার। ওকে

একবার দিন পাঁচেকের জন্যে আমাদের বাড়িতে নাইয়র আনলে কয়েকদিন থেকেও যাবে আর বিপুলের বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করে তার মতামত জেনে একটা সঠিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছা যাবে।

তাই করলো বারীন। মেয়ে কৃষ্ণাকে আনার জন্যে তার শ্বশুরবাড়ি গেলো। কৃষ্ণার শ্বশুরকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে এবং কৃষ্ণাকে সাতদিনের জন্যে নাইয়র নেয়ার জন্য অনুরোধ করে।

কৃষ্ণার শ্বশুর কোন আপত্তি করলেন না বরং কৃষ্ণাকে বারীনের সাথেই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বারীন কৃষ্ণাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো দেখে — সুলেখা খুব খুশি।

সুলেখা কৃষ্ণাকে তার শরীরের অবস্থা, সংসারের কথা এবং বিপুলের বিয়ের ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারার কথা — সব বুঝিয়ে বলে এবং তার মতামত চায়।

কৃষ্ণা মায়ের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে —যদিও বিপুলের বিয়ের এখনও উপযুক্ত সময় হয়নি। তবুও সবদিক চিন্তা করে বিপুলের বিয়ে দেয়াই উচিত। এও বলে, দেরি না করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়াই দরকার।

আলাপের সময় বারীনও উপস্থিত ছিল, তাই মেয়ের মতকে চূড়ান্ত বলেই মেনে নেয় তারা।

গ্রামেই দুই-তিনটি মেয়ে আছে। এরমধ্যে চন্দ্রাকেই বারীনের বেশি পছন্দ। দেখতে শুনতে ভালো, নম্র স্বভাবের, কাজকর্মেও পটু। গরিব ঘরের মেয়ে, তাকেই তার সংসারের জন্যে উপযুক্ত বলে মনে করে বারীন।

সরাসরি চন্দ্রার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় বারীন। চন্দ্রার বাবার কাছে এই প্রস্তাব একদম অপ্রত্যাশিত। এর আগে চন্দ্রার বিয়ের কোন প্রস্তাব আর আসেনি। মেয়ের বয়স তো তেমন হয়নি। ষোলয় পা দিয়েছে মাত্র। তাই কি করবে স্থির করতে পারে না সহজে। তার স্ত্রীকে ব্যাপারটা সবিস্তারে জানায়। বিয়ের প্রস্তাব শুনে মেয়ের মা খুব খুশি। তার দুশ্চিন্তা ছিল, কিভাবে মেয়েটিকে সুপাত্রস্থ করবে। বয়স পনের পার হয়ে ষোল হলেও বাড়ন্ত শরীর দেখলে মনে হয় আঠার উনিশ।

বিয়ের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত হলেও স্বামী-স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেয় এই আলাপটা হাতছাড়া করা সঠিক হবে না। বিপুল তাদের গ্রামের ছেলে এবং খুব পরিচিত। পাত্র হিসেবে বিপুলকে সবাই পছন্দ করবে। খুব ভদ্র ছেলে। স্বভাব চরিত্রও ভালো। তাই এমন ছেলে হাত ছাড়া করতে রাজি নয় তারা । সম্মত হয়ে যায় এই প্রস্তাবে। প্রস্তুতির জন্য তিন মাস সময় চেয়ে নেয় বারীনের কাছ থেকে।

শুভদিনে বিপুল আর চন্দ্রার বিয়ে হয়ে গেলো। তারা দু'জনই খুব খুশি এ বিয়েতে। বিয়ের পর একজন আরেক জনকে পূরক হিসেবে ভাবে তারা। ছেলে ও বৌ এর এত মিল

দেখে বারীন ও সুলেখা খুব খুশি। মেয়েটা কাজকর্মে খুব পটু। তাই বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে সংসারের দায়িত্বটা চন্দ্রাকে দেয়ার কথা চিন্তা করে সুলেখা।

একদিন সুলেখা চন্দ্রাকে ডেকে বলে—আমার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। চলাফেরা ঠিকমত করতে পারি না। এ অবস্থায় তোমাকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি তো নতুন এই বাড়িতে এসেছো, এত তাড়াতাড়ি তোমাকে এই দায়িত্ব দিতাম না। আমার শরীরের কথা চিন্তা করে তোমাকে সব দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না।

চন্দ্রা চুপ করে সব শুনে। শাশুড়িকে বলে—এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব তো মা। আমার ভয় হচ্ছে, তবে আপনি পাশে থাকলে যে কোন দায়িত্বই আমি নিতে পারব। আপনার অসুস্থ শরীর নিয়ে আর কাজ করার প্রয়োজন নেই। আমি সব দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। আমাকে কি করতে হবে শুধু বলে দেবেন।

চন্দ্রার কথা শুনে আশ্বস্ত হয় সুলেখা। ভাবে, এই মেয়েই তার সংসারের হাল ধরতে পারবে। এটাই তো সে চেয়েছিলো। বিষয়টা বারীনকে জানায়।

বারীন ও নতুন বউ এর চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট। সে এক কথায় রাজি হয়ে যায়। দেরি না করে আস্তে আস্তে সংসারের দায়িত্ব চন্দ্রাকে বুঝিয়ে দিতে বলে।

সুলেখা এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। কাজকর্ম সব চন্দ্রাই করে ফেলে। তাই তার বিশ্রাম হয়, যা তার শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিলো।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, তবুও চন্দ্রা বেশ মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। দেখলে মনে হয় এটা তার অনেক পুরোনো বাড়ি এবং এই বাড়ির জন্যই তার জন্ম হয়েছে। একটা ব্যাপারে চন্দ্রা খুব অনভিজ্ঞ । বিবাহিত জীবনে কি ভাবে নিরাপদে থাকবে সে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। কেউ তাকে কিছু বলেও দেয়নি। বিপুলও এ ব্যাপারে চন্দ্রার মতই।

প্রথম সন্তান কখন আসবে, এ ব্যাপারে কোন পরামর্শ করেনি কারো সাথে। একটা অস্পষ্টতা, একটা লজ্জা তাদের পেয়ে বসেছে। কার সাথে আলাপ করবে তার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তাই চুপ করেই থাকে। ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হলো। বিয়ের তিনমাস পরই চন্দ্রা সন্তানসম্ভবা হয়ে গেলো। ইচ্ছা ছিল না, তবুও হলো।

চন্দ্রার বয়স মাত্র ষোল বছর হয়েছে। এখনও শরীরের গঠন সম্পূর্ণ হয়নি, এর মধ্যে সন্তান এসে গেছে। এখন সে কি করবে ? দুশ্চিন্তায় সে একদম অস্থির হয়ে পড়েছে। বাড়িতে পরামর্শ করার মতও কেউ নেই। পাড়াপড়শি কারো সাথে এমন ঘনিষ্ঠতাও হয়নি, যাকে এ ব্যাপারটা খুলে বলতে পারে। তার পরামর্শের একমাত্র পাত্র বিপুল। সে চন্দ্রার চেয়ে আরও আনাড়ি। সব শুনে চুপ করে থাকে। কি করবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই এভাবেই থেকে গেলো তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

কিছুদিন পর চন্দ্রার কিছু উপসর্গ দেখা দিলো। কিছুই খেতে পারে না সে। সকালবেলা

ঘুম থেকে ওঠার পরই বমি করে। ভাল লাগছে না বলে অধিকাংশ সময়ই শুয়ে থাকে। সংসারের দায়িত্ব তার উপর তাই কষ্ট করে কাজ সামলায়।

বিষয়টা সুলেখার নজরে আসে। সুলেখা বুঝে ফেলে চন্দ্রা সন্তানসম্ভবা। এত তাড়াতাড়ি সন্তান আসাটা মেনে নিতে পারে না সুলেখা। ব্যাপারটা বারীনকেও জানায়। বারীন চন্দ্রাকে খুব স্নেহ করে। এত তাড়াতাড়ি সন্তান আসাটা সেও মেনে নিতে পারলো না। মেয়েটার বয়স মাত্র ষোল বৎসর হয়েছে, নিজের শরীরের গড়ন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার উপর সন্তানের সম্ভাবনা, মেয়েটার শরীরের উপর খুব ধকল যাবে।

চন্দ্রার শরীর একদম ভাল যাচ্ছে না। কিছুই খেতে পারে না। প্রায়ই বমি করে। একদম কাহিল হয়ে গেছে। সুলেখা তাকে বোঝায়, প্রথম তিন মাস এরকম হয়। তারপর ঠিক হয়ে যায়। তারও এরকম হতো, তাই ভয়ের কিছু নেই। এভাবে কষ্ট করে তিন মাস কেটে গেলো।

চন্দ্রা এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। খেতে পারে। গা গোলানো, বমির ভাব, দুর্বলতা আগের চেয়ে অনেক কম। কাজকর্মও কিছু কিছু করতে পারে। সুলেখাও কিছু সাহায্য করে, এভাবেই সংসার চলে।

আরও তিনমাস চলে গেলো এভাবে। বিপুল এখন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। মার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সে।

বিপুল একদিন মাকে বলে — মা চন্দ্রাকে তো কোন ডাক্তার দেখানো হলো না। এ ব্যাপারে, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে বলবে।

সুলেখা বিপুলকে বলে — দেখ্, আমার তো দুটো সন্তান হয়েছে, কোন ডাক্তার তো দেখাই নি। সবই তো স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে। তুই এ ব্যাপারে ভাবিস না, যা করার আমিই করব।

সুলেখা চন্দ্রকে একজন গ্রামের ধাইকে এনে দেখায়। ধাই কিছু ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা দেয় এবং স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব হবে বলে আশ্বস্ত করে।

ধাই এসে মাসে মাসে চন্দ্রাকে দেখে যায়। কিছু ওষুধ পত্র দেয়, সঙ্গে দুটো টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকসনও দেয়। ওষুধ ব্যবহার করে চন্দ্রার সমস্যা কিছু কমে। তবে শরীর দুর্বল লাগা, মাথা ধরা, খাওয়ায় অরুচি, ঘুম কম হওয়া ইত্যাদি লেগেই থাকে।

ইদানিং চন্দ্রা লক্ষ্য করে তার পা দুটো ফুলে উঠেছে। প্রস্রাবও কম হচ্ছে। এসব দেখে বিপুল চন্দ্রাকে ডাক্তার দেখাতে মাকে আবার বলে।

মা বিপুলকে আশ্বস্ত করে বলে — গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে এরকম সমস্যা সবারই কিছু কিছু হয়। এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুলেখা ধাইকে আবার খবর দিলো। ধাই এসে চন্দ্রাকে পরীক্ষা করে দেখে এবং কিছু ওষুধপত্রের ব্যবস্থা দেয়, সঙ্গে প্রস্রাব পরীক্ষার কথাও বলে যায়। যাবার সময় চন্দ্রা ভাল আছে বলে আশ্বস্তও করে যায়।

সুলেখার একটা ধারণা, গর্ভাবস্থার শেষের দিকে বাচ্চার ওজন বেশি হয়ে গেলে বাচ্চার মাথার চাপে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার জন্যে পা ফোলে। তাই বাচ্চার ওজন কমানোর জন্যে চন্দ্রার খাওয়া একটু কমিয়ে দেয়। সুলেখার শাশুড়িও এভাবে ডেলিভারির আগে সুলেখার খাওয়া কমিয়ে দিতেন। যাতে বাচ্চার ওজন না বাড়ে। ওজন কম হলে সন্তান প্রসবে কোন অসুবিধে হবে না। এমনটাই ধারণা ছিল তাদের।

খাওয়া কমিয়ে দেওয়ায় চন্দ্রার দুর্বলতা আরও বেড়ে গেলো। প্রায়ই তার মাথা ঘোরায় এবং দুর্বল লাগে। কিন্তু শরীর ফোলার কোন হেরফের হয় না।

সুলেখার এত কড়া অনুশাসনে বিপুলের ভূমিকা অনেকটা নীরব দর্শকের মতো হয়ে গেলো। সেও বুঝে উঠতে পারছিল না, এখন সে কি করবে! চন্দ্রার শরীর দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে অথচ সে কিছুই করতে পারছে না! এটা বিপুলকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছিল। মায়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলারও সাহস নেই। কিই বা জানে সে।

আজকাল চন্দ্রার ঘুম একদম কমে গেছে। পা দুটোর সাথে শরীরটাও ফুলে গেছে। একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে। চন্দ্রা একদিন বিপুলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে — আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে আমি আর বাঁচব না! কোন ব্যবস্থা করো।

বিপুল চন্দ্রাকে বোঝায়—একটু সহ্য করো, ক'দিন পরই তো ডেলিভারি হয়ে যাবে। ডেলিভারির পর তো তোমার সব কষ্টের পরিসমাপ্তি হবে। এসব কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে এবং বসা থেকে বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে চন্দ্রার শরীরে খিঁচুনি দেখা দেয় এবং মুখে ফেনা বেরুতে শুরু করে।

বিপুল এসব দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। মাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে। ছেলের চিৎকার শুনে সুলেখা ও বারীন দু'জনেই ছুটে আসে।

চন্দ্রার শরীরের অসস্থা দেখে বারীন তাড়াতাড়ি চন্দ্রাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু চন্দ্রাকে পরীক্ষা করে দেখেন। চন্দ্রা অজ্ঞান হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে খিঁচুনিও হচ্ছে। ব্লাড প্রেসার খুব বেশি। প্রমাদ গুনছেন ডাক্তারবাবু, এতো 'এক্লেমশিয়া' রোগ! তাড়াতাড়ি ভর্তি করে দিলেন হাসপাতালে। চিকিৎসা চলতে থাকলো জরুরি ভিত্তিক।

ডাক্তারবাবু বিপুল ও বারীনকে ডেকে রোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন। ওষুধ আরম্ভ হওয়ার পর খিঁচুনি কমেছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। আরও বলেন—ডেলিভারির সময় হয়ে

গেছে, নিরাপদে ডেলিভারি হয়ে গেলে খিঁচুনি এবং অজ্ঞান ভাব কমে যাবে। তবে বাচ্চার অবস্থা ভাল নয়। কি হবে প্রসবের পরই বলা যাবে।

সুলেখা চন্দ্রার পাশেই বসে আছে। তার মনে একটা অপরাধ বোধ জেগে উঠেছে। চন্দ্রার শরীরের এই অবস্থার জন্যে নিজেকে দায়ী করছে সুলেখা। সময় মত যদি ডাক্তার দেখাতো তাহলে চন্দ্রার এই অবস্থা হতো না। বিপুলের অনুরোধ বারবার সে উপেক্ষা করেছে। এখন চন্দ্রা মৃত্যু- শয্যায়। খারাপ কিছু যদি হয় তাহলে তো সে-ই তার জন্যে দায়ী। চোখের জল ফেলছে আর ঈশ্বরকে ডাকছে, চন্দ্রাকে যেন রক্ষা করেন।

এক ঘণ্টা পর ডাক্তারবাবু আবার চন্দ্রাকে পরীক্ষা করলেন। ব্লাড প্রেসার একটু কমেছে, এখন তার খিঁচুনি হচ্ছে না। ডেলিভারির আর বেশি দেরি নেই।

দুঘণ্টা পর চন্দ্রার একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হলো। ছেলেটি খুবই দুর্বল ছিল। তাই জন্মের পর আর শ্বাস নিলো না। ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন তাই হলো। শিশুটা বাঁচলো না। ওজন নিয়ে দেখা গেলো শিশুটির ওজন প্রায় দেড় কেজি। শরীরে অপুষ্টির লক্ষণও আছে।

ডাক্তারবাবু বিপুল ও বারীনকে সব বুঝিয়ে বলেন। এক্লেমশিয়া হলে মা ও শিশু দুজনের অবস্থাই খারাপ হয়ে যায়।

ওজন কম থাকায় এবং অপুষ্টিতে ভোগায় বাচ্চাটা টিকলো না। চন্দ্রার শরীর মোটামুটি ভালো আছে। আশা করি, বার ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে।

তাই হলো, চন্দ্রা আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলো। প্রায় পনেরো ঘণ্টা পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। সব বিপদ কাটিয়ে চন্দ্র আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলো।

সুলেখার মনে শান্তি নেই একটা অপরাধ বোধ তার মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমস্ত ঘটনা তার অবহেলা এবং ভুলের জন্যই হলো। এটা তো অনায়াসে প্রতিহত করা যেতো।

সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে

সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসে নরেশ ও মানদা কাজ করছিল। প্রতিদিনই তারা দিনের নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় ধূপকাঠির শলা তৈরি করে। এতে তাদের পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয় হয় প্রতিদিন। গরিবের সংসার তাই আয়টাকে বিরাট আর্থিক সাশ্রয় বলেই মনে করে তারা।

নরেশ দিনেরবেলায় 'রোজ কামলার' কাজ করে। কাজ থেকে ফেরার সময় কয়েকটা মূলী বাঁশ কেঁটে নিয়ে আসে। সেটা দিয়েই ধূপকাঠির শলা তৈরি করে।

বাঁশগুলো সাইজ করে কেটে রাখে নরেশ। মানদা সেগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে ধূপকাঠির শলা তৈরি করে। সমস্ত দিন সংসারের কাজ করে মানদা, আর অবসর পেলেই শলা তৈরির কাজে হাত দেয়।

নরেশ ও মানদার চারজন ছেলেমেয়ে। বড় জন ছেলে, বয়স বরো বৎসর। গ্রামের স্কুলের ক্লাশ সিক্স-এ পড়ে। তারপর দুই মেয়ে এবং সব ছোট জন ছেলে। তাঁর বয়স তিন বৎসর।

দেখতে দেখতে সংসারটা একটু বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারে নরেশ। দারিদ্রসীমার নিচে আয় থাকায় পঞ্চায়েত থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধে পায়। এতে কষ্ট করেই সংসারটা চলে।

মানদা খুব মিতব্যয়ী। ধূপকাঠির শলা তৈরি করে যা পায় খুব প্রয়োজন না হলে সেটাতে হাত দেয় না। এই টাকা দিয়ে সে পোস্ট অফিসে একটা রেকারিং ডিপোজিটের বই করেছে। সপ্তাহে দেড়শত টাকা করে জমা রাখে। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, ওদের পড়াশুনার জন্য যে কোন সময় টাকার প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখের কথা তো চিন্তায় রাখতেই হবে।

ছেলেমেয়েরা গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করে। পড়াশুনায় মোটামুটি ভালই। প্রতিবছর পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে তারা। স্কুলে নিয়মমাফিক যাওয়া-আসা করে। এখন স্কুলের মিড ডে মিলটা একটা আলাদা আকর্ষণ। ভালো খাবার দেয় মিড ডে মিলে। তাই এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না তারা।

সন্ধ্যার পর কুপি জ্বালিয়েই শলার কাজ করতে হয় দু'জনের। নরেশ একদিন মানদাকে বলে কুপি জ্বালিয়ে এত সুক্ষ্ম কাজ করতে কষ্ট হয়। ভাবছি সামনের মাসে ইলেকট্রিক অফিসে যোগাযোগ করবো, যাতে বাড়িতে লাইনটা দেয়। এতে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুবিধে হবে আর আমাদের কাজ করতেও অনেক সুবিধে হবে।

প্রস্তাবটা শুনে মানদা খুব খুশি। সে-ই তো সবসময় বাড়িতে থাকে। সুতরাং তারই তো সবচেয়ে বেশি সুবিধে হবে। আর গরমের সময় একটা ফ্যান হলে তো কথাই নেই।

মানদা নরেশকে বলে — একবার যখন স্থির করেছ, তাহলে আর দেরি করার কোন প্রয়োজন নেই। কালই অফিসে যোগাযোগ করো।

নরেশের পরিবার বি পি এল আওতাভুক্ত। তাই ইলেকট্রিক লাইন পেতে খুব দেরি হলো না। বিদ্যুতের আলোতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে কাজের সময় বাড়িয়ে দেয় মানদা। একটা ফ্যানের সংযোগ থাকায় পরিশ্রমও কম হয়। দিনে দুই-আড়াই ঘণ্টা বেশি কাজ করতে পারে।

কিছুদিন হলো গ্রামের মহিলারা সরকারি সাহায্যে 'আশা' নামে একটি স্ব-সহায়ক দল তৈরি করেছে। সদস্য সংখ্যা এখন দশ। তারা কুটির শিল্পের কাজই করে। এদের মধ্যে ছয়জন ধূপকাঠির শলা তৈরি করে, বাকিরা কেউ তাঁত বুনে, কেউ বাঁশ ও বেতের কাজ করে।

স্বসহায়ক দল 'আশা' আত্মপ্রকাশের পর তাদের কাজের গতি অনেক গুণ বেড়েছে। জিনিসপত্র বাজারজাত করা অনেক বেশি সহজ হয়েছে। এসবের দায়িত্ব একজন মহিলাই নিয়েছেন। সরকারের সাহায্য সহজলভ্য এবং ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এই মহিলা খুবই পারদর্শী।

এক বৎসরে 'আশা' অনেক বেশি স্বাবলম্বী, অনেক বেশি আর্থিক স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েতের এক শক্তিশালী স্বসহায়ক দল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরজন্য 'আশা'র প্রত্যেক সদস্যই কৃতিত্বের অধিকারী।

এক বৎসরের কাজের পর্যালোচনায় উন্নতি দেখে সব সদস্যই খুব উৎসাহী এবং আশাবাদী। তারা সিদ্ধান্ত নেয় এবার 'আশার' সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে পনের করবে এবং নতুন সদস্যরা সব পুরুষই হবে। নতুন সদস্য হিসেবে নরেশ চিহ্নিত হয়। এতে নরেশ ও মানদা খুব খুশি। 'আশার' নতুন সদস্যরা স্থির করে তারা ফিসারির কাজ করবে। সে অনুযায়ী তিনটি ফিসারিও লিজ নেয়। ফিসারির কাজের অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তাই তাদের ফিসারির কাজে কোন অসুবিধে হয় না।

মাছের বাচ্চা ফেলার পর কয়েক বার জাল ফেলা হয়েছে। মাছের বৃদ্ধির হার দেখে সদস্যরা খুবই আশান্বিত। বৎসরের শেষে ভাল মুনাফার স্বপ্ন দেখছে তারা। এক বৎসর পর জাল ফেলে কিছু কিছু মাছ ধরা হয়েছে। কাতলা প্রায় এক কেজি ওজনের হয়েছে। বড় সাইজের মাছগুলো বিক্রি করে আসল টাকা উঠে গেছে। এতে সদস্যরা খুব আনন্দিত।

নরেশ ও মানদা প্রত্যেকদিন নিয়মমাফিক সন্ধ্যার পর শলা তৈরির কাজ করে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সংসারের অনেক সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের কথাও আলোচনা করে।

একদিন মানদা নরেশকে বলে—আমার মাসিকের দিনটি পার হয়ে প্রায় পাঁচদিন চলে গেছে। আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে, অন্য কিছু হয়ে গেল না তো?

নরেশ মানদাকে আশ্বস্ত করে— মাত্র পাঁচদিন দেরি হয়েছে, এতে এতো চিন্তা করার কি আছে? অপেক্ষা করো হয়ে যাবে। মানদা আরও পাঁচদিন অপেক্ষা করে। কিছু না হওয়ায় এবার সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ে। খবর শুনে নরেশও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাহলে সত্যি সত্যিই কি মানদা সন্তানসম্ভবা হয়ে গেলো! আলাপ করতে করতে মানদা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই সন্তান তো তার একদম কাম্য নয়। তাই একে রাখার একদম ইচ্ছা নেই মানদার।

নরেশ ও মানদা অনেক পরামর্শ করে, এখন কি করবে তারা? মানদা বলে— চলো না আমাদের গ্রামের ধাই—যিনি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্মের সময় ছিলেন, তার সাথে পরামর্শ করি।

নরেশ এক কথায় রাজি হয়ে যায়। বলে — চলো কালই ধাই এর সাথে দেখা করি।

পরদিন মানদা ও নরেশ ধাই এর বাড়িতে গেল। মানদা খোলাখুলি তার সমস্যার কথা ধাইকে জানায়।

ধাই মানদাকে পরীক্ষা করে বলে—মানদা আবার সন্তান সম্ভবা।

ধাই এর কথা শুনে মানদা কেঁদে ফেলে, বলে—এই সন্তান তার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। যে কোন ভাবেই হোক এই গর্ভ নষ্ট করতে হবে। তার চারটি সন্তান আছে, আর তার সন্তানের প্রয়োজন নেই। ধাই মানদা ও নরেশকে বোঝায়, গর্ভ নষ্ট না করতে পরামর্শ দেয়। মানদা এই সন্তান রাখতে একদম রাজি নয়। ধাইকে বলে—আপনি কিছু করুন দিদি! আমাকে রক্ষা করুন, না হলে আমি মরে যাব।

ধাই নরেশ ও মানদাকে হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দেয়। মানদা কোন মতেই হাসপাতালে যেতে রাজি হয় না। তার খুব ভয় হাসপাতালে গেলে যদি অপারেশন করে ফেলে।

নরেশ ও মানদার কাতর অনুরোধে ধাই রাজি হয়ে যায়। বলে—গাছের শেকড় দিয়ে সে আগে অনেক গর্ভ নষ্ট করেছে। তারা যদি রাজি হয়—তাহলে সে চেষ্টা করে দেখতে পারে।

মানদা এক কথায় রাজি হয়ে যায়, বলে—আপনি যেভাবেই হোক আমাকে উদ্ধার করুন দিদি। এ বিপদ থেকে আমাকে বাঁচান।

পরদিন ধাই-মহিলা গর্ভ নষ্ট করার জন্য গাছের শেকড় দিয়ে তৈরি একটি পুঁটলির

মত জিনিষ মানদার জরায়ুর রাস্তায় দিয়ে দেয়। এটা দু'দিন রাখার পর বের করে ফেলতে বলে। এতেই গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথম দিন মানদা বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন থেকে তলপেটে ব্যথা এবং রক্তস্রাব শুরু হয়। তৃতীয় দিন থেকে পেটের ব্যথা এবং রক্ত স্রাব বাড়ে, গা ম্যাজ ম্যাজ এবং জ্বর জ্বর ভাবও অনুভব করে। রক্তস্রাব দেখে মানদা খুব খুশি। ভাবে —গর্ভটা নষ্ট হয়ে গেছে।

চতুর্থদিনে মানদার শরীরটা আরও খারাপ লাগতে শুরু করে। জ্বর বেড়ে প্রায় ১০৪° ডিগ্রি হয়ে যায়, সঙ্গে তল পেটে ব্যথাও বাড়ে। রক্তস্রাব আগের মতোই চলতে থাকে।

এসব দেখে নরেশ ভয় পেয়ে যায় । ছুটে যায় ধাই এর বাড়িতে। ধাইকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মানদাকে তাড়াতাড়ি এসে দেখে যেতে অনুরোধ করে। দেরি না করে ধাই মানদাকে দেখতে আসে। পরীক্ষা করে মানদাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেয়।

নরেশ এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। ধাইয়ের কাছে মানদার শরীরের অবস্থা কেমন জানতে চায়।

ধাই বলে—শরীর মোটামুটি আছে, তবে দেরি না করে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। না হলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে।

নরেশ আর দেরি করল না। মানদাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পাশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত ডাক্তারবাবু মানদাকে পরীক্ষা করে দেখেন। সমস্ত তলপেটে একটি খারাপ রোগের সংক্রমণ হয়েছে। তলপেটে হাত দেওয়া যায় না, ব্যথার চিৎকার করে ওঠে মানদা।

ডাক্তারবাবু দেরি না করে এম্বুলেন্স দিয়ে মানদাকে জেলা হাসপাতাল পাঠিয়ে দিলেন। মানদাকে প্রথম ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যায়, সেখান থেকে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করে দেয়।

স্ত্রীলোক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রবীর দাস তাকে প.রীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার দাস নরেশকে তাব চেম্বারে ডেকে পাঠান। নরেশের কাছ থেকে সমস্ত ইতিহাস জেনে নেন। সবশেষে ডাক্তার দাস নরেশকে বলেন—বড় ভুল করে ফেলেছেন। সরকারি এত সুযোগ-সুবিধা থাকতে কেন হাসপাতালে প্রথমেই আনলেন না। একটি খারাপ ধরনের রোগের সংক্রমণ হয়েছে রোগীর শরীরে। অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ওষুধপত্র দিয়েছি। দেখা যাক কি হয়। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

নরেশ এবার সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল। তবে কি মানদা আর ভাল হবে না। মানদা ভাল না হলে, না বাঁচলে সে তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদম অসহায় হয়ে যাবে। এসব কথা তো সে চিন্তাও করতে পারছে না! এখন সে কি করবে কিছুই ভাবতে পারছে না। মানদা মারা গেলে তারও বাঁচার কোন অর্থ নেই। এসব চিন্তায় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।

নরেশ অসহায়ের মত ডাক্তারবাবুর সামনে কাঁদতে থাকে, ডাক্তারবাবু তাকে সান্ত্বনা দেন। নতুন ওষুধ তো মাত্র শুরু হচ্ছে, ঘাবড়াবেন না। আশা করি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ডাক্তারবাবুর কথাটা নরেশের কানে বারবার বাজতে থাকে—আশা করি সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই কথাটা তার কানে কে যেন বাজাতে থাকে। আর সে এই বিশ্বাস নিয়েই মানদার ভার ঠাকুরের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে—মানদা সুস্থ হয়ে উঠবে এই আশায়।

দু'দিন পর মানদার শরীরের একটু পরিবর্তন হলো। জ্বর একটু কম, অস্থির অস্থির ভাব এবং তলপেটের ব্যথাও কমলো।

ডাক্তারবাবু নরেশকে ডেকে বলেন—মানদার একটা ছোট্টা অপারেশন লাগবে। কালই সেটা করতে হবে। অনেক দূষিত জিনিস পেটে জমে গেছে। সেগুলো বের করে দিতে হবে।

নরেশ এক কথায় রাজি হয়ে গেল—আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন ডাক্তারবাবু। আমার বলার কিছু নেই।

ভালোয় ভালোয় মানদার অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশনের পর মানদা আরও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। জ্বর একদম নেই। ব্যথাও কমে গেছে। কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়াও করতে পারে। উঠে বসতে এবং ধীরে ধীরে হাঁটতেও পারে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও চারদিন সময় লাগবে। ডাক্তারবাবু মানদাকে দেখতে এসে বলেন— এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কাল বাড়ি যেতে পারবেন।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে মানদা কেঁদে ফেলে। না বুঝে ভুল করেছিলাম ডাক্তারববু, এমনটা আর হবে না কোনদিন। আপনার চেষ্টাও ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেঁচে গেলাম, বলে ডাক্তারবাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হাত বাড়ায় মানদা।

সুখেন্দু দাস

আত্মকেন্দ্রিকতার অভিশাপ

দুর্বলচেতা মানুষ অনেক সময় অবস্থার চাপে অনৈতিক কথা মেনে নেয় বটে, কিন্তু পরিণামে তা তার মানসিক দৃঢ়তাকে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। সুরূপা দেবীর দর্দমনীয় লোভ স্বামী রত্নেশ্বরের জীবনকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। রত্নেশ্বরের পিতা সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ছেলেকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সুরূপা দেবী তা না জানলেও রত্নেশ্বর দিনের পর দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পিতা পুত্রের মধ্যে প্রগাঢ়ভাব — একে অপরকে ক্ষণকাল না দেখলে বিচলিত বোধ করে। রত্নেশ্বর নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সামান্য জমিজমা চাষাবাদ করে তার পিতা পরিবারের হাল ধরে রেখেছে। রত্নেশ্বর যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে তখন তার পড়াশোনা একবার বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। কিছু গয়না বন্ধক রেখে তার পিতা ছেলের পড়াশোনার সংকটকাল উতরিয়ে এনেছেন।

পিতা দেবানন্দ রায় পরিবারে সর্বদাই শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে রাখতেন। তিনি ভাবতেন ছেলে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলেই একটা চাকুরি জুটে যাবে, পরিবারের সুদিন ফিরে আসবে। তখন দু-মুঠো ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবেন।

অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় রত্নেশ্বর নজরকাড়া নম্বর পেয়ে নবম শ্রেণিতে ওঠে। তখন থেকেই স্কুলের দু-জন শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে রত্নেশ্বরকে ইংরেজি ও অঙ্ক পড়াতে থাকে। রত্নেশ্বর 'ইন্ট্রোভার্ট' প্রকৃতির ছেলে। খুবই সহজ-সরল। তার 'আই-কিউ' উঁচুমানের না হলেও নিম্নমানের নয়। নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে রত্নেশ্বরের পরীক্ষার ফল ক্রমেই উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

রত্নেশ্বরের ছোট দু ভাই—দেবেশ ও শিবেশ সপ্তম মান পর্যন্ত পড়াশোনা করে স্কুলে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেয়। তারা এখন জমিতে চাষের কাজে লিপ্ত। পিতার কায়িক শ্রম অনেকটাই হালকা হয়ে আসছে। তাদের পরিবারে বাড়তি খরচের চাপ নেই বললেই চলে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা কৃষিকাজের মাধ্যমেই মিটে যায়। তাদের বর্তমান বাড়িটা ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার অন্তর্গত খোয়াই নদীর পাড়ে। বৃটিশ ভারতের চট্টগ্রাম থেকে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তারা ত্রিপুরায় আসে। বহুদিন তারা ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া অঞ্চলে বসবাস করেছে।

বর্তমান বাড়ির পাশেই তাদের মৎস চাষের একটা ডোবা আছে। যে বছর বন্যার জলে পাড় ভাসিয়ে দেয় সে বছর ডোবাতে সারা বছরের মাছ এসে জমা হয়। একখণ্ড উঁচু টিলাভূমিতে তাদের সারা বছরের শাক-সব্জী করার সুব্যবস্থা আছে। কানি তিনেক নালজমি থেকে যে ধান

উৎপন্ন হয়, তা দিয়ে পরিবারের খোরাক চলে। সামনের চাতাল ভূমিখণ্ড থেকে বছর বছর যে পাট উৎপাদন হয়, তা বিক্রী করে এবং শাক-সব্জীর বাড়তি লভ্যাংশ দ্বারা কাপড় চোপড় কেনার কাজ চলে যায়। দুধালো গাভি দুটি। সম্বৎসর দুধ বিক্রী করে যে লভ্যাংশ আসে তা দিয়ে ওষুধ পথ্যাদি সহজেই ক্রয় করা যায়।

রত্নেশ্বরের স্কুলের শিক্ষকরা ছুটির মাসগুলোতে বিদ্যালয়েই কোচিং ক্লাশের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষকগণ সাগ্রহে বিনা পয়সায় রত্নেশ্বরকে পড়ান। মাধ্যমিক বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষায় রত্নেশ্বর দ্বিতীয় বিভাগে ভাল নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

এখানেই রত্নেশ্বরের বিদ্যালয় শিক্ষার ইতি টানবার কথা। এমন সময় সঙ্গতি সম্পন্ন এক পরিবারের কর্তা মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে রত্নেশ্বরের পিতার কাছে। কিছু বাড়তি সুযোগের প্রলোভনও দেখায়; —রত্নেশ্বরকে তারা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করানোর যাবতীয় খরচ বহন করবেন। দেবানন্দকে পুত্রের হায়ার সেকেন্ডারি পাশের ছ-মাস আগেই বিয়ের পর্ব শেষ করে নিতে হবে। রত্নেশ্বরের চাকুরি না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে পিতৃগৃহেই অবস্থান করবে।

মেয়ের পিতার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, চালচলন দেখে দেবানন্দ পুত্রের বিয়ের প্রস্তাবটা নাকচ করে দেবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু ছেলের এতে ঘোর আপত্তি। রত্নেশ্বর এই মেয়েকেই বিয়ে করবে বলে পিতাকে জানিয়ে দেয়। পরে বাধ্য হয়ে দেবানন্দ ও তার স্ত্রী ছেলের বিয়েতে সম্মতি দেয়। ছেলের মন রক্ষার্থে দেবানন্দ পাত্রীপক্ষের শর্ত মেনেই যথাসময়ে ছেলের বিয়ে সুসম্পন্ন করেন। রত্নেশ্বরও বোর্ডের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। সে সময় হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলেই একটা চাকুরি জুটে যেতো। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই রত্নেশ্বরের ভাগ্যে একটা চাকুরিও জুটে গেল।

রত্নেশ্বরের স্ত্রী সুরূপা ও মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় বসেছিল। মাধ্যমিকের সিঁড়ি ডিঙিয়ে যেতে পারেনি। সুরূপা উচ্চাভিলাষী, বেপরোয়া, বিবেকহীনা বাকপটু গৃহিণী। তার একরোখা মনোভাব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুময় সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে যেমন পরিপন্থী ছিল, তেমনি গোটা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও তাকে এড়িয়ে চলতো। শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেবরদের প্রতি তার মমত্ববোধ ছিল না বললেই চলে। সঙ্গতি সম্পন্ন ঘরের মেয়ে বলে তার একটা অহংকার বোধ সব সময় তাকে তাড়িত করতো। স্বামী রত্নেশ্বরকে তার কথামতো 'ওঠবোস' করানোর পরিকল্পনায় সে ছিল দিনরাত ব্যস্ত। যে স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার ধারে না, সে যেমন স্বামীর কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে উঠে, তেমনি স্ত্রী ও স্বামীকে পরিপূর্ণ রূপে পায় না — পায় দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের পিণ্ডাকারে।

বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই রত্নেশ্বরের ছেলে 'কিরীট' এর জন্ম হয়। নাতির মুখ দেখে ঠাকুর্দা, ঠাক্‌মা এবং পরিবারের সকলেই আনন্দ-হিল্লোলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ক্রমেই শিশু বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। ঠাকুর্দা-ঠাক্‌মার আদর-সোহাগও বেড়ে যায়। আদরের বাড়াবাড়িটা

সুরূপা কিছুতেই পছন্দ করে উঠতে পারেনি। কিরীট এর বয়স যখন পাঁচ, তখন তাকে স্থানীয় একটা নার্সারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। দেবানন্দ নিজেই নাতিকে স্কুলে আনা-নেয়া করেন। মুখে মুখে নাতিকে ছড়া শেখান ঃ

'আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই
ঠাক্‌মা গেছেন গয়া-কাশী, ডুগডুগি বাজাই।'

কখনো আবৃত্তি করে নাতিকে শোনান ঃ

'আতা গাছে তোতাপাখি, ডালিম গাছে মৌ,
এত ডাকি তবুও কথা — কও না কেন বৌ।'

ছয় বছর বয়সে কিরীট-কে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

দেবানন্দ নাতিকে নিয়ে কখনো নদীর চরে, কখনো খেলার মাঠে, কখনো কোন মন্দির প্রাঙ্গনে নিয়ে যেতেন।

দেবানন্দবাবুর জন্ম বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে। ত্রিশ এর দশকের শেষ দিকে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী সশস্ত্র বিপ্লবীদের দলে তিনি যোগদান করেন। সেখানে দু-বছর কাটান। সে সময় চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান গেয়ে তিনি মানুষকে স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হয়। তারপরেই দেবানন্দবাবু সপরিবারে ত্রিপুরায় চলে আসেন। তিনি বিকালে নির্জন কোন চাতালে, কিংবা খোলা মাঠে নাতিকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন আর আপন মনে গাইতেন ঃ

'বান এসেছে মরা গাঙে
খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও ?'

দুঃখ দারিদ্র্যে মনটা বিষিয়ে গেলে বাড়িতেই নাতিকে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে শোনাতেন ঃ

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।'

কখনো পুত্রবধূর রূঢ় আচরণে আহত হয়ে গেয়ে ওঠতেন ঃ

'ভয় কি মরণে, রাখিবে সন্তানে
মাতঙ্গি মেতেছে আজ সমররঙ্গে।'

দেবানন্দবাবু ছিলেন আত্মভোলা মানুষ। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে তিনি কোনদিন স্বার্থের লোভে পা বাড়াননি। তিনি ছেলে রত্নেশ্বরকে বলতেন, 'জগত যাহান্নামে যাক্ আমি যাহান্নামে যাব কেন?' এই সূত্র ধরে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আশা ছাড়েন নি। তিনি জানতেন মানুষের পাঁচআঙ্গুল সমান হয় না। বিধাতার বিধান। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা বংশে কারোর মধ্যে প্রতিফলিত হবেই, এই বিশ্বাস নিয়ে নাতিকে তিনি তার মতো করে গড়ে তুলতে চান।

আট বছর বয়সে কিরীট একটি প্রাইমারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তে শুরু করে। তার নার্সারি শিক্ষাটা বাড়িতেই সমাপ্ত হয়। পুত্রবধূ সুরূপা শ্বশুরের বাড়াবাড়ি মোটেই সুনজরে দেখছে না। পুত্রকে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া নিয়ে শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে একদিন তীব্র বচসা হয়। দেবানন্দবাবু পুত্রবধূকে আঘাত দিয়ে কোন কথাই বলেননি। অথচ সেদিন বিকেলেই কিরীটকে বাড়িতে রেখে সুরূপা বাপের বাড়ি চলে যায়।

রত্নেশ্বরের শ্বশুর জামাইকে বাড়িতে তলব করেন। শ্বশুরের জরুরি বার্তা পেয়ে রত্নেশ্বর শ্বশুরালয়ে চলে যায়। শ্বশুর তাকে নির্দেশ দেয় 'পৃথক বাড়ি ভাড়া না করলে মেয়ে এতো বড়ো সংসারেব ঘানি টানতে আর যাবে না।' রত্নেশ্বর সে বারের জন্য সমস্যাটা মেটাতে শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। শ্বশুর বাড়ি ভাড়ার টাকা নিজেই মেটাবে বলে জামাইকে আশ্বস্ত করেন।

পিতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে রত্নেশ্বর কোনদিনই সাহস করেনি। তাছাড়াও রত্নেশ্বর টের পায় কীভাবে পুত্র ঠাকুর্দার সান্নিধে থেকে ক্রমেই সুশিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু স্ত্রী সুরূপাকে কিছুতেই সে বাগে আনতে পারছে না।

সুরূপার ব্যাখ্যা ভিন্নতর। ছেলেকে অমানুষ করার জন্য সুরূপা শ্বশুরকেই দায়ী করে। নিরপেক্ষ সুদৃঢ় মনোভাবের ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে সুবিচার করার মধ্যে ভেজাল থেকে যায়। রত্নেশ্বর ভালোমন্দের বিচারে কোনদিনই গ্রহণ-বর্জনের মাপকাঠি সঠিক নির্ণয় করে উঠতে পারেনি। সে বারবার ভুল করে চলেছে। তার পিতা দেবানন্দকে আজও সে চিনে উঠতে পারেনি। তাই অন্ধের মতো সে তার স্ত্রীর কথাতেই সায় দিয়ে শ্বশুরের কথা মতো পৃথক একটি বাড়ি ভাড়া করে। পিতা-মাতা, অসহায় ভাইদের আবদারকে অবহেলা করে একদিন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পৃথক ভাড়া বাড়িতে চলে যায় রত্নেশ্বর। ভাড়া বাড়িতে যাবার প্রাক্কালে রত্নেশ্বর পিতার অনুমতি চায়। তাকে ফেরানো যাবে না ভেবে দেবানন্দ বলেন, 'তোমাদের ভালোমন্দ আমার চেয়ে তোমরাই ভালো বুঝবে, আমাকে এ ব্যাপারে না জড়ালেই ভালো, সুখে থেকো' কিরীট ঠাক্‌মার আঁচল বুকে নিয়ে ঠাকুর্দাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ঠাক্‌মা

ঠাকুর্দার চোখের জলে নাতির বুক ভেসে যায়। রত্নেশ্বরের ছোট দুই ভাই হাবার মতো দাঁড়িয়ে দাদা বৌদির কাণ্ডকারখানা অবলোকন করে। তাদের চোখেও জল। কথা না বাড়িয়ে রত্নেশ্বর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভাড়া বাড়িতে গিয়ে ওঠে। দুধের শিশু বড়োদের আচরণের মাথামুণ্ড কিছুই না বুঝে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। সে রাতে ওর আর কিছুই খাওয়া হয়নি। রত্নেশ্বর আর সুরূপা চিঁড়া-মুড়ি খেয়ে সে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

ঠাকুর্দা ঠাক্‌মা সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে রাত কাটায়। কিরীট এর দুই কাকা বাড়ির সদর গেটে দাঁড়িয়ে, কখনো বা বসে রত্নেশ্বরের ভাড়া বাড়ির দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে ওরাই জানে।

দেবানন্দ প্রলাপ বকে, 'ওদের খাওয়া ওরা খেতো, আমাদের খাওয়া আমরা খেতাম। বাড়ি ছেড়ে যাবার এমন কী দরকারটা ছিল।'

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কিরীট কিছুই খাবে না বলে আবার জেদ ধরে। তখন কিরীট-এর বয়স দশ। বাবা-মা শত বুঝিয়েও তাকে খাওয়াতে পারেনি। মানসিক আঘাতে তার পায়খানা প্রস্রাবও বন্ধ। বিকেলে ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার বললেন, 'কিরীটকে কিছু সময় ঠাকুর্দার ঘরে পাঠিয়ে দেন, নতুবা মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।'

তৃতীয় দিন ভোরে রত্নেশ্বর কিরীটকে তার ঠাকুর্দার গৃহে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়েই কিরীট তার ঠাকুর্দার সাথে বসে দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার পর প্রথম দুধ ভাত খেয়ে — 'কিছু না খাওয়ার জেদ' ভাঙে।

ঠাকুর্দার গৃহে প্রতিদিন যাওয়া-আসা স্বাভাবিক হয়ে উঠলে উভয় পরিবারে স্বস্তি ফিরে আসে।

এখন থেকে ঠাকুর্দার সাথে কিরীট প্রতিদিন বিকেলে বেড়াতে বেরোয়। কিরীট ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই মানসিক আঘাতে দেবানন্দ দিন দিন যেন ক্রমশঃ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। আগের সেই প্রাণ খোলা হাসি, আনন্দ, উৎসাহ যেন দেবানন্দ ক্রমেই হারিয়ে ফেলছেন। এই ভাবান্তর কিরীট কোন মতেই যাতে টের না পায়, তিনি সে ব্যাপারে নাতির সঙ্গে আচরণে খুবই সতর্ক থেকেছেন, কখনো ধরা দেননি। এমনি করেই তিনটি বছর কেটে গেল। এক রাতে দেবানন্দ ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। রত্নেশ্বরকে খবর দেয়া হয়। রত্নেশ্বর স্ত্রীর অজান্তেই বাবাকে এক নজর দেখে বাড়ি ফিরে আসে। রাতেই দেবানন্দ দেহত্যাগ করেন।

সকালে সুরূপা শ্বশুরের মৃত্যু খবর জানতে পেরে স্বামীকে শবযাত্রায় যেতে বারণ করে। কিরীট শয্যা ত্যাগের আগেই ঠাকুর্দার মৃত্যু খবর পেয়ে তাকে দেখতে যেতে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু সুরূপার পাষাণ হৃদয় ছেলের আর্তনাদেও গলেনি। তখন কিরীট এর বয়স চৌদ্দ।

সে সবে মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছে। ভালো মন্দ কম বেশি অনেকটাই বোঝে। সে অপমানে, উত্তেজনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, কথায় কথায় বাবা-মার রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ জানায়।

এরপরেই কিরীট-এর আচরণে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসে। সে গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে ওঠে। কম কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। পড়াশোনায় গভীরতা বাড়ে। চার বছর পর চারটি লেটার নিয়ে কিরীট বোর্ডের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগও মিলে। বছরে এক দুই দিন বাড়ি থাকে। সারা বছর কলেজ হোস্টেলেই তার জীবন কাটে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং ফাইনাল পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের ছাপ রাখে। বাবা মা-এর স্নেহ-আবদারে সে কোন সাড়া দিতেই চায় না। এভাবেই এ যুগের বাবা-মা পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে হিতে বিপরীত ফল ভোগ করেন।

পিতা রত্নেশ্বর ছেলের বাড়ি না আসার কারণ বুঝতে পেরে অনুতাপ আর অনুশোচনায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমে মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ছেলে কিরীট ইতিমধ্যে একটি সরকারি চাকুরিও পেয়েছে। পিতার অসুখের খবর পেয়ে বাড়ি আসে, নতুন চাকুরি, তাই অচৈতন্য পিতাকে একনজর দেখে কর্মস্থলে চলে যায়।

পিতার মৃত্যু খবর পেয়ে পারলৌকিক কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। একমাস পরে বাড়ি এলে মা সুরূপার নানা প্রশ্নবাণে সে বিদ্ধ হয়।

চাকুরি পাওয়ার সাথে সাথেই কিরীট এক অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করে। মেয়েটির নাম তপতী। সে তার স্ত্রীকে নিয়েই বাড়ি এসেছে।

পুনরায় সুরূপা পুত্র কিরীটকে এতো বিলম্বে বাড়ি ফেরার কারণ জানতে চাইলে কিরীট বিনম্রভাবেই উত্তর দেয়, 'মা, তুমি স্ত্রীরূপে নিজের স্বামীকে তাঁর পিতৃ বিয়োগের পর শব যাত্রায় যেতে বারণ করেছ, সেই তুমি মাতৃরূপে পুত্রকে পিতৃশ্রাদ্ধে অনুপস্থিত থাকায় কৈফিয়ৎ দাবি করছ! আমি তোমার স্বরূপ কোন কালেই বুঝতে পারিনি, আজও পারছি না! তবে, হ্যাঁ, আমি গয়াক্ষেত্রে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ করেই বাড়ি এসেছি।

সুরূপা পুত্রের জবাবের প্রতি উত্তর দিতে পারেনি, সে নীরব হয়ে যায়। কিরীট বলে, 'এবার আমার কথা শোন, মা। ঠাকুর্দা আমার মনোভূমিতে বোধিবৃক্ষের বীজ রোপণ করে গেছেন। অঙ্কুরিত হয়ে তা পল্লবে, ফুলে, ফলে, সুশোভিত। আমার গৃহে গেলেই তা দেখতে পাবে। যাবে, মা, আমার আনন্দবাসে?

বোবা প্রাণিদের অপত্য স্নেহ

পশু পাখি ও অন্যান্য প্রাণিদের বেদনার কথা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। এই অবহেলা মনুষ্য সমাজের স্বভাবজাত অভ্যাস। আমাদের কাছে আমাদের সন্তান, সন্ততি বা নাতি, নাতনিদের আদর সমধিক। ওদের আনন্দে আমরা আনন্দ বোধ করি, ওদের দুঃখে, কষ্টে, রোগে — আমরা বিচলিত হই। বোবা প্রাণিদের সন্তান স্নেহ মানব জাতির সন্তান স্নেহ থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

পোষ-মানা এক ছাগ-মাতার জীবনালেখ্য এখানে উল্লেখ করছি। সে আজ আর আমাদের গৃহে নেই। ইচ্ছা করেই তাকে অদুরে আমাদের এক পুরোনো মহিলা ভৃত্যের গৃহে স্থানান্তরিত করেছি। বাজারে বিক্রী করলে ভালো টাকাই পাওয়া যেতো, কিন্তু এই তরুণী ছাগমাতাটির জীবন-সুরক্ষার গ্যারান্টি থাকতো না; তাকে কেটেকুটে বিক্রেতারা মাংস হিসেবে বাজারে বিক্রী করে দিতো, আর সে মাংস খাদ্য হিসেবে কবেই মানুষের পেটে চলে যেতো।

নিজ গৃহে পোষ মানা পশু-পাখির মাংস খেতে কার মনে চায়? তাই পোষমানা পশুপাখির মাংস আমাদের গৃহে অবহেলিত হতো।

এই ছাগমাতার মাকে গামাইবাড়ি এক কৃষকের ঘরে শর্তারূপ করে পালন করতে দিয়েছিল আমার বড় ছেলে বিভাস। বিভাসের হাঁস-কবুতর, ছাগশিশু এবং গাইবাছুর প্রতিপালনের প্রতি ছিল অপরিসীম আগ্রহ। ঘটনা চক্রে কুকুরের কামড়ে এটি মারা যায়। বিভাস খবর পেয়ে ঐ মৃত ছাগমাতার শিশুটিকে নিজগৃহে নিয়ে আসে। আমাদের গৃহেই সে বড়ো হয়ে দুটো শিশুর জন্ম দেয়।

একই গৃহে একসঙ্গে হাঁস, কবুতর, ছাগপশু পালনে বাধা আছে বলে অনেকে বলতো। বিভাস তা কোন কালেই গ্রাহ্য করতো না। আমরা বললেও সে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। আর আমরাও সে আঘাত পাবে মনে করে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইনি। আমার আলোচ্য গল্পে এই ছাগমাতার কথাই উল্লেখ করছি।

এই ছাগমাতার বিচরণ ভূমি ছিল চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রের সম্মুখস্থ মাঠ। এই ছাগমাতা দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে বাচ্চা দুটোকে পেট ভরিয়ে, দুধ খেতে দিত। তারপর আবার মাঠে ফিরে যেতো। সন্ধ্যায় যথারীতি বাড়ি ফিরে আসত। অনেক সময় দুধ খেতে খেতে ওদের মুখ বেয়ে দুধের ফেনা মাটিতে ঝরে পড়তো। তা দেখে নাতি, নাতনিদের কী আনন্দ হতো তা বুঝিয়ে বলা যাবে না।

বিধির বিধান বিচিত্র। হঠাৎ একদিন বিভাস ঘোরতর অসুস্থ হয়ে জি.বি. হাসপাতালে

তাকে রোগমুক্তির জন্য আশ্রয় নিতে হয়। বার তের দিন চিকিৎসার পর সে অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠে। আমরা তাকে বাড়ি নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছিলাম। ৩১ শে জুলাই, ২০১১ ইং কোলকাতার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে দেখবে স্থির হলো। কিন্তু আকস্মিক ৩০ শে জুলাই সকালে 'ব্রেইন স্ট্রোকে' সে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারায় এবং রাত ন'টার পর মারা যায়।

এদিকে ছাগমাতাটির দুটো সন্তানই বিভাসের মৃত্যুর আগে আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। একই দিনে ছোট বাচ্চাটি প্রাণ হারায় আর বড়োটি সেদিনই কোথায় হারিয়ে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সন্তান হারা ছাগমাতা প্রতিদিন বারবার করে ঘরে ফিরে আসত। তার বিচরণ ভূমিতে ঘাস খেতে যেতো না। পনেরো দিনের মধ্যে ছাগমাতার দেহটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। প্রতিদিন লক্ষ করে দেখেছি ছাগমাতাটি যেন ওর সন্তানকেই এখানে সেখানে খুঁজছে। শুধু তাই নয়, অভুক্ত দেহে একটা শনিতলার পাকাভূমিতে রাত দিন শুয়ে থাকতো। চেষ্টা করেও তাকে বাড়ি আনা যেতো না।

এসব কারণেই বাধ্য হয়ে এই ছাগমাতাকে পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আমার মেজদার 'কুহরা' পাখি পোষার শখ ছিল। 'কুহরা' কোকিলের মতো সুর করে এমন এক পাখি। পোকা মাকড় মাছ ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা দারুণ পোষ মানে। শুধু তাই নয়। ওদের ছেড়ে দিলে বুনো 'কুহরা'দের খুঁজে বের করে এবং সুকৌশলে বুনো পাখিটিকে ঝটিতে পা, নখর দিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরে রাখে, যতক্ষণ না মালিক কাছে গিয়ে বুনোটাকে বন্দি করে, ততক্ষণ ছাড়ে না। এদের মাংস নাকি খুব সুস্বাদু।

বর্ষা আগমনে এদের (মনে হয় পুরুষ 'কুহরাদের') মাথায় কপাল বরাবর একটি শিষ গজায়। দেখতে ভারি সুন্দর, শিং এর মতো শক্ত নয়, নরম। এই শিষের রং খয়েরি হলুদ। সমস্ত শরীরেই যেন কুহরার রূপ লাবণ্য তখন ঝরে পড়ে। এ সময় এরা গাল ফুলিয়ে কোকিলের মতো আওয়াজ করে ডাকে, কেউ বলে 'কুলু কুব্ কুব্,' আমরা যেন শুনেছি 'টুল্লুব্ টুব্ টুব্'।

তখন আমার বয়স, ১০/১২ হবে, শব্দটা নিয়ে এতো মাথা ঘামাইনি। পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পর এই পাখিও আর দেখিনি। মনে হয় এই ডাকের মাধ্যমে এরা নারী কুহরাদের জানান দিত — সে কোথায় আছে।

শরৎকাল এলেই ওদের মাথার শিষ ক্রমশ ছোট হয়ে শিরের সঙ্গে মিশে যেতো। মেজদার পোষমানা 'কুহরাটিকে' বাঘদাসে (একপ্রকার জংলি প্রাণী) মেরে ফেলে। তখন মেজদার কী কান্না। স্বচক্ষে দেখেছি। এদের বাচ্চা ফুটলে দুই একদিন পরই নারী পুরুষ মিলে

বাচ্চা নিয়ে খাদ্যান্বেষণে বেরোত। মুহূর্তের মধ্যে এরা কোথায় পালাতো খুঁজে পাওয়া যেতো না। শিকারিরা বহু কষ্ট করে দু-একটা বাচ্চাকে ছিনিয়ে এনে বিক্রী করতো ।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। পত্রিকায় দেখেছিলাম এক ব্যাঙের দুঃসাহসিক কাজ। একটা জংলি জায়গায় নারী-পুরুষ দুটো ব্যাঙ অনেকগুলো বাচ্চাকে বড়ো করে তুলছে। কোথা থেকে এক সাপ এসে জুট্লো। প্রতিদিন সেই সাপ দুটো-তিনটে করে ব্যাঙের বাচ্চা খেয়ে ফেলছে। সন্তানের উপর এই আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে একদিন পুরুষ ব্যাঙটি ফণা ধরা অবস্থায় সাপের সম্পূর্ণ মুখটা নিজের মুখের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে। সাপ তাকে লেজ দিয়ে প্যাঁচানোর চেষ্টা করে। ব্যাঙটি খুবই বড়-সড়। কিন্তু লেজ দিয়ে সাপ তাকে কাবু করার সীমার বাইরে। বহুক্ষণ সাপ চেষ্টা করে, মুক্তি না পেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। ঘটনাটা ক্রমেই লোকের নজরে আসে। দেখতে দেখতে সেখানে বহুলোকের সমাগম হয়। সকলে আলাপ আলোচনা করে আসল সত্যটা উদ্‌ঘাটন করে। এরা লাঠি এনে সাপটাকে আঘাত করতে থাকলে ব্যাঙ কামড় ছেড়ে দূরে সরে যায়। সাপটি মারা পড়ে। ঘটনাটি আমাদেরই দেশের পাঞ্জাব প্রদেশে ঘটেছিল।

তামিলনাড়ুর এক মালিক দশটি হাতি পোষতেন। এক রাতে একটি হাতি মারা যায়। মালিক তার উঠোনে মৃত হাতিটিকে এনে শায়িত করে রাখে। অন্যান্য হাতিগুলো টের পায়, এরা ছোটাছুটি করতে থাকে। মালিক সবকটি হাতিকেই বন্ধন মুক্ত করে দেয়। হাতিগুলো উঠোনে এসে মৃত হাতিটিকে ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। যখন মালিক মৃত হাতিটাকে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করে, তখন এঁরা শুঁড় উর্ধ্ব দিকে উঠিয়ে কী যেন একসঙ্গে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

মমত্ববোধ, বিয়োগ বেদনা, অনুরাগ, ক্ষোভ, প্রীতি কেবলই মানুষকে ঘিরে অবস্থান করে — তা নয়। সর্বজীবেই এই গুণাবলী বিদ্যমান আছে। মানুষ এদের উন্নত শিক্ষা দিয়ে জীবকল্যাণে কত বিস্ময়কর কাজ কবছে তা এখনো মানুষের অজানাই রয়ে গেছে। প্রাণী, অপ্রাণ, উদ্ভিদ সবকিছু নিয়েই আমাদের জীবন বেঁচে থাকে। একটার অভাব হলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর অকল্যাণ হবে তা আমাদের স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য। উন্নত জীব হিসেবে মানুষ নিজের ভোগটাকেই যেন বড়ো না মনে করে, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদরাও বিশ্ব পরিবারে আমাদের সহোদর।

অকাল প্রয়াত পুত্রের জীবন-নকশা·

বিচিত্র মানুষের জীবন-চরিত, বিচিত্র তার গতিপ্রবাহ, কখনো বাঁধ ভাঙা স্রোতের ন্যায় দুর্বার। পিতা হয়ে পুত্রের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছার পরিমাপ করতে পারিনি। হয়তো এটাই আমার জীবনের একটা চরম ব্যর্থতা।

একবার কড়া সুরে বড় ছেলেকে বলেছিলাম, 'একজন শিল্পী হয়ে এমন নিষ্ঠুর কাজটা করতে পারলে!' — ওর নিজের আঁকা সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবি ওর মনের মতো ফ্রেমে বাঁধাতে রাজি হইনি বলে, সে মুহূর্তের মধ্যে ছবিটা টুকরো টুকরো করে মাটিতে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আমি হতবাক। আমিও রাগে বলেছিলাম, 'আজই সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবি বাঁধিয়ে আমার ঘরের দেয়ালে টাঙাব।' আমি করেও ছিলাম তাই। দুর্দমনীয় একটা জেদ ছেলের মনে সত্যই সক্রিয় ছিল।

এর অনেক আগেই বড় ছেলে বিভাস নেতাজী ও কবিগুরুর ছবি দুটো এঁকে আমার মনে দারুণ উৎসাহ জুগিয়েছিল। ছবি দুটো আজও ঘরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে, অথচ সে চলে গেল চোখের আড়ালে চিরতরে। পরীক্ষা পাশের জন্য কত ছেলেমেয়েকে প্রতিবছর ছবি এঁকে দিত। বিএড্ পরীক্ষার্থী ওর দিদিকে ছবি এঁকে দিয়ে সাহায্য করেছিল। বিপ্লবীদের ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আঁকতে সে খুব পছন্দ করতো। ঘরে এখনো ছবিগুলো টাঙানো আছে।

শিশুকাল থেকেই সে ছিল ঘরমুখী। কমার্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশের পর মামার বাড়ি থেকেও কলেজ করতে চাইতো না। বি.কম পড়তে গেলে নিরলস প্রচেষ্টা দরকার। শিক্ষকেরও প্রয়োজন। আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক বন্ধুকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম ছেলেকে পড়াতে। ওঁনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রফেসর বন্ধুর বাড়িতে ছেলে একদিনের জন্যও যায়নি। বি.কম ফাইনালে কৃতকার্য হওয়া ওর সম্ভব হয়নি।

এদিকে আমার অজান্তেই বি-এ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিল। প্রতিদিন তেলিয়ামুড়া থেকে গিয়ে গিয়ে এম-বি-বি কলেজে পরীক্ষা দেবে স্থির করল। আমি বললাম, 'যদি কোনদিন গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে, তখন কী করবে?' সে প্রত্যুত্তরে জানাল, 'নারু মামা আমাকে সেদিন বাইকে নিয়ে যাবে এবং পরীক্ষার পর নিয়ে আসবে।' আমি এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলিনি।

এক-দু মাসের পড়াশোনায় বি এ পাশ করবে এটা ধারণায় আনাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলাফল বেরুল। সে নিজেও চুপচাপ। ফল জানার কোন আগ্রহ নেই। ফেল করেছে ধরেই নিয়েছি।

সে পুনরায় বি-এ পরীক্ষায় ফিস-ফরম জমা দিতে গিয়ে জানতে পারে—গত পরীক্ষাতেই সে পাশ করেছে।

আর্ট কলেজে তাকে ভর্তি হতে বললাম, আগরতলা থেকে কলেজ করতে হবে ভেবে রাজি হয়নি।

ওর বাল্যাবস্থায় রবীন্দ্র পরিষদের সঙ্গীত শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার সপ্তাহে একদিন আমার গৃহে অবস্থান করতেন। তখন থেকেই সঙ্গীতে সুর, তাল, লয় বিভাসের আয়ত্তে আসে এবং তবলা বাজনার শিক্ষায় অনেকটা পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

অর্থ রোজগারে তাকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য তার কথামতোই বাড়ির সামনে একটি পাকা দালান কোঠা তৈরি করে জেরক্স মেশিন, লেমিনেশন মেশিন এবং খাতাপত্র-কলম ইত্যাদি কিনে দিয়ে দোকান চালানোর ব্যবস্থা করে দেই।

এই ব্যবস্থাটা 'টি-আর-টি-সি' চৌমুহনীতে ভাড়াটে দোকানে করে দিতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি বলে বাড়ির সামনেই করতে হলো। এতে অর্থদণ্ড হলো প্রচুর, কিন্তু লোক সমাগমের অভাবে দোকান ভালো চলত না। মেশিন সামান্য কারণে অচল হলে কাজ বন্ধ করে সে অলস জীবন যাপন করতো। পান-জর্দার প্রতি ছিল মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ।

এমপ্লয়মেন্টে নাম রেজিস্ট্রি করেছিল। কয়েকটি ইন্টারভিউর মুখোমুখিও হয়েছিল। চাকুরি হয়নি।

পাঠ্য বহির্ভূত শত শত বই সে পড়াশোনা করেছে। বিশ্বের যে কোন খবরের খুঁটিনাটি তার জানা ছিল। ভালো অভ্যাসটা নিজের জীবনে আরোপ করতে সে ছিল অপারগ। তর্কে ওর সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই মুস্কিল ছিল। ওর স্নানাহার নিয়মিত ছিল না।

বি এ পাশের পরেই তাকে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলাম। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে নিয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে তা মেনে নেবে। মেয়েছিল দুর্দান্ত কর্মঠ, সুন্দরী, ছিপছিপে গড়নের এবং হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। মেয়ের বিধবা মা আমাকে আগে থেকেই জানতেন। সে আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে দেখতে গিয়ে 'মেয়ের বয়স বেশি' অজুহাত দেখিয়ে সে বিয়ের প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। আমরা আহত হয়েছি, কিন্তু তাকে বুঝতে দেইনি।

তিন বছর পর যখন এমপ্লয়মেন্ট কার্ড 'রিনিউ' করানোর সময় এলো, সে তা করাচ্ছে না। প্রচার করছে চাকুরি করবে না। আমিও উরুতে আঘাত পেয়ে জি.বিতে আছি। ফিরে এসেও কয়েক মাস চলাফেরা করতে কষ্ট হতো।

একদিন বাড়ির উত্তর পাশের বিষ্ণু চক্রবর্তীকে বললাম, 'ব্লক অফিসে বিভাসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওর এমপ্লয়মেন্ট কার্ডটা 'রিনিউ' করিয়ে দাও।'

ও যথাসময়ে এলো। বিভাসও যাবার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু হঠাৎ করে ওর মনে কী

প্রতিক্রিয়া হলো, 'হাতের নাগালে থাকা কাপ-প্লেট রাগে উত্তেজিত হয়ে ভেঙে চুরমার করল। আমি এই দৃশ্য দেখে আর কোনদিন ঐ কার্ড 'রিনিউর' ব্যাপারে তাকে চাপাচাপি করিনি।

ছেলে বিয়ে করবে না, এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত — এটা কোন মা-বাবা মেনে নিতে চায় না। আবার মেয়ের খোঁজ খবর পেয়ে পাত্র নিয়ে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু মেয়ে দেখে ওর পছন্দ হয়নি।

আমাদের জানাশোনা এক বাড়িতে ওদের এক আত্মীয়ার মেয়ে বেড়াতে এসেছে। ঐ মেয়েকে দেখার জন্য বিভাসকে পাঠালাম। সে দেখে এসে বলল, 'তোমাদের পছন্দ হলে এই মেয়েকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই।'

আমি কালবিলম্ব না করে মেয়েকে দেখতে যাই এবং মেয়ের মা-বাবাকে আমাদের বাড়িঘর দেখতে আমন্ত্রণ জানাই। পরে এই মেয়ের সঙ্গেই বিভাসের বিয়ে হয়।

বিয়ের পর পাঁচ-সাত বছর মোটামুটি ভালোই কেটেছে। এর মধ্যে এক নাতি এবং এক নাতনির মুখ দেখলাম আমরা। কিন্তু বিভাস চাকুরি পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে, অথচ দোকানের এমন কোন অগ্রগতি নেই, যা দিয়ে ওর সংসার চলতে পারে। আমি তাকে অভয় দিয়ে বলছি, 'যতদিন বেঁচে আছি তোমাদের খাওয়া-পরার কোন অভাব হবে না। ছোট ছেলের মাসিক দেয়-টাকা আর আমার পেনশন দিয়ে সংসার ভালোই চলেছে।

কিন্তু বিভাস ক্রমেই বউ, ছেলে মেয়ের দায়িত্বের কথা ভেবে প্রায়ই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। এভাবে চলল প্রায় বছর দুই। পরে ওর এমপ্লয়মেন্ট কার্ড আবার 'রিনিউ' করানোর ব্যবস্থা করি ছোট ছেলেকে দিয়ে।

এই কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার স্নাতক প্রার্থী চাকুরির ধর্না দিয়ে বসে আছে।

এমনি করে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তার নেতিবাচক ভূমিকা তার জীবনের অগ্রগতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। সে ক্রমেই তার অগ্রগতির পথ অন্ধকারময় দেখছে। তবুও আমি সাহস জুগিয়ে বলেছি, 'যারা বি-এ পাশ করে না, ওরাও অনেকে বিভিন্ন কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখে। এতোটা ভেঙে পড়ার কারণ কিছু নেই। মনে সাহস অবলম্বন কর।

এদিকে ওর বিয়ের কুঞ্জে দেখেছিলাম এক শুভলক্ষণ। একটি প্রকাণ্ড প্রজাপতি যতক্ষণ বিয়ের প্রক্রিয়া চলছিল সেই কুঞ্জে সেটি অবস্থান করেছিল। পরে কোথায় লুকিয়ে গেল জানি না। বিয়ের আসরে সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আমি ভাবলাম, ওর বিয়েটা এদিকে হবে — এটা যেন বিধির বিধান।

ওর মনটা সহজ সরল ছিল এটা মেনে নিতে পারি না। কোথায় যেন ওর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। আজও তা আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। কথাবার্তায় ধর্মীয় আলোচনায়,

নৈতিকতার প্রশ্নে তার যুক্তি ছিল ক্ষুরধার। কিন্তু নিজের জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিত।

এটা কি তার অন্তর্নিহিত কোন রোগের প্রাবল্য বশতঃ না অন্য কোন কারণ বুঝে উঠতে পারিনি।

হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর তার টাইফয়েড্ জ্বর ধরা পড়ে। মনে হয় শ্বশুরালয়ে যাবার আগেই জ্বর ছিল, সে রক্ত পরীক্ষা না করিয়ে জ্বরের অনেক ট্যাবলেট খেয়েছে। তাতে টাইফয়েড্ জ্বর ধরা পড়তে বিলম্ব হয়। টাইফয়েডের চিকিৎসা যথাসময়ে না হওয়ায় ওর শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীর অনেক ক্ষতি করেছিল বলে আমার বিশ্বাস।

বহু চিকিৎসায়ও শরীরটা পুরোপুরি সুস্থ করা গেল না। দেহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারেও সে চরম গাফিলতির পরিচয় দিয়েছে। একবার দু বোতল রক্ত দেহে গ্রহণ করার পর হাসপাতালের সিট থেকে বেরিয়ে এসে অটোতে বসে থাকে। ও কিছুতেই হাসপাতালে থাকবে না জেদ ধরল। নিরুপায় হয়ে নিয়ে এলাম বাড়ি। মাসখানেক অন্য এক ডাক্তার পাঁচ-ছয়টা পরীক্ষার কথা লিখে দিল। তিনটা করানোর পরেই বাকি পরীক্ষাগুলো করতে টাকা দিয়ে আমরা অন্যত্র ক'দিনের জন্য বেড়াতে গেলাম। বাড়ি ফিরে জানলাম টাকা খরচ করে বসে আছে। আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না— বলছে।

কিছুদিন পর আবার অচল হয়ে পড়ল। ডাঃ শ্যামল রায় পরীক্ষা করে বললেন, 'হার্টে জল জমেছে।'

আবার জি.বিতে পাঠালাম। প্রতিদিন নয়শ টাকা করে এন্টিবায়োটিক সাতাশটা প্রয়োগ করার পর শারীরিক ও হার্টের জল জমা অপসারিত হলো। খবর এলো সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমি নিজেও গিয়ে দেখে এলাম।

৩১ শে জুলাই, ২০১১ ইং কোলকাতার এক ডাক্তারকে দেখানোর পর ও বাড়ি ফিরে আসবে।

৩০শে জুলাই সকাল আটটায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। রাত ৯টার পর মারা যায়। এরপর বেঁচে থাকলেও আর বিছানা থেকে উঠতে পারতো না। একদিক সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে গিয়েছিল।

ওর বয়স যখন দুই তিনমাস তখন আগরতলার এক শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখালে ওকে কোন কিছু খাওয়ানোর পর কিছু সময় উপুড় করে রাখতে বলেছিল। এরপর থেকেই শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দেয় এবং হার্ট আক্রান্ত হয়। ডাক্তারের ভুল পরামর্শের জন্যই ছেলের এই দুর্দশা — একথা ডাক্তারকে ওর মা বলায়, ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ঘর থেকে মা ও ছেলেকে বের করে দেয়।

নিরুপায় হয়ে তাকে কোলকাতার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় হার্টের উন্নত চিকিৎসা সহজলভ্য ছিল না। অপারেশন করালে প্রতি হাজারে মাত্র তিন চার জন বেঁচে থাকত। আমি অপারেশনে বাধা দেই।

ওর বয়স যখন বার-তের এই সময়টা ওর খুবই খারাপ সময় ছিল। মৃত্যুর খবর, অপারেশনের দৃশ্য, টিভিতে দেখলে কিংবা বীভৎস গল্প শুনলে সে জ্ঞান হারাতো।

এমন সময় কোলকাতা থেকে হোমিও অধ্যাপক ডাঃ বি. পাল প্রতিমাসে ইউনাইটেড্ হোমিওহলে একবার আসতেন। ওঁর চিকিৎসায় বিভাস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর পঁচিশ-ত্রিশ বছর সুস্থ জীবন কাটিয়েছে।

টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার পর হার্টে জল জমে আবার করুণ পরিণতির দিকে ঢলে পড়ে।

এরজন্য সে নিজেও অনেকটা দায়ি। ওর স্নানাহার নিয়মিত ছিল না। পান-জর্দার প্রতি ছিল মাত্রাতিরিক্ত লোভ। খাদ্যাখাদ্যে বাছ-বিচার ছিল না। ক্ষতিকর খাদ্য যেমন ইলিশ, শুঁটকি খাওয়ার প্রতি ছিল লোভ। এক কথায় সে জিহ্বা সামলাতে পারতো না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এসব নিয়ে প্রায়ই খটাখটি হতো। মাসে অন্ততঃ দশ দিন জেদ করে সময়ের আহার সময়ে করতো না। এমন কি শুধু পান, জল খেয়ে চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়ে দিত।

আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'আত্মাকে কষ্ট দিও না, এর পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে' আবার বলতাম, 'মানুষ বনের পশুকে গৃহে এনে পোষ মানায়, তুমি কেন বউকে অনুগত রাখতে পার না? আমি বলব, এটা তোমারই অক্ষমতা।' দাম্পত্য প্রেম প্রজ্জ্বলিত রাখতে গেলে সলতে এবং তৈলের বিচ্ছেদ ঘটানো যায় না। পরিশেষে বুঝতে পেরেছিলাম, দেহের যন্ত্রণায় সে সর্বদাই কাতর থাকতো। সে ওর মাকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলেছে, ওর মা মুহূর্তেই তা ভুলে গিয়ে ছেলের আদর যত্ন করেছে, কিন্তু ওর স্ত্রীর সেবাযত্ন, আমাদের কাছে প্রশংসার দাবি রাখলেও, স্বামী হিসেবে বিভাস মমত্ববোধের অভাব অনুভব করেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

প্রহ্লাদ দাস

জিম্পির আকস্মিক মর্ম বেদনা

আমার একটি পোষা কুকুরি ছিল। যার নাম ছিল জলি। জলির একটি কন্যা সন্তান আছে। তার নাম জিম্পি। জিম্পির জন্মের পর থেকে সে তার মা জলির সাথে সাথেই থাকতো, খেলতো, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া করতো। এমন কি এক সাথে ঘুমোতও। জিম্পির যখন চার বছরের মত বয়স হবে তখন তার মা তৃতীয় খেপে আবার বাচ্চা দেয়। জলি তৃতীয়বার বাচ্চা দেয়ার পর বাচ্চাগুলির চোখ ফোটার পরদিনই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। দুর্ভাগ্যবশত তাকে চিকিৎসা করারও সময় পাইনি।

জলি মারা যাওয়ার পর জিম্পি পাগলের মত হয়ে যায়। জলিকে জিম্পি বাচ্চাদের কাছে দেখতে না পেয়ে সে এঘর সেঘর সারা বাড়ির আনাচে-কানাচে তচ্‌নচ্‌ করে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে খুঁজত। কিন্তু কোথাও যখন পেত না, তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে এসে বাচ্চাগুলিকে আগলে তার কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকতো। তার মায়ের অনুপস্থিতিটা জিম্পির মনে এত বেশি আঘাত করেছে যে, সে কোন কিছুতেই আনন্দ পেত না, উৎসাহ পেত না! বাঁচতে হলে যে খেতে হবে, সেই খাওয়াতেও তার কোন ইচ্ছা ছিল না। তার মা যে আর এ জগতে নেই, তা বুঝতো কিনা একমাত্র সে-ই জানে।

দিনের বেলা যে ঘরে জলি ও জিম্পি থাকতো সে ঘরে জোরেবলেও জিম্পিকে নেয়া যেত না। যদিও বা কোনক্রমে সে ঘরটায় নেয়া যেত, ছাড়া পেলেই একলাফে সেই ঘর থেকে জিম্পি বের হয়ে যেত, আর সেদিকে যেতই না, বরং করুণ দৃষ্টিতে সেই খালি ঘরটার দিকে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকতো। আর জোর করে নেয়ার চেষ্টা করলে উচ্চৈঃস্বরে ঘেউ ঘেউ করে কাঁদতো।

জিম্পি তার মা জলিকে যেদিন থেকে কোথাও দেখে না— সেদিন থেকে সে কিছুই খায় না। এমনকি জল পর্যন্ত খায় না। ওর সামনে কোন খাবার দিলেই খাবারের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। ভাল করে তার চোখের দিকে লক্ষ করে দেখেছি, তার দু'চোখ জলে ভিজে আছে। এভাবে সে দীর্ঘ ১৫ দিন কিছুই না খেতে খেতে একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এই ১৫ দিন জিম্পিকে সিরিঞ্জে জল, দুধ, গ্লুকোস্‌ একটু একটু করে খাওয়াতাম। তাতেও সে খেতে জোর করতো। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মুখ খিঁচুনি দিয়ে রাখতো।

আগে বাড়িতে কোন নতুন লোক আসলে হৈ চৈ করে ডাকাডাকি করতো। এখন আর তা-ও করে না! শুধু চুপচাপ এখানে সেখানে বাচ্চাদের আগলে পড়ে থাকে। আর দীর্ঘশ্বাস

ফেলে। বচ্চাদেরকে জিব দিয়ে চেটেচুটে আদর করে। জিম্পির দীর্ঘশ্বাস শুনে আমার মনে হতো জিম্পি বোধ হয় মনে মনে বাচ্চাদের বলতো, অভাগীরা তোরা বড় হয়ে আর আমাদের মাকে দেখতে পাবি না। মা যে কোথায় হারিয়ে গেছে তা-ও জানিস না।

জিম্পির মনের ও শরীরের এই অবস্থা দেখে আমি তো মহাচিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষপর্যন্ত ওকেও না হারাই!

তাই, তারপর একদিন দুধ ভাত একটু চিনি মিশিয়ে লেই করে জোর করে তার মুখ হাঁ-করে ধরে গলায় দিয়ে দিলাম। দেখলাম, সে সেই খাবারটা গিলে ফেলল। মনে একটু ভরসা পেলাম। সেই থেকে দু'বেলাই জোর করে কোনদিন দুধভাত, কোনদিন মাছের কাটা ছাড়িয়ে মাছভাত, কোনদিন মাংসের হাড় ছাড়িয়ে মাংসের ঝোল দিয়ে মাংস ভাত খাইয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

অনেকদিন ওর প্রিয় খাদ্য বাটিতে করে ওর সামনে ধরেছি, সে সেই খাবারটাকে একবার মাত্র চেয়ে দেখত, তারপরই অন্যত্র চলে যেত। জিম্পি তার মায়ের মৃত্যুতে নিজে খাওয়ার কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ওর ছোট ছোট ভাই-বোনদের ভুলতে পারেনি। তাদের নিয়েই লাফালাফি করে। যাতে ওরা ওদের মায়ের অভাবটা বুঝতে না পারে। আর মাঝে মাঝে কোথায় যেন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কিন্তু ছোট ছোট ভাই-বোনদের সময় মতো খাওয়ানো হচ্ছে কিনা সে দিকে ঠিক লক্ষ রাখতো। ভাই-বোনদের সময় মতো না খাওয়ালে আমাদের দিকে তাকিয়ে গোঙাতো। শুধু তাই নয়, মা হারা ভাই-বোনদের মা জলির মতই যত্ন করতো। নোংরা পরিষ্কার করে দিত। ছোট ছোট ভাই-বোনদের যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হতো, তখন ওদের মাথায় মুখে চেটেচুটে আদর করতো। কিন্তু নিজের খাওয়া-দাওয়ার কথা মোটেও ভাবতো না।

একদিন, ভাই-বোনরা যখন বছর খানেকের হলো, তখন সেও অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থ অবস্থায়ও ভাই-বোনদের যত্ন করতো, মাথায়, মুখে চেটেচুটে আদর করতো। বুক দিয়ে আগলে রাখতো, আর চোখ ভিজিয়ে কাঁদতো।

আমাদের আদরের জিম্পিও একদিন চিকিৎসা করা সত্ত্বেও আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ করে চলে গেল। বোধ হয়, মায়ের মৃত্যুটা জিম্পি সহ্য করতে পারেনি। তাই আমার কোলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

গোবরের মহিমা

এক

—বাবা রে, আর আগ্যাইস না, আর অগ্যাইস না।

— কে রে গো মা?

—উডানবাড়ি ঝাড়ু দিছি ত। আইচ্ছাইল আস্তাকুঁড় ঝাড়ু দিছি। সব একখান অইয়া গেছে।

— ও বুঝছি। আমি যেন পচ্ছাব করতাম যামু মা।

—এক কাম কর বাবা, ঘরের ধাইরে দেখ্, গোবর ও পাতিল আছে। পাতিলডাত্ জল লইয়া তার মইধ্যে গোবর গুইল্যা যে উডানবাড়ি ঝাড়ু দিছি, হেই জাগাত গোবরসিডা দিয়া জাগাডারে শুদ্ধ কইরা পড়ে পচ্ছাব করতি যা। কেমুন?

—আইচ্ছা মা।

—আমার ত আবার ছান করতে দিরং অইব। কেডা না কেডা আবার ফট্ কইরা আইয়া পড়ে।

—ঠিক অই কইছ মা।

মায়ের কথামত ঝাড়ু দেয়ার জায়গায় গোবর জল মিশিয়ে গোবরসিডা দিয়ে পেচ্ছাব করতে গেল গোরা। কিন্তু পেচ্ছাব করতে করতেই তার মনে হলো গোবরসিডা তো একটি অন্যটির গা লেগে পড়েনি। মধ্যে মধ্যে আবার কিছু কিছু যায়গা গোবরসিডাহীনও রয়েছে, ঐ যায়গাগুলি কী করে শুদ্ধ হলো। তাই গোরা মাকে ডেকে বলল, মা, ওমা, যে যায়গাডাত গোবরসিডা পড়ছে না, হেই যায়গাডা কেমুন কইরা শুদ্ধ অইলো গো মা?

— ইডা তুই বুঝদি না। হেই জায়গাডাত গোবরের গন্ধ অইলেঅ গেছে। ইডা আমরার হাউরি (শাশুড়ি) কইছে, আইচ্ছাইল-মাইচ্ছাইল ঝাড়ু দিয়া গোবরসিডা দিলেঅই যায়গাডা শুদ্ধ অইয়া যায়।

দুই

সালটা আমার মনে নেই। খুব সম্ভব সাতের দশকের প্রথম ভাগ। একটা সাবডিভিসনাল শহরের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকুরি করি। এবং শহরেরই একটা মেসবাড়িতে বসবাস করি আমরা কয়েকজন শিক্ষক।

আমাদের দুইবেলা রান্না করে একজন পরিচারিকা। সেই পরিচারিকাকে সকলেই

বিশুর মা বলে জানে ও এই নামেই তাকে ডাকে। বিশুর মায়ের কাজ হলো আমাদের রান্না করে দেয়া। আমরা নিজেরা নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি। বিশুর মা রাত্রিবেলার রান্না করে মাঝারি থেকে একটু ছোট একটি মাটির মটকায় জল রেখে রান্নাবান্না হওয়ার পর চুলায় যে আগুন থাকে তারমধ্যে সে মটকাটা রেখে যায়। সেই আগুনে জল ফোটে সমস্ত রাত্রে মটকার জল ঠাণ্ডা হলে পরদিন সকালে এসে ফিল্টারে ভরে দেয়। ঐ জল ফিল্টার হলে আমরা তা টিফিন করার পর, ভাত খাওয়ার পর, এমন কি তৃষ্ণা পেলেও ঐ জল পান করি।

একদিন পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। দীর্ঘ সময় ছুটির দিন বলে মেস বাড়িতে আমরা দুইজনই আছি। আমি ও অমল। এক জায়গায় অনেকদিন থাকার ফলে সম্বোধনটা তুই-তোকারে এসে গেছে।

সেদিন পূর্ণচন্দ্রগ্রহণ বলে বিশুর মা সন্ধ্যার অনেক আগেই রান্নাবান্না করে আমাদের ডেকে বলেছে, বাবু গো, আপনেরা ছয়ডার আগেঅই খাইয়া লাইয়েন। ছয়ডাত্থন ত চন্দগহন। গহনের সময় খাউন ভালা না বাবু।

যাক্, আমরা দুই বন্ধু আমাদের কাজ আমরা করেছি।

পরদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে টিফিন করার আগে কেউ পত্রিকা পড়ছি, কেউ রেডিও শুনছি। বিশুর মা কাজ করছে। তাই তাকে ডেকে আমাদের টিফিন দিতে বললাম।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম বিশুর মা ফিল্টারের জল সব ফেলে দিচ্ছে। আমি বিশুর মাকে ডেকে বললাম, বিশুর মা, একি করছো? আমরা জল খাবো কোত্থেকে?"

—বাবুগো, গহনের জল খাউন বালা না। হেলাইগ্যানে ফিল্টারের হগল জল ফেলাইয়া দিছি।

—তাহলে এখন আমরা জল পাবো কোথায়?

— হেই বেবস্থাও আমি কইরাঅই রাখছি।

— কী করে জলের ব্যবস্থা করলে?

— গতকাইল রান্দুনের পরে মাটির মটকাডাও জলে ভইরা রাখছিলাম। হেই জল আগুনে ফুইট্টা সারারাইত ঠাণ্ডা অইয়া আজগার খাউনের আন্দাজ অইয়া রইছে।

— কেন? ঐ জলটার মধ্যে গ্রহণ লাগেনি?

—কেমনে লাগবো বাবু? আমি যেন মটকাডার তলে গোবর মাইখ্যা রাখছি।

তিন

শহরের আশেপাশের এক শিক্ষিত পরিবার। স্বামী-স্ত্রী একটি বখাটে সন্তান ও কর্তার মাকে নিয়েই এই পরিবার। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকুরি করেন। গানের জগতে মহিলার সুখ্যাতি আছে। শাশুড়ি মা অনেকটা সেকেলের ব্যক্তিত্ব।

ঘরে আধুনিক আসবাবপত্রে সুজ্জিত। সেই অনুযায়ী ডাইনিং রুমে ডাইনিং টেবিলও রয়েছে। আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই ডাইনিং টেবিলেই খাওয়া-দাওয়া করেন। কিন্তু কর্তার মা ফ্লোরে পিঁড়ি বিছিয়ে পিঁড়ির ওপর বসেই খান। এবং খাওয়ার পর পুত্রবধূ যতই আধুনিক ছোঁয়া রমণীই হোক না কেন, শাশুড়ির নির্দেশে খাওয়ার জায়গাটা গোবর মিশ্রিত জল দিয়ে মুছে নিতেই হয়।

একদিন বাড়িতে কী একটা অনুষ্ঠানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনরা সেই ডাইনিং টেবিলে বসেই খাওয়া-দাওয়ার পর—গিন্নি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের পরিচর্যায় একটু ব্যস্ত ছিলেন। অমনি শাশুড়ি উর্ধ্বশ্বাসে বৌমাকে ডাকতে আরম্ভ করে দিল; বৌ, অ বৌ, শুনছো? তোমরার খাওন-দাওনের টেবিলডা মুছলা না?

— মা, আমি টেবিলটা মুছেছি তো। ভাল করেই সার্ফ দিয়ে মুছেছি। আপনার সামনেই ত মুছলাম।

— হঃ, দেখছি! দেখছি বইল্লাই ত কইতাছি। মাছ মাংসের আইডা কী আর সাবান সোডায় শুদ্ধ অয়! গোবর ত দিওনই লাগে। প্রত্যেক দিনঅই ত ইডা কর। আজকা করলা না কেন?

— মা গো, এতগুলি আত্মীয়স্বজনের সামনে যদি ডাইনিং টেবিলে সার্ফ দেয়ার পর আবার গোবর দেই, তবে ওরা কী ভাববেন বলুন তো?

— কেডা কী ভাবলো আর না ভাবলো এডায় আমার কোন কাম্ নাই! টেবিল টুবিলে মাছ মাংস খাইয়া আইডা করলে সাবান সোডায় শুদ্ধ অয় না, হেখানে গোবর দিওনই লাগে! তবেঅই মাছ মাংসের আইডা দূর অয়, বুঝলা? তোমরা ত মান না। আমরার হাউড়িরা যা কইছে তাঅই আমরা মাইন্যা চলছি, বুঝছ?

শিক্ষকতা জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা

আমি চাকুরি জীবনে একেবারে নতুন। চারপাঁচ মাসও হয়নি। বয়সও মোটামুটি বেশি নয়। ২৫ বৎসর তখনও হয়নি। একটি অজপাড়াগাঁয়ের সিনিয়র বেসিক স্কুলে প্রথম জয়েন করেছিলাম। তারপর কয়েক মাস পরই একটা সাবডিভিশনাল শহরের একাদশ শ্রেণির উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছি।

স্কুলে তখন একাদশ শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার একটা হলে আমি এবং

এই বিদ্যালয়েরই আমার এক সিনিয়র দাদা, স্কুলের পণ্ডিতমশাই ডিউটি করছি। হলে একটি বসার টেবিল ও একটি মাত্র চেয়ার ছিল। তাই খাতা ও প্রশ্নপত্র ছাত্রছাত্রীদের দেয়ার পরে আমি পায়চারি করছি আর দাদা ঐ চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছেন। পরীক্ষার হলে তিনটি সারিতেই পরীক্ষার্থী পরিক্ষার্থিনীরা বসেছে। তাই দুই দিকেই দুটি পায়চারি করার, ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নপত্র ও খাতাপত্র দেয়ার প্রশস্ত দীর্ঘ স্থান রয়েছে।

পরীক্ষার এক ঘণ্টা কেটে গেল। পরিক্ষার্থী ও পরিক্ষার্থিনীরা লিখে চলেছে। দাদা বিশ্রাম করতে করতে একটি বই পড়ছেন আর আমি পায়চারি করছি। আমি লক্ষ করছি, কে কেমন লিখছে। হঠাৎ মনে হলো হলেরই একটি মেয়ে, প্রায় সকলের চেয়ে বয়স একটু বেশিই হবে, সে বোধহয় নকল করার চেষ্টায় আছে। ওর হাবভাব দেখে তা আমার মনে হচ্ছে। কারণ যতবারই ওর কাছে গেছি ও যেন কেমন আড়ষ্টই হয়ে যাচ্ছে।

আমি নিজে নিজেই চিন্তা করলাম, ওকে নকল করার সুযোগ দিয়ে ওর নকল করা ধরবো, নাকি নকল করার সুযোগই দেব না। সিদ্ধান্ত করলাম ওকে নকল করার সুযোগই দেব না। তাই অন্য সারির কাছে একবার পায়চারি করলে ওর সারির সামনে তিনবার পায়চারি করি। যাতে সেই মেয়েটি নকল করার সুযোগ না পায়। তার সারিতে পায়চারি করার সময় মেয়েটি হঠাৎ আমাকে বলে বসলো, স্যার, আপনি শুধু এদিকেই ঘোরাফেরা করছেন। অন্যদিকেও ত ঘোরাফেরা করতে পারেন।

আমি হঠাৎ মেয়েটির এমনতর কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, দেখ, কোথায় কিভাবে কতবার ঘোরাফেরা করতে হবে সেটা আমার ডিউটি, আর তোমার ডিউটি হলো খাতায় প্রশ্নোত্তর লেখা। বুঝলে? তাই, তুমি তোমার প্রশ্নোত্তর লিখে যাও, কেমন?''

—স্যার, এভাবে আমাদের সারিতে বেশি ঘোরাঘুরি করলে আমি ভীষণ ডিস্টার্ব ফিল করি। কিছুই লিখা আমার হয়ে ওঠে না।

— এই সারিতে শুধু কি তুমিই আছ? নাকি আরও ছাত্রছাত্রী আছে? ওরা তো তোমার মত কথা বলছে না বা ডিস্টার্ব ফিল করছে না?

— সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার। আমার অসুবিধের কথা আমি আপনাকে বললাম।

—তর্ক করো না। চুপচাপ লিখে যাও।

মেয়েটি চুপমেরে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর পর কী লিখে সে-ই জানে। আমার আরও সন্দেহ হলো। এবার আমার মত পাল্টালাম অর্থাৎ ওকে নকল করার সুযোগ দিয়েই ওকে হাতেনাতে ওর নকল করা ধরবো।

আমি আমার সতীর্থ দাদাকে বললাম, দাদা আপনি স্টাফরুম থেকে একটু ঘুরে মনটাকে চাঙা করে আসুন।

— তুমি একা একা সামলাতে পারবে তো ?

—আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সামলে নেব। আপনি যান। ঘুরে আসুন।

দাদা চলে গেলেন স্টাফরুমে। আমি পায়চারি রেখে চেয়ারে এসে বসলাম। এবং দাদার রেখে যাওয়া বইটা দেখতে লাগলাম আর মাঝে মাঝে বলতে লাগলাম, ভালো করে প্রশ্নোত্তর লিখে যাও। নকল টকল কেউ করো না। ধরতে পারলে কিন্তু ছাড়বো না। আবার দাদার রেখে যাওয়া বইটায় মনোযোগ দিলাম। আসলে বই-এর দিকে আমার মোটেও মনোযোগ নেই। কিছুক্ষণ পর পরই আড়চোখে মেয়েটার দিকেই লক্ষ রাখছি। এমন সময় কিছু ছেলেমেয়ে বললো, স্যার কাগজ লাগবে।

— নিয়ে যাও এসে।

আমি লোজসিটে সই করে দিচ্ছি আর ছেলেমেয়েরা নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার একচোখ সেই মেয়েটার দিকেই রাখছি। আবার মাঝে মাঝে অন্যদেরও দেখছি। তবে মেয়েটির দিকেই বেশি লক্ষ রাখছি। আমার ব্যস্ততা দেখে এবার মেয়েটি নকলের চিরকুট বের করেছে। ভেবেছে, আমি ব্যস্ততার মধ্যে কিছুই লক্ষ করতে পারব না। ছেলেমেয়েদের কাগজ দিয়ে আবার বই-এ ভান করে মিথ্যে মনোযোগ দিচ্ছি। এবার মেয়েটি নকলের চিরকুট দেখে দেখে ক্ষিপ্রতার সাথেই লিখতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে তার বিন্দুমাত্রও মন নেই। শুধু নকলের চিরকুটের দিকেই মনোযোগ। আমি এই ফাঁকে অন্য সারির রাস্তা ধরে মেয়েটির পেছনের দিকে এসে নকলটি ধরতে যাব, ঠিক এই সময়ে মেয়েটি টের পেয়ে নকলের চিরকুটটা মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে লাগলো। আমি বললাম, এই মেয়ে, নকলের চিরকুটটা মুখ থেকে বের কর ?

— কৈ নকল স্যার ? আমি তো নকল করিনি ?

—তুমি নকলটা মুখে পুরে দিয়ে, তা চিবুচ্ছ।

— স্যার, আপনি আমাকে নকল করার মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন কেন ? আমি তো সুপুরি চিবুচ্ছি।

— আবার মিথ্যে কথা বলছো ?

—স্যার, আপনি আমাকে লিখায় ডিস্টার্ব করছেন। আর নকল করার অপবাদ দিচ্ছেন ও আমাকে অপমান করছেন। এটা কিন্তু ঠিক করছেন না স্যার!

—কিসের মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছি ? তুমি নকল করছো আর আমি নকল ধরতে গেছি, অমনি টের পেয়ে সে নকলটা মুখে পুরে দিয়েছো। তুমি শুধু মেয়ে বলেই আমি তোমার মুখে ধরিনি। নতুবা নকলটা এখনই মুখ থেকে বের করে নিতাম।

—মিথ্যে কথা, আমি নকল করিনি আর নকলটা মুখেও পুরে দিইনি।

রাগে, ক্ষোভে আমার শরীর রীতিমত কাঁপছে। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে বলছে,

স্যার, আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। লিখতে ভুল করছি। আমি তৎক্ষণাৎ দরজায় দাঁড়িয়েই চিৎকার করে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে ডাকছি। আমার হাঁকডাক শুনে পণ্ডিতমশাই নিজেই চলে এলেন। পণ্ডিতমশাইকে হলঘরে রেখে আমি হেডমাস্টার মশাইকে আনতে গেছি। হেডস্যার পরীক্ষার হলে আসা মাত্রই মেয়েটি মেকি কান্না জুড়ে বলল, স্যার, আমি নকল করিনি! তবুও স্যার আমাকে নকল করার মিথ্যে অপবাদে প্রশ্নোত্তর লিখায় বাধার সৃষ্টি করছেন! হেডমাস্টার মশাই মেয়েটিকে বললেন, তুমি আমার রুমে চল। এখানে তোমাকে আমি কিছু বলবো না।

—বাকি প্রশ্নের উত্তর লিখার সময় পাবো না যে স্যার!

—ঠিক আছে। যে সময় নষ্ট হবে আমি তোমাকে সেই সময় প্রশ্নের উত্তর লিখার জন্য দেব, চল, আমার রুমে চল।

হেডস্যার আমাকে বললেন, মাস্টারমশাই, স্টাফরুম থেকে গীতা দিদিমণিকে নিয়ে আমার রুমে আসুন তো!

আর একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে পাঠালেন স্থানীয় প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের একজন লেডি ডাক্তারকে স্কুলে বিশেষ প্রয়োজনে ডেকে আনার জন্য।

স্যারের রুমে গীতা দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে গেলাম। স্যার তখন দিদিমণিকে বললেন, দিদিমণি, পাশের খালি রুমটায় মেয়েটিকে নিয়ে ওর শরীর সার্চ করে দেখুন তো, কোন নকল-টকল আছে কিনা!

দিদিমণি মেয়েটিকে অন্য রুমে নিয়ে গেলেন এবং ওর সমস্ত শরীর ভাল করে সার্চ করলেন এবং হেডস্যারকে এসে বললেন, স্যার মেয়েটির শরীরে কোনরূপ নকলের চিহ্নমাত্র বা কোন চিরকুট পাইনি। মেয়েটি বলল, দেখলেন তো স্যার, নকল যদি করতাম তবে আরও নকলের চিরকুট আমার কাছে থাকতো! স্যার আমাকে শুধু শুধু নকল করার অপবাদ দিচ্ছেন!

— দেখ, এখনও সত্যি কথা বল। সত্যি কথা বললে বাকি পরীক্ষাগুলি দিতে পারবে। নতুবা তোমাকে কোন পরীক্ষাই দিতে দেয়া হবে না।

মেয়েটি আবার বলল, আমি তো নকল করিনি স্যার! শুধু শুধু আমাকে নকল করার অপবাদ দিচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তিনি শুধু আমার কাছে কাছেই ঘুরঘুর করে ঘুরেছেন। আর বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। এটা ওনার কেমনতর আচরণ স্যার?

মেয়েটি আমাকে অপমান করার আর একটি চাল চালল। আমি তো রাগে-দুঃখে রীতিমত কাঁপছি। হেডস্যার আমাকে কাছে ডেকে আস্তে আস্তে বললেন, আপনি কি সত্যি সত্যি মেয়েটিকে নকল করতে দেখেছেন? আর নকলটি কি সত্যি সত্যিই ওকে মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে দেখেছেন?

—স্যার, কোনদিনও আপনার সাথে আমি মিথ্যে বলিনি, আজকে কেন বলবো স্যার ? যেখানে ও আমার ব্যক্তিগত সম্মান নিয়ে কথা বলছে।

— ঠিক অছে, আপনি বসুন। লেডি ডাক্তার বোধ হয় এসে গেছেন। ওনার গাড়ির শব্দ পেলাম। এমন সময় লেডি ডাক্তার এসে বললেন, ভেতরে আসতে পারি ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আসুন, বসুন দয়া করে।

তারপর লেডি ডাক্তারের কাছে হেডস্যার মেয়েটির সম্বন্ধে এবং আমার সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন। তখন লেডি ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটির দিকে তাকানো মাত্রই মেয়েটি কাঁদো কাঁদো স্বরে লেডি ডাক্তারের কাছে এসে বলল, দেখেছেন দিদিমণি, আমার পরীক্ষাটা বাতিল করার জন্য কী রকম মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন এই স্যার! আমার দিকে নির্দেশ করে।

লেডি ডাক্তার তখন হেডস্যারের দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে তাকে মেডিক্যাল টেস্ট করাতে হবে।

—প্রয়োজন হলে তা-ই করাবেন।

এবার আমাকে লেডিডাক্তার বললেন, আপনি কি ঠিকই দেখেছেন, মেয়েটা নকলটা চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছে ?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম।

এবার মেয়েটিকে লেডিডাক্তার বললেন, শোন মেয়ে, আমার কাছে এসো এবং কানে কানে শোন, তোমাকে দুটো কথা বলবো।

—বলুন দিদিমণি।

কিছুক্ষণ মেয়েটিকে লেডি ডাক্তার কি বললেন শোনা গেল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মেয়েটি লেডি ডাক্তারের পায়ে পড়ে কান্না জুড়ে দিল এবং বলল, দিদিমণি, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমি সত্যিই নকল করেছি এবং এতক্ষণ নিজে বাঁচার জন্য মিথ্যেই বলে এসেছি।

শিক্ষক

স্যার আসতে পারি?

আমি তখন ক্লাশ নিচ্ছিলাম। লাইফ সায়েন্সর ক্লাশ। তখনকার দিনের একাদশ শ্রেণির লাইফ সায়েন্সর ক্লাশ। সনটা খুব সম্ভব ১৯৬৯ সন হবে। আমার মনোযোগ তখন ক্লাশে পড়ানো টপিক্স এর দিকে। তাই, শুনেও তার কথার উত্তর দিতে পারছি না। টপিক্স পড়ানো শেষ করে এনেছি। এমন সময় আবার একটি ছাত্রের কণ্ঠস্বর।

—স্যার, আমরা আসতে পারি?

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিপুল অর্থাৎ বিপুল দাস। এবারেরই বিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্র। যারা এবারই বিদ্যালয় থেকে কলকাতা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেবে। তার সাথে আরও অনেক বিদায়ী ছাত্রছাত্রী আছে।

— আয়।

— স্যার, আমরা সকলেই আপনার লাইফ সাইন্সের। আপনার কাছে সব শেষে এসেছি। ভাবলাম, স্যার তো আমাদেরই, তাই স্যারের কাছে পরে গেলেও স্যার রাগ করবেন না।

— আরে বোকা! এতে রাগ করার কী আছে? ভিতরে আয়। তোরা দেখছি সকলেই এসেছিস।

— হ্যাঁ, স্যার।

— সকল ক্লাশেই গিয়েছিলি তো তোরা? বিদ্যালয়ের সকল ভাই-বোনদের সাথেই দেখা করেছিস তো?

— হ্যাঁ, স্যার।

— আর সকল ক্লাশের স্যারেদের সাথে দেখা করে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েছিস তো?

— স্যার, ক্লাশে যে স্যারেরা ছিলেন তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ তো ক্লাশেই নিয়েছি। শুধু আপনি বাকি ছিলেন। আপনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আমরা বাড়ি চলে যাবো।

এই বলে বিপুল মাথার পেছনে হাত নিয়ে মাথায় চুলকাতে চুলকাতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পেরে বিপুলকে বল্‌লাম, কিছু বলবি?

— হ্যাঁ সার, ছোট ভাইবোনদের কাছে আমাদের বক্তব্য থাকবে, কীভাবে আমরা বিগত এগারটি বছর.কাটিয়েছি।

— বেশ, বেশ। আমি তোর কথা শুনে খুউব খুশি হয়েছি। ঠিক আছে, তোদের কী বক্তব্য আছে তা বল। কথাটা বলেই আমি আমার চেয়ারে বসলাম। বিপুল ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে বলতে আরম্ভ করলো।

শ্রদ্ধেয় স্যার, ও আমার স্নেহভাজন ছোট ছোট ভাইবোন, আমরা এই বিগত এগারটি বছর অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার মাধ্যমে ও শ্রদ্ধেয় স্যার ও শ্রদ্ধেয়া দিদিমণিদের নেয়া ক্লাশগুলি মনোযোগের সাথে, তাদের দেয়া উপদেশ ও শেখানো শিক্ষা গ্রহণ করেছি। স্যার ও দিদিমণিদের যথেষ্ট সম্মান দিয়ে চলেছি। এ স্কুলকে আমরা ভীষণ ভালবাসি। আর..... তোমরাও...।

তাদের বক্তব্য শেষ হলে আমি এই ক্লাশেরই একজন মেয়েকে বললাম, এই শান্তা— তুই দাদা-দিদিদের মঙ্গল কামনায় কিছু বল।

বিদায়ী ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের যথাক্রমে উপদেশমূলক ও মঙ্গল কামনার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ক্লাশ থেকে তথা আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় প্রত্যেকেই আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। একটি মেয়ে শুধু হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার জানালো এবং বলল, স্যার,আসি! আশীর্বাদ রাখবেন।

— তোদের প্রতি আমার আশীর্বাদ ছিল, আছে এবং তা সব সময়ই থাকবে। তোরা সকলেই পরীক্ষায় সফল হয়ে এবং পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে বিদ্যালয়ের এবং বাবা-মা-এর মুখ উজ্জ্বল করবি।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হলো ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, কিন্তু এই মেয়েটি আমার পা ছুঁলো না কেন? আমি বুঝতে পারলাম, মেয়েটির নাম শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, মানে ওরা ব্রাহ্মণ, আর আমি হলাম দাস অর্থাৎ তপসিলি। তাই মনে মনে আমার ভীষণ অনুতাপ হলো, এই বলে যে এখানে আমার শিক্ষকতা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারিনি! শিক্ষক হিসাবে মেয়েটিকে অত্যন্ত কোমলতার সাথে, মনে প্রাণে ভালবেসে তাকে ব্যাপারটা বোঝানো প্রয়োজন মনে করলাম। তাই তাদেরই একটি মেয়েকে ডাক দিলাম, এই বর্ণালী, মানে বর্ণালী সেনগুপ্ত। শোন্, শর্মিষ্ঠাকে একটু ডেকে দে তো? শর্মিষ্ঠা আসলে আমি বর্ণালী সহ শর্মিষ্ঠাকে আমার রুমে নিয়ে গেলাম।

আমি শর্মিষ্ঠার মাথায় হাত রেখে, ওকে আদর করে সোহাগ ভরে বললাম, কি রে শর্মিষ্ঠা, সকলেই আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, আর তুই যে শুধু হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার জানালি? এতে আমি অবশ্য রাগও করিনি কষ্টও পাইনি। তবে মনে একটু দ্বিধার সঞ্চার হয়েছিল, তাই তোকে আবার ডাকালাম। আমার কথায় তুই কিছু মনে করিসনি তো? শর্মিষ্ঠা শুধু চুপ করে থেকে মাটির দিকে চেয়ে ওর গায়ের ওড়নার আস্তিনটা তার আঙ্গুলে একবার জড়াচ্ছে আবার খুলছে, কিন্তু কিছুই বলছে না। আমি তখন তাকে সস্নেহে বোঝালাম, দেখ্ শর্মিষ্ঠা, তোরা ব্রাহ্মণ আর আমি শূদ্র-তপসিলি জাতি, এটা আমার জন্ম সূত্র। কিন্তু আমি একজন শিক্ষক, কর্মসূত্রেই আমি শিক্ষক। বিবেকানন্দ বলেছেন, কর্মই পূজা। দেখ শর্মিষ্ঠা, শিক্ষকদের জাত নেই, কুল নেই, বর্ণ নেই, আছে শুধু শিক্ষা দেওয়ার কর্তব্য। শিক্ষা দেয়াই তাদের মূলমন্ত্র। আসল কাজ। কে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম

যদি ভাল হয় তবে তো সবই ভাল, সবই মঙ্গল হয়। বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, মুচি, মেথর, কামার, কুমার আমার রক্ত, আমার ভাই। গান্ধীজী বলেছেন, কামার, কুমার, মেথর, মুচি এদের ঘৃণা করো না। এদেরকে সঙ্গে নাও। এরা উপেক্ষার পাত্র নয়।

আমার কথা শুনে শর্মিষ্ঠার চোখ দু'টি জলে ভরে উঠেছে এবং টস্ টস্ করে দু'ফোটা জলও গড়িয়ে পড়ল। অমনি আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম এবং আদর করে বললাম, আমি জানি, তুই অমন কেন করেছিস! এটা একটা সংস্কার। তুই তো আমার সন্তানের মতই, বোনের মতই, তোরা তো ভুল করবিই। মা-বাবাই তো সন্তান ও বোনদের ভুল শুধরে দেবেন। শিক্ষকদেরও দায়িত্ব এবং কর্তব্য ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেয়া। আমি তোর বাবা বা বড় ভাই-এর মত হলেও আমি একজন শিক্ষক। শিক্ষা দেয়াই আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ।

এক দুধওয়ালা

মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর।
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদলে পরিষ্কার।

ছড়াটা পড়েছিলাম ছোট্টবেলা যখন ছোট্ট ক্লাশে পড়তাম। জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা বয়স কালে মনে পড়ে না। কিন্তু চোখটা বন্ধ করলেই পরিষ্কার মনে পড়ে যায় সে সব ঘটনা।

এমন একটা ঘটনা বলবো। যা সত্যিই আশ্চর্য মনে হয়।

আমরা দুই বন্ধু একটা মেসবাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমরা তখন একটা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। আমার এক আত্মীয়া—আমি যে স্কুলে শিক্ষকতা করতাম সেই স্কুলেই আমার পরিচয়ে External হিসাবে পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমার মেসবাড়িতে এসে ওঠে। আমার নিকট আত্মীয়া বলে, আমি আর না করতে পারলাম না। আমার বন্ধুও

রাজি হয়ে গেলো। ব্যস হয়ে গেলো। আমরা যখন স্কুলে যেতাম তখন সে মেসবাড়িতে একাই থাকতো। দুপুরে কিছু পড়াশোনা করার পর খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়তো। তবে আমি তাকে বলে যেতাম, দেখ্, দুপুরবেলা দুধওয়ালা দুধ দিয়ে যাবে, তুই কিন্তু গেট খুলে দিবি। নতুবা দুধওয়ালা দুধ না দিয়েই চলে যাবে। আমরা স্কুল থেকে এসে বৈকালিক টিফিন করতে পারবো না।

— ঠিক আছে। আমি গেট খুলে দেব এবং দুধ জ্বাল দিয়ে রাখবো যাতে দুধ নষ্ট না হয়, কেমন?

— বেশ, তবে তো তুই আসাতে আমাদের ভালই হয়েছে।

— আচ্ছা মামা, আমি আসার আগে কি করে দুধ রাখতে?

— পাশের বাড়ির বৌদি রাখতেন। আমরা স্কুল থেকে আসলে, আমাদের কাজের মাসি এসে ঐ দুধটা নিয়ে আসতো।

যেদিন মাসি আসতো না, সেদিন বৌদি নিজেই নিয়ে আসতেন এবং দুধ মুড়ি ও চা বানিয়ে আমাদের সামনে ধরতেন।

— বেশ ভাল তো, তোমাদের বৌদি।

— কিন্তু তখন আমাদের ভীষণ লজ্জা লাগতো। তুই এসে আমাদের লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিস।

— ঠিক আছে, আমি যতদিন থাকবো ততদিন আমিই তোমাদের টিফিন দেব।

— তোর কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

এভাবেই সময় কাটতে লাগলো। দিন কাটতে লাগলো। একদিন হলো কি? স্কুল ছুটি হওয়ার পর মেসবাড়িতে এসে ডাকতে লাগলাম, 'তিতলি -ই -ই, ও তিতলি? কিন্তু, কোন সাড়াশব্দ নেই! এবার আমার সহকর্মী ডাকতে লাগলেন, ও তিতলি? তিতলি, তুমি কি ঘুমিয়েছো? এবার আমাদের ডাকাডাকিতে পাশের বাড়ির বৌদিও এসে ডাকতে লাগলেন। তবুও কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই। এবার আমার আর সহ্য হলো না। তাই গেটের উপর দিয়ে মেসবাড়িতে ঢুকলাম। এবং গেট খোলার পর — আমার সাথে বৌদিসহ সহকর্মীও ঢুকলো। বাড়িতে ঢুকেই বৌদি আমার ভাগ্নি যে ঘরে ঘুমোয় সে ঘরে গিয়ে দেখেন, তিতলি ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। তিতলির ঘুম দেখে আমার ভীষণ রাগ হলো। তাই আমি গলা চড়িয়ে ডাকলাম, এই তিতলি-ই-ই-ই, কী ঘুম ঘুমিয়েছিস্? তোকে ডাকতে গিয়ে দেখি বৌদিও চলে এসেছেন। এবার তিতলি ঘুম থেকে উঠে লম্বা একটি হাই তুলে লজ্জাবশত চোখ মুছে বললো, মামা, গতকাল অধিকরাত পর্যন্ত পড়েছিলাম তো, তাই ঘুমটা ভীষণভাবে লেগে গেছে!

— দুধওয়ালা নিশ্চয়ই দুধ না দিয়েই চলে গেছে?

এবার তিতলি দাঁতে দাঁতে জিভ কেটে, বলল, মামা, আমি একটুও দুধওয়ালার ডাক শুনতে পাইনি!

— তাহলে আজকে দুইওয়ালা দুধ দেয় নি ?

— বোধ হয় না।

— বেশ ভালই হয়েছে, দুধ ছাড়াই টিফিন করবো।

তিতলি লজ্জায় দুঃখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বললে, মামা, আমাকে ক্ষমা করো! আমি ভাগ্নিকে অভয় দিয়ে বললাম, দূর বোকা, তোর পড়াশুনাটা বড়, না আমাদের টিফিন বড়।

এবার তিতলি কাঁদতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় কাজের মাসি এসে পড়েছে। এসেই যথারীতি কাজ করতে রান্নাঘরে গেছে। এবং গিয়ে দেখে হেঁসেলের চুলায় দুধের ডেকচিতে দুধ রয়েছে। দৌড়ে এসে বলল, বাবু গো, বাবু, দুধ তো দিয়া গেছে!

— তাই নাকি! সবাই এক সাথে বলে উঠলো।

পরদিন দুধওয়ালা যখন দুধ দিতে এসেছে, তখন দুধওয়ালা ছেলেটিকে তিতলি বললো, গেট না খুলে তুই দুধ কীভাবে দিয়ে গেলি? ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, দিদি, আফনেরে অনেক ডাকলাম। দেখি, আফনের কোন সাড়াশব্দ নাই। দেখলাম, দুধ না দিলে স্যারেরাও টিফিন করতে পারবেন না, আর আমার দুধও নষ্ট হইয়া যাইব!

— তখন কী করলি?

—দুধের টিনটা গেটের এপাশে রাইখ্যা গেইট বাইয়া ঐ পাশে গেলাম, গিয়া গেইট খুললাম। পরে গেইটের ভিতর ঢুইক্যা রান্না ঘরে গেলাম। দেখলাম, দুধের ভাণ্ডটা ধোয়া না, তাই দুধের ভাণ্ডটা ধুইলাম। আগুন জ্বালাইলাম, দুধ জ্বাল দিলাম।

— আমাকে ডাক দিলি না কেন?

—আফনের ঘরের কাছে আইয়া দেখি, আফনে বেঘুরে ঘুমাইতাছেন। আফনার মুখ দেইখ্যা আমার মায়া অইল। মনে করলাম, কাইল বোধহয় অনেক রাইত পর্যন্ত পড়ছেন। তাই আর ডাক দিলাম না।

— কিন্তু মামা ওরা এসে তো গেট বন্ধই দেখলো?

— গেইট তো বন্ধঅই দেখবো।

— কেন?

— আমি যেন গেইট বন্ধ কইরা আবার গেইট বাইয়াঅই গেইট পার অইয়া গেছি।

অকৃতজ্ঞ

রমেশবাবু আর বীরেনবাবু দুই বন্ধু। দু'জনেই সরকারি চাকুরি করেন। মনের দিক দিয়ে খুবই কাছাকাছি। একজনের সুখটা যেমন দু'জনেই ভাগাভাগি করে নেন, আবার দুঃখটাও তেমন ভাগাভাগি করেই নেন। কাজেই, একত্র হলেই একজনের দুঃখ দৈন্য, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথাবার্তা আলোচনা করে বুকটা ও মনাটা হাল্কা করেন এবং স্বস্তি বোধ করেন।

কর্মক্ষেত্রের তাগিদে দু'জনে অনেক বছর যাবতই দেখা-সাক্ষাত হয় না, পত্রালাপে পরস্পর পরস্পরের খোঁজখবর নেয়া হয়। এতে তো আর মনের সব কথা পরিষ্কার করে বলা যায় না! তাই নিজেদের দু'জনেই একা একা মনে করেন।

অনেকদিন পর দুই বন্ধু কোন এক ছুটিতে বীরেনবাবুর বাড়িতে মিলিত হলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দুই বন্ধুর মধ্যে বাক্যালাপ চলছে।

রমেশবাবু একসময় বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার যে একজন মেজদা ছিলেন, যাকে তুমি প্রায়ই কিছু আর্থিক সাহায্য করতে, তিনি এখন কেমন আছেন? তুমি তো অবার দাদাদের, ভাইদের খুবই শ্রদ্ধা কর ও ভালবাস। আর নানা ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যও কর।

—এইটুকু সাহায্য করি কেন জান ভাই। ভাইরাও দাদারা যে রোজগার করেন, তাতে তাদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই তাদের একটু আধুট সাহায্য করতে আমার ভাল লাগে।

— মেজদারা যেন কোথায় থাকেন?

— ঐ তো কাশিপুর। তাও নিজের বাড়ি নয়। মেজদা যে মালিকের ওখানে কাজ করেন, ঐ মালিকের কাশিপুর একটি জায়গা আছে। সেই জায়গায়। মালিক ভবিষ্যতে কিসের কারখানা খুলবেন যেন ঐখানে।

— এখন মালিকের কিসের কারখানা?

— অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র তৈরির কারখানা। মেজদা সেখানে নিত্য শ্রমিকের কাজ করেন।

— মেজদা নিত্যশ্রমিকের কাজ করেন, আর তুমি মোটামুটি ভাল সরকারি চাকুরি কর। এতে তুমি তোমার মেজদার সাথে সম্পর্ক রাখতে লজ্জাবোধ কর না?

— কেন লজ্জা বোধ করবো? যে যেরকম উপযুক্ত সে সেরকম কাজই তো করবেন, এতে আবার লজ্জা কিসের? চুরিদারি করেন না তো।

— তোমার মনটা ভাই সত্যিই অন্যবকম।

— অন্যরকম কী আবার, দাদা বলে তো আর অস্বীকার করতে পারবো না। তাই তো তার ছেলেমেয়েদের একটু আধটু সাহায্য করি।

— মেজদার বড় ছেলেটি এখন কী করে?

— ওর কথা আর বলো না ভাই। সে যা কোন দিনও করে নাই, হঠাৎ একদিন তাই করে বসল আর কি!

—কী রকম?

— তবে শোন একটু গুছিয়েই বলি।

—বল।

— তোমার ধৈর্য আছে তো? ধৈর্য থাকবে তো?

— হ্যাঁ, তা থাকবে, তুমি বলে যাও। আমার শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।

বীরেনবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন।

শোন ভাই, আমি তখন জিরানীয়ায় চাকুরি করি। থাকি আগরতলা কলেজটিলায়। চাকুরিস্থলে যাওয়ার পথে কাশিপুর তো পথেই পড়ে, তাই চাকুরিস্থল থেকে আশা-যাওয়ার পথে তাদের খোঁজখবর প্রায়ই নেই।

একদিন চাকুরিস্থল থেকে বাড়িতে এসে দেখি, বড় ভাইপোটা আমাব ঘরের বারান্দায় পায়চারি করছে। আমাকে দেখেই হুট করে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসলো! যা সে কোনদিনও করেনি। অথচ যে ভাইপো বি কম পাশ করার পর প্রণাম তো দুরের কথা পাশ করার খবরটি পর্যন্ত দেয়নি! টাকার দরকার হলে বা কোনকিছুর দরকার হলেই একমাত্র চট করে আমার কাছে চলে আসে। যাই হোক, ঘরে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার। হঠাৎ তুই এই সময়? বড় ভাইপো বললে, আমি চাকুরির অফার পেয়েছি—দেখি কোথায় দিয়েছে? ওর হাত থেকে অফারের কাগজটা নিলাম। অফার লেটারটা পড়েই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর চাকুরির স্থল পড়েছে ধর্মনগর ইনস্পেক্টরেটের অধীনে পেঁচারথল। যেখানে উগ্রপন্থীদের সগৌরবে চলাফেরা করার জায়গা।

—কাকু, তোমার মনটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে?

— খারাপ তো হবেই। জায়গায়টা তো ভাল নয়।

— মাও সেই একই কথা বলেন। মা-ই তো তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, ওখানে আমি যাবো কিনা তা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে।

— এই কথা বলেই তো তুই আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছিস। আমি তাকে আবার বললাম, দেখ, কাতর কণ্ঠে ডাকলে ভগবানকেও পাওয়া যায়। কিন্তু চাকুরির বাজার এখন ভীষণ দুষ্প্রাপ্য। চাকুরিস্থলে যাবি কি যাবি না, আমি কিছুই বলবো না।

—কেন কাকু?

— কারণ, হ্যাঁ বললেও আমার ঠেকা, আবার না বললেও আমার ঠেকা। ঠাকুর না করুন কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তোর মা আমাকে ছাড়বেন না। আর না বললেও তোর মা বলবেন, আমার জন্যই তোর চাকুরিটা হলো না। এবং চাকুরিতে যোগদান করলি না।

— তবে আমি কী করবো?

— তোর মা কী বলেছেন?

— মা তো যেতেই বলেছেন।

— তবে আর দেরি কেন? অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার দিয়ে ডিরেক্টরেটে তোর চাকুরিতে যোগ দেয়ার ইচ্ছেটা জানিয়ে দে। আর তাছাড়া মা-এর আশীর্বাদই ত সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

— যাবো কী করে? আমার তো কিছুই নেই?

— কিছুই নেই মানে?

— এক সেট ভাল জামা-কাপড় নেই, যা পড়ে চাকুরিস্থলে যাবো। এক প্রস্থ বিছানাপত্র নেই, যা নিয়ে থাকবো।

— আরে তোর কাকু আছে তো? আগামীকাল বিকালে আসিস। দেখি, কী করতে পারি।

পরের দিন ভাইপো আমার বাড়িতে আসার পর নতুন প্যান্টশার্ট, বিছানাপত্র ও যাবতীয় সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে দিলাম।

বীরেনবাবু রমেশবাবুকে আবার বললেন, সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কী জান ভাই?

— কী সেটা?

— শোওয়ারটা চাকুরি করছে আজ প্রায় আট নয় বছর হয়ে গেল। এরমধ্যে একদিনও সে আমার বাড়িতে এসে তার কুশলমঙ্গল জানিয়ে গেল না। এমন কি, আমি যখন রোগশয্যায়, তখন খবর দেয়া সত্ত্বেও আমার ভাল-মন্দের খোঁজখবর নিলো না।

রমেশবাবুর মুখটা একটু পাংশুটে হয়ে গেল। অজান্তেই তিনি বলে ফেললেন, অকৃতজ্ঞ কোথাকার।

— কী বললে ভাই রমেশ?

— না কিছু না, ভাবছি মানুষ এমন কী করে হয়।

গোপাল বিশ্বাস

ক্ষত

গোবর্ধনের মা এখন মানিকভাণ্ডারের মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখানে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ও স্নায়ু দুর্বলতার চিকিৎসার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবু হাসপাতালের খাবার খেয়ে তো বেঁচে আছে ! এটাই বা কম কিসের। ক'দিন এভাবে তাকে রাখা যাবে, দুই বছরের গোবর্ধন অন্য একটি পরিবারে স্থান পেয়েছে। গোবর্ধনের পিতা কে? কেউ বলতে পারে না। পাগলী মাও কি বলতে পারে? হয়তো ভদ্র সমাজের কেউ। গোবর্ধন তার মাকে ভুলে যাবে একদিন। হয়তো তার সাধ্যও নেই, কিন্তু এই মা-ই একদিন পঁয়ত্রিশ কিমি পথ পায়ে হেঁটে কুলাই থেকে নিয়ে এসেছিল তার সন্তানকে। অনাহারী-অর্ধাহারী রোগশোকে জরাগ্রস্ত পাগলীতেও মাতৃত্বের অপূর্ব নিদর্শন। মানুষকে চমকিয়ে দিয়েছে এই উজ্জ্বল সন্তান বাৎসল্য। নোংরা-পচা আবর্জনাতে সুগন্ধি ফুল ফোটে। ডাঃ কর্মকার জানিয়েছিলেন, যদি কোন আত্মীয়-স্বজন আপনজন বা কোন সমাজসেবী সংগঠন এগিয়ে আসে খুবই ভাল হয়। হাসপাতালে তাকে বেশিদিন রাখাও যাবে না। তারপরই দুই বছরের গোবর্ধন একটি পরিবারে স্থান পায়।

গোবর্ধনের মা-র মূল কাহিনি জানতে হলে দীর্ঘ কুড়ি বছর পিছিয়ে যেতে হবে। তখন গোবর্ধনের মা-র বয়সই কত আর ছিল। বাইশ কি তেইশ। অপূর্ব সুন্দরী। সুঠাম দেহ। নবীনা যুবতী। সদ্য ফোটা গোলাপ। চারদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন। গা যেন কাঁচা হলুদ বাটার মতো। বুকগুলো যেন খাঁড়া পর্বতমালা। ডাগর হরিণ চোখ— আকর্ষণীয়। রাস্তায় হাঁটলে মানুষ ঘাড় ফিরিয়ে না চেয়ে পারে না। যুবকদের দেহে হিল্লোল তোলে। ঝড় বহে রক্তে। কেউ কেউ ভালবাসার প্রস্তাব দেয়। কু-প্রস্তাব দেয়। ইন্দ্রাণী এসবকে পাত্তা দেয় না। গরিব ঘরের মেয়ে তো! ভেবেচিন্তেই চলা উচিত। লেখাপড়াও বেশি দূর এগোয়নি। মা-বাবা নেই। শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে বাবা মাটি চাপা পড়ে মারা যায়। মা অসুখে ভুগে মারা যায়। ইন্দ্রাণী তখনো খুবই ছোট। বাবাকে হারানোর ফলে তাকে দেখাশুনার আর কেউ রইল না। বাধ্য হয়ে মামারবাড়ি চলে আসে। মামাই নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মামির অত্যাচার ছিল তীব্র থেকে তীব্রতর। প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণা। বাড়িঘরের সমস্ত কাজকর্মই করতো। ঝি-এর মতন খেটে যেতো দিনরাত। উচ্ছিষ্ট খেয়ে—অনাদরে—একদিন বড় হলো। যুবতী হলো। চারদিকে লোভী চোখ। ইন্দ্রানী এড়িয়ে যেতো। তবে ভাল মেয়ে বলে এলাকায় পরিচিতা। খাওয়া না খাওয়া দেহে সৌন্দর্যের ঢেউ খেলানো সমুদ্র গড়ে ওঠে। বৃষ্টির জলের মতো যেন গড়িয়ে পড়ছে

সোনালি রোদ রূপ। উপত্যকার ঢালে নেমে আসে ঝরনা। নদী নেচে নেচে বাঁক নেয় নর্তকীর ছন্দে। ইন্দ্রাণী মামার বাড়িতে সবকিছু মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কখনো পারে, কখনো পারে না। মামা সব বুঝেও কিছুই করতে পারে না। কিছু বললেই মামি মামাকে রাগে গজগজ করতে করতে ঝংকারে বলে ওঠে, আদুরে ভাগ্নিকে লয়ে মাথায় তুলে নাচ না! দু'দিন পরেই তো পরের ঘরে যাইব। তখন কামকাইজ করতে হইবো না? তুমি একটা বলদ। চাল কুমড়া কোথাকার! কিছু বোঝ না। মেয়ে গায়ে গতরে যত খাটবে ততই ভালো। মামির ঘাড় দুলে ওঠে।

—কিন্তু আমাদের ঝুমা তো এত কাজ করে না। গরম ভাত খায়। স্কুলে যায়। তার বেলা কী হবে? ইন্দ্রাণী তো ওর বয়সীই।

আমার মেয়ে ও তোমার ভাগ্নিরে নিয়া সমান করলা? একপাতে বসালা? হায়-রে আমার মিনসে! অক্ষামার অঙ্গল দিকেই পোড়াকপাল। কোনটা আপনা— কোনটা পর এখনো চিনলে না। এরপর আর সতীশের কথা বলতে ইচ্ছে হয়নি। দুনিয়ার সব মামিরা কি একই রকম? পেত্নী ধাঁচের? কেন? মা-বাপ নাই বলে? অনাথ মেয়ের কী হবে কে জানে। মনে বড়ো দুঃখ পায় সতীশ। দুঃখগুলো আবার প্রকাশ করতে পারে না। দজ্জাল মামি হয়তো ইন্দ্রাণীকে পেটানি আরম্ভ করে দেবে। মাত্র তিনদিন হলো মেয়েটার জ্বর ছাড়ল। জ্বর নিয়েই কাজ করে। এত ধকল সইবে কেন? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বটতলার চৌমুহনীতে চলে আসে। ননীর দোকানে চা খায়। এমন সময় অবনী দাস সতীশকে ডাক দেয়, এদিকে একটু আসুন। আপনার লগে দুইটা কথা কই! সতীশ দোকান থেকে বেরিয়ে একটু নিরিবিলিতে যায়। দু'জনে কথা হয়।

— আপনার ভাগ্নিকে আমাদের ভীষণ পছন্দ। আমার ছোট ভাই দিবাকরের জন্য চাই। দিবাকরকে তো আপনি চিনেনেই। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে গাড়ি চালায়। সরকারি ড্রাইভার। বেতনও ভালই পায়। বিয়ে দিয়েই ওকে আলাদা করে দেবো। ওরা নিজেদের সংসার নিজেরাই গড়বে। উন্নতি করবে। বাবা বেঁচে থাকলে উনিই হয়তো আপনার সঙ্গে আলাপ করতেন। বড়ভাই হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে চাই। অবশ্য আপনারা রাজি থাকলে। আপত্তি না থাকলে কয়েন। দিবাকরও ইন্দ্রাণীকে দেখেছে। এখনই কথা দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। কয়েকদিন পরে জানালেই হবে। এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবো। সতীশের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা-বাপ মরা মেয়েটাকে পাত্রস্থ করতে পারবে। তাছাড়া দিবাকরকে সতীশ ভাল করেই চেনে— জানে। মদ গাঁজা কিছুই খায় না। আচার ব্যবহার চরিত্র ভাল। সকলের প্রিয় দিবাকর। দ্বিমত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সতীশ আমতা আমতা করে বলে, অবনী, একটা কথা না বলে পারছি না। এই ব্যাপারটা একটু ফয়সালা হলেই এগিয়ে যেতে পারবো। মনে শান্তি পাবো।

— বলুন, কী ব্যাপার?

— দাবি-দাওয়ার ব্যাপার। আমরা তো বাবা গরিব মানুষ। ওর বাপ মারা যাওয়ার সময় কিছুই রেখে যেতে পারেনি। জিনিসপত্র, ক্যাশ এসব দাবি করলে তো দিতে পারবো না। তাই এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিলে ভাল হয়।

—এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা কোন যৌতুক নেব না। বিয়েতে জিনিসপত্র খুশি মতো দেবেন। ক্যাশ চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাবা তো আমাদের জন্য কম রেখে যাননি। অন্য কোন কথা থাকলে বলতে পারেন।

— না, বাবা, আর কোন কথা নাই। আমি একটু বুঝেসুজে দু-একদিন পরেই তোমাকে জানাবো। তারিখ- টারিখ ঠিক করবো।

— ঠিক আছে, জানাইয়েন। আসি।

একুশে ফাল্গুন বুধবার ইন্দ্রাণী ও দিবাকরের বিয়ে ঠিক হয়। সতীশ ভাগ্নির বিয়ে ঠিক করে আনন্দে হাবুডাবু খাচ্ছে। এতদিনে ঠাকুর মুখ তুলে তাকিয়েছেন। মেয়েটার গতি হলো। কষ্ট আর সহ্য হয় না। ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা ইন্দ্রাণী যেন সুখী হয়। পাড়া-প্রতিবেশিদের নিয়ে ধুমধামে ইন্দ্রাণীর বিয়ে দেয়। দিবাকর পরমাসুন্দরী বউ পেয়ে খুবই আনন্দিত। সন্ধ্যের পর হাট-বাজারে দেরি করে না। আড্ডা দেয় না। বন্ধু-বান্ধব টিটকারি দেয়। ওসব গায়ে মাখে না। সোজা চলে আসে বাড়ি। নব প্রণয়িণী স্ত্রী ইন্দ্রাণীর বাহু বন্ধনে। কত কি যে লজ্জার কাম করে। হেসে ওঠে। অকারণে। আগুন জ্বালে। আগুন নিভায়। নিমিষে রাত কাবার। ঘুমোতে ভুলে যায় কখনো। ইন্দ্রাণী দিবাকরের মতো স্বামী পেয়ে সব উজাড় করে দেয়। ইন্দ্রাণীর শরীরে সৌন্দর্যের ঢেউ আগের চেয়ে শতগুণ বেড়ে যায়। যৌবনের তরঙ্গে মাতাল সমুদ্র। স্বর্গের অপ্সরার দেহ গঠন। দিবাকর ভাবে নাকি স্বর্গের অপ্সরাই। এ কি স্বপ্ন! স্পর্শ করে — পরখ করে দেখে। দুটো প্রাণী প্রেমজালে আবদ্ধ। এমনি করে কেটে যায় দুটো বছর। মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী তন্ময় হয়ে ভাবে, আমার এত সুখ! দিবাকরকে দেবতার মতো মনে হয়। তাকে দিবাকর এত ভালবাসে! স্বামী তো দেবতাই। ইন্দ্রাণী ভারতীয় নারীর আদর্শ। কিন্তু স্বামীর বড়ভাই অবনীকে কেমন যেন রহস্যময় লাগে। উনি যে কী, ঠিক বোঝা যায় না। কেমন কামুক কামুক— চোর চোর লাগে। পাড়ার কয়েকজন যুবক একবার অবনীকে শেষরাতে এক বিধবা যুবতীর ঘরে পেয়ে উত্তম- মধ্যম দিয়ে ছিল। অবনী তখন হাত-পা ধরে মাপ চেয়েছিল। নাকে খত দিয়েছিল। মোটা টাকার বিনিময়ে সেদিন রেহাই পেয়েছে। এ খবরটা চাপা থাকেনি। কি করে সে খবর গোপনে কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইন্দ্রানী শুনেছিল বড়দের মুখে। সে এসব খবরকে গুরুত্ব দেয়নি। গুজব। বিশ্বাসও করেনি। এই অবনী দাস এখন ইন্দ্রাণীর ভাসুর। স্বামীর বড় ভাই...।

ইন্দ্রাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাক খুঁজি করে বড়দা বলে। বাড়ির গুরুজন সম্মানীয় ব্যক্তি।

ভাসুরের সামনে যেতে ইন্দ্রাণী লজ্জা পায়। শরীর ঢেকেঢুকে যায়। অবনী ডেহ্যার মতো চেয়ে থাকে। শরীর দেখে। ইন্দ্রাণী এসব বুঝতে পারে। বড়ো অসহ্য লাগে। দিবাকরকে এসব বললে কি বিশ্বাস করবে? ইন্দ্রাণী এসব ভেবে মন খারাপ করে না। হয়তো মনের ভুল। ভ্রান্ত ধারণা।

ইন্দ্রাণী একসময় পিরিয়ড মিস করতে থাকে। তিন মাস পর ইন্দ্রাণী স্বামীকে জানায়, আমার ম্যানস স্টপ হয়ে গেছে। আমি মা হতে চলেছি। তুমি বাবা হবে। এই বয়সে বাবা হলে কেমন হবে গো? বলেই হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে চেয়ে থাকে দিবাকরের দিকে। দিবাকর আনন্দে ও খুশিতে ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে থাকে। আমার তো চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, আমি বাবা হতে চলেছি! হাম্ পিতাজী বন জায়গা! আমাদের সন্তান তোমার পেটে। কই দেখি বাছার লগে দু-একটা কথা কই। দিবাকর বাঁ কান ইন্দ্রাণীর তলপেটে চেপে ধরে। শুনছনি, ছোট্ট সোনা—আমার কথা? এখন এসব ঢঙ না করলেও হবে। কাটরাগ দেখিয়ে বলে, এখন যাও। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। টিকা নিতে হবে। মায়েদের আরও কত দায়িত্ব পালন করতে হয়। তুমি এসব বুঝবে না। ইন্দ্রাণীর শরীরে মাতৃত্বের গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে।

সেদিন সোমবার। হাটবার ছিল। কলাছড়ি বাজার থেকে দিবাকর পাঁঠার মাংস, রুইমাছ, তরিতরকারি কিনে আনে। দিবাকর পাঁঠার মাংস ভালবাসে। সঙ্গে সিঁদল চাটনি! কলার মোচা বা লতছই দিয়ে গুদক হলে তো কথাই নেই। অপূর্ব টেস্ট হয়। ইন্দ্রাণীর রান্না খেয়ে হাত চাটে। বাজার থেকে আসার পথেই মোবাইল রিং হয়। ফরেস্ট রেঞ্জার মনোজবাবুর ফোন— দিবাকর তুমি কোথায় আছো? তাড়াতাড়ি অফিসের সামনে চলে এসো। উত্তরমহারাণীপুরে যেতে হবে। কারা যেন সেগুন বাগানের গাছ চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে ফরেস্টার ও গার্ড মিলে বার জন থাকবে। থানা থেকে হাফ ডজন পুলিশ যাবে। বাগানটা পরিদর্শন করেই চলে আসবো। আমরা যদি ঘন ঘন পেট্রোলিং করি—তাহলে চোরাকারবারীরা এতটা ক্ষতি করতে পারবে না। ভয় পাবে না, আমরা ডি এফ ও এর নির্দেশেই সেখানে যাচ্ছি। ধরা পড়লে লকআপে লটকে দেবো শালা গো। ঝুলবে সারাজীবন। হারামজাদাদের বিচার হওয়া উচিত।

— ঠিক আছে স্যার! আমি দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবো। বাড়িতে বাজারের ব্যাগটা দিয়ে আসি। বাড়িতে এসেই বাজারের ব্যাগটা ইন্দ্রাণীর হাতে দিয়ে বলে, মাংসটা একটু কষা করে রাঁধবে। কাঁচামরিচ দিয়ে একটু ঝাল ঝাল করবে। সিঁদল চাটনিও করবে। কিছু ফলমূল এনেছি। রান্না করতে করতে খেও। এখন ফল খাওয়া খুব দরকার। আমি ডিউটিতে যাবো। রেঞ্জার স্যারকে নিয়ে যেতে হবে। উত্তর মহারাণীপুর বাগান দেখতে যাবে। গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। রান্না শেষ হওয়ার আগেই চলে আসবো। বেশি দেরি করবো না। ফিরে এসে স্নান করে ভাত খাবো।

— কখন ফিরবে? আমার কেমন ডর ডর লাগে। কতদূরে যাবে গো?

— আরে জুলি, বেশি দূরে নয়! পনের বিশ কিমি হবে। গাড়ি স্পিড দিলে দশ মিনিটও লাগে না। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবো। তুমি কোন চিন্তা করো না।

— ঠিক আছে, চিন্তা করুম না। ডিউটি কর গিয়ে। সরকারি চাকুরি— কাজ তো করতেই হবে। উপরওয়ালার আদেশ মানতেই হবে। তবে তাড়াতাড়ি এসো। তুমি এলেই দু'জনে বসে ভাত খাবো।

মানিকভান্ডার নগর পঞ্চায়েতের উত্তর দিকে সোজা পিচ রাস্তা চলে গেছে উত্তর মহারাণীপুর। তারপর আঁকাবাঁকা পথ গাঁয়ের ভেতর চলে গেছে। উপজাতি গ্রাম। এক সময় জাতি-উপজাতির মিশ্র বসতি ছিল। উগ্রবাদীর কারণে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে— বাঙালিরা অনত্র চলে গেছে। গ্রামের রাস্তার পাশে এখানে সেখানে পরিত্যক্ত বাড়িঘর, ভাঙা মাডওয়াল চোখে পড়ে। এই ধ্বংসাত্মক দৃশ্য দেখলে মনের ভেতর কোথায় যেন ব্যথা লাগে। বাতাসে কি যেন গুমরে গুমরে কাঁদে। এইরকম দাঙ্গায় ধ্বংসাস্তূপে পরিণত একটি গ্রাম পেরিয়ে সরকারি সেগুন বাগানে যেতে হয়। এলাকাটি কিরণ মালাকার পাড়া নামে পরিচিত। এক সময় জাতি-উপজাতিতে ঘন বসতি ছিল। আজ শ্মশান। ভয়ার্ত পরিবেশ। মাঝে মাঝে পুলিশের জীপ দেখা যায়। এখানে বিপর্যস্ত উন্নয়নের সিঁড়ি।

মালাকার পাড়া এখন জঙ্গলমহল। ঘন ঝোপঝাড় । দুই-আড়াই কিমি জনবসতি নেই। এদিকে টেরোরিস্টরা মোভ করে। একটা বাঁকা রাস্তার মোড় দিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়িটা আপ উঠছিল। স্পিড কম। দিবাকর সতর্কতার সঙ্গেই গাড়ি চালায়। হঠাৎ রাস্তার দু পাশ থেকে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষিত হতে লাগল। থ্রি-নট থ্রি রাইফেল এবং মেশিন গান থেকে গুলি ছুঁড়ছে। গাড়ির সামনে ব্লাস্টফায়ার হলো। দিবাকর হত বুদ্ধি হয়ে যায়। দ্রুত বাঁক নিতে গিয়ে সামনের দিকের চাকা বাঁ দিকের ড্রেইনে আটকে যায়। ব্রেকগিয়ার দিয়ে গাড়ি আবার তুলে আনে রাস্তায়। ততক্ষণে একটা বুলেট মাথায় আঘাত করে। কান বরাবর বিদ্ধ করে ওপাশ চলে যায়। ড্রাইভারের মাথা স্টেয়ারিং-এ হেলে পড়ে। রেঞ্জার মনোজবাবুর বুকে দুটো গুলি লাগে—স্পট ডেড। মাত্র ছয় মিনিট অপারেশন করে উগ্রবাদীরা জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। অস্ত্র লুঠ করাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। একজন ফরেস্ট গার্ড দু'জন পুলিশ কনস্টেবল সেদিন প্রাণ হারায়। ওয়ারলেসে খবর যায় মানিকভাণ্ডার পুলিশ স্টেশনে। দ্রুত বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ও সি সাহেব এবং এস ডি পি ও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ততক্ষণে উগ্রপন্থীদের চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। শুধু মাত্র লাশগুলি গাড়িতে এবং রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। রক্তে লাল। যেন লাল নদীর ঢেউ! ভয়ানক দৃশ্য। লাশগুলি গাড়িতে তুলে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আহতদের দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়।

ইন্দ্রাণী যখন শুনল যে তার স্বামী নেই। ইতিহাস হয়ে গেছে—উগ্রপন্থীরা খুন করেছে—

তখন সে পাথর হয়ে গেল! সুনামির মতো—সাত সমুদ্রের মতো আঘাতে ইন্দ্রাণী স্তব্ধ। এত দুঃখ সহ্যের ক্ষমতা কি আছে ওর? কাঁদতেও ও ভুলে গেছে! কী করবে? কী বলবে? কাঁদবে না হাসবে? পার্থিব সমস্ত বোধ শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে। ইন্দ্রাণী জীবিত না মৃত। সেটা বোঝার ক্ষমতার সাধ্যাতীত। অবনীই প্রথম দিবাকরের মৃত্যুর খবরটা ইন্দ্রাণীকে দিয়েছিল। ইন্দ্রাণী পাগলের মতো ব্যবহার করতে লাগলো। চিৎকার করে বলতে লাগল, না, আমার স্বামী মরেনি। দিবাকর মরতে পারে না। তার সন্তানের সংগে কথা না বলে, যেতে পারে না। তোমরা মিথ্যা বলছ! ওর জন্যে মাংস রান্না করেছি। চাটনি বানিয়েছি। এসে ভাত খাবে। ওই তো আমার স্বামী আসছে। আসছে...। তোরা মিথ্যা বলছিস। আসছে — ও বেঁচে আছে। ইন্দ্রাণী দৌড় দিতেই উঠোনের কোণাতে রাখা একটা গাছের খণ্ডের সঙ্গে হোঁচট খায়। পরে যায়। বাড়ির অন্যরা ধরে তুলে বসায়। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদে। কপাল ভেঙে গেল। পৃথিবী চোখের সামনে থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। চারদিকে কেমন ধোঁয়া। ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আগুন। সাপের মুখ। অবনী তার স্ত্রীকে ইঙ্গিতে বলে, তোমরা সবাই ইন্দ্রাণীকে ঘরে নিয়ে যাও আমি আর এই শোক দেখতে পারছি না। দিবাকরের বিয়োগ ব্যথা আমারও কম নয়। আমি হাসপাতালে যাই, ডেডবডি এনে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচদিন হলো— দিবাকরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকর্ম শেষ হলো। ইন্দ্রাণী যেন পাথর হয়ে গেছে। ডাকলে সাড়া দিতে চায় না। মুখ তুলে ঘোলাটে চোখে চায়। দিবাকরের ছবির সামনে কাঁদে, শুধু কাঁদে। নাকি আত্মহত্যার কথা ভাবে? অবনী আজ সকালে ইন্দ্রাণীকে মধুর ভাষায় বুঝিয়েছে। দেখ ইন্দ্রাণী, তোমাকে শক্ত হতে হবে। তুমি আমাদের বাড়ির গৃহবধূ। তোমাকে তো আমরা ফেলে দিতে পারি না। এ বাড়িতে তুমি আদরও সম্মানের সঙ্গেই থাকবে। পরিবারে 'ডাই ইন হারনেসে' একজনকে চাকুরি দেবে। তুমি জহরের নাম বলে দিও। ও-ই চাকুরি করুক। তোমার চাকুরির দরকার নেই। আমরাই তোমার সমস্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলাম। আজ থেকে মনে করবে জহর শুধু ভাসুর পো-ই নয়। ও তোমারও ছেলে। তাছাড়া তোমার পেটে এ বাড়ির নতুন অতিথি। তাকে সাদরে পৃথিবীতে আসতে দাও। ওর মাঝেই দিবাকরের অস্তিত্ব খোঁজে পাবে। এই চেকটাতে দু'টো সই করে দাও। জি পি এফর টাকা তুলতে হবে। এ টাকা তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানের জীবনে কাজে লাগবে। ওকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবো। এবার চোখ মোছ। আর কেঁদো না। ওঠো। তোমার ভাসুর— বড়দা তো মরে যায়নি! নিজেকে শক্ত করো।

ইদানিং অবনী দিবাকরের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললে, কেমন আদেশের মতো শোনায়। রুক্ষ মেজাজ। ডাই-ইন -হারনেসের চাকুরিটাও ভাসুরের ছেলেকে দিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেটা কাকিমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। কথাও বলে না। এড়িয়ে চলে। প্রথমে অফিস মানতে

চায়নি। ইন্দ্রাণীকে লিখিত দিতে হয়েছে, জহরই চাকুরি করবে। ওকেই দেওয়া হোক। আমার কোন আপত্তি নেই। ভবিষ্যতেও আমি কোনরকম দাবিদার থাকবো না। অফিস থেকে কত টাকা পেয়েছে— তারও হিসাব ইন্দ্রাণী জানে না। শুধু সই দিয়েছে। ভাসুর টাকা তুলেছে। দিবাকরের প্রাপ্য টাকা ইন্দ্রাণীর হাত ছোঁয়নি। ইন্দ্রাণী ভাবে, আমার হাতে টাকা না দিলেও, পরিবার তো পেয়েছে। পরিবারে পেলেই তো আমার পাওয়া। তাছাড়া আমার তিনকূলে কেউ নেই। আমি অবুঝ থাকতেই মারা গেছেন তারা। মামা তো আমাকে খুবই আদর করতেন। চোখে জল এসে যায়। ঝাপসা দেখে। আমার সন্তানের জন্যই আমাকে বাঁচতে হবে। আমার নাড়ির ধন তো এ বাড়িতেই বেড়ে উঠবে। সন্তানের কথা ভাবলেই ইন্দ্রাণীর মুখমণ্ডল কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইভাবে ছয়-সাত মাস অতিক্রান্ত হলো। দিবাকরের কথা পরিবারের সদস্যরা প্রায় ভুলেই গেল। ইন্দ্রাণী কি ভুলতে পারবে তার স্বামীর স্মৃতি। এক একটা মধুর রাত দিবাকরের শেষ কথাবার্তা, ভালবাসার কথা এখনো হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বিয়ের প্রথম রাতের স্মৃতিকথা উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে আছে। বাঙালি মেয়েরা কোনদিনই এসব ভুলতে পারে না।

রাত দেড়টা কি দুটো। ইন্দ্রাণী তার নিজের ঘরেই ঘুমিয়ে ছিল। আজ শাশুড়ি এ ঘরে শোয়নি। হরিসেবায় অন্যের বাড়িতে গেছে। হঠাৎ দরজায়— ঠক্ ঠক্, ঠক্ ঠক্— শব্দ। ইন্দ্রাণী শুয়েই বলে— কে?

— আরে— আমি অবনী, তোমার ভাসুর।

— কেন? কী হয়েছে বড়দা?

— দরজাটা খোলই না! সব বলছি।

— কোনো প্রয়োজন আছে?

— আরে— আছে ভীষণ প্রয়োজন।

ইন্দ্রাণী ভাবছে— এত রাতে বড়দার কী প্রয়োজন থকতে পারে? ভেবে পায় না। বড়দা যখন ... তখন কোন ভয় নেই। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে অবনী ঘরে প্রবেশ করে। মুখ থেকে দেশিমালের গন্ধ ভোঁভোঁ করে বেরুচ্ছে।

— একি বড়দা! আপনি মদ খেয়েছেন! ছিঁ-ছিঁ, কি বিশ্রী গন্ধ! মা ঘরে নেই। আপনি এখন যান।

— যাব বলে তো আসিনি রসের কামিনী! আজ বাঙলা খেয়েছি তোমারি জন্যে।

— কী আবোল-তাবোল বকছেন। দিদিকে ডাকি?

— ডাকতে হবে না। বাড়ি নেই। আস্তে কথা বল। আজ রাতটা আমি তোমার সঙ্গে কাটাবো। ফুর্তি করবো। কেউ জানবে না। তুমি আমি মিল থাকলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। দিবাকরের মৃত্যুর পর তুমি তো ওসব কিছুই করোনি। আজ আমি তোমাকে...। আস্তে আস্তে

সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে ফেল। বস্ত্রহীন হয়ে আমাকে ধরা দাও। আমি আর পারছি না। আমার অনেকদিনের সাধ। দিবাকর মরে ভালই করল। আমার সারা শরীরে গরম রক্তের স্রোত বইছে। এসো সুন্দরী — ধরা দাও। কাম দাও। আমার কথা শুনলে সারা জীবন আদরে রাখবো। গোপনে রানি করে সাজাবো। আদরিণী আমার পরাণের পক্ষী। — না, না, কাছে আসবেন না। আমি না আপনার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী! বড় ভাই তো পিতামাতা । আপনি এ কী করছেন! বেরিয়ে যান শিগগির। আমাকে নষ্ট করবেন না। আপনার পায়ে পড়ছি। ইন্দ্রাণী অবনীর পায়ে ধরতেই— অবনী ইন্দ্রাণীকে হাত দিয়ে ধরে ওপরে তোলে। খাড়া করে। এতে অবনী আরও বেশি পাগল হয়ে যায়। ইন্দ্রাণী জোরে চিৎকার করতে চেয়েছিল। পারেনি। অবনী বাম হাত দিয়ে শক্ত করে মুখ চাপা দিয়ে ধরেছে। মুখটা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে। একটা শক্তিশালী অসুরের বিরুদ্ধে অসহায় ইন্দ্রাণী কি করতে পারে? গায়ের জোরে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। অজ্ঞান হয়ে যায়। লালসা মিটিয়ে ইন্দ্রাণীর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অবনী। তখন প্রায় ভোর। অবনীর স্ত্রী গোবর ছিটা দিতে গিয়েই আঁতকে ওঠে। এ কি! ইন্দ্রাণীর ঘরে গোঙানীর শব্দ! দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়। সতীকা ঘরে ঢোকে।

— এ কি! তোর এমন অবস্থা কেন? কে তোকে অত্যাচার করল? ধর্ষকের মাথাটা ভাইঙা খাইয়ালামু। বল —ইন্দ্রাণী, তোর এমন সর্বনাশ কে করলো?

— বড়দা! বলেই ইন্দ্রাণী আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। পাঁচ মাসের পোয়াতি। হায়-হায়— কি হলো রে— ছোট ?

বড়দা? মানে জহরের বাঁপ? সতীকা অবাক ও হতবাক হয়। তার স্বামী এত খারাপ! এত নিচে নামতে পারল! কি করে পুরুষেরা এমন জঘন্য কাজ করতে পারে! বান্দর বুড়া হলেও গাছ বাওন ছাড়ে না! স্বামীর প্রতি ঘৃণায় গা রি-রি করে ওঠে সতীকার! সে তাড়াতড়ি ইন্দ্রাণীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ইমারজেন্সিতে ভর্তি হলো। ডাক্তারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ইন্দ্রাণী রক্ষা পায়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাত হওয়ায় তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভপাত। ফলে ইন্দ্রাণী নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি। মানসিক ভারসাম্য হারাতে থাকে। ইন্দ্রাণীর বাঁচার শেষ অবলম্বন—সন্তানকে হত্যা করল। কলঙ্ক লেপে দিল সারা শরীরে। সমগ্র জীবনে। দশ দিন হাসপাতালে থাকার পর ইন্দ্রাণীকে ছুটি দেয়। একি সেই আগের ইন্দ্রাণী? বাড়িতে এসেও সে কখনো হাসে কখনো কাঁদে, সন্তান— আমার সন্তান, বলে চিৎকার করে ওঠে। আবোল-তাবোল কাণ্ড করে। অবনী সতীকাকে বুঝিয়ে বলে—আমার কোন দোষ নেই। বিশ্বাস করো সতিকা। ইন্দ্রাণী আমাকে ভাল মানুষের মতো ডেকে নিয়ে জড়িয়ে ধরে। যৌন কামনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কোন নারী এমন পাগল হতে আমি দেখিনি। ওরি— বাব্বা। আমাকে উদ্দেশ করে বলে, দিবাকর তো নেই কী হয়েছে? আপনি

তো আছেন। আমাকে শান্ত করুন। কামে শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমি দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাইলেও আমাকে জোরে আটকে রাখতে চেয়েছিল ও ছলনাময়ী। নিজেই আমাকে ধরতে গিয়ে পড়ে যায়। আমি লজ্জায় মুখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। তারপরের ঘটনা তোমার জানা। আমি আগেও দু-একবার দেখেছি দক্ষিণ পাড়ার যুবক রতিশের সঙ্গে কথা কয়। নাকি তারে ঘরে আসতে বলেছিল? রাতের খবর কে রাখে? আসলে ও কলঙ্কিনী। বেশ্যা। ভাই মৃত্যুর এক বছরও তো হলো না। কি আরম্ভ করেছে—ওসব! হায়, ভগবান! আমার পরিবার কলঙ্কিত হলো। এখন মুখ দেখাই কী করে। ইন্দ্রাণীকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

ইন্দ্রাণী বারবার চিৎকার কবে বলে, ভাসুর আমার ইজ্জত নষ্ট করেছে! আমাকে জোরে....। কত অনুরোধ করলাম, পায়ে ধরলাম। শুনল না। আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। ও খুনি, প্রতারক-চরিত্রহীন-লম্পট। অবনী বাড়ির অন্যদের বোঝাতে পেরেছে—ইন্দ্রাণী উন্মাদ হয়ে গেছে। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবর্দা দূরে দূরে থাকবে। সাবধানে থাকতে হবে। দিবাকরের মৃত্যুই ওকে উন্মাদ করে দিয়েছে। যৌবন বলে কথা—অল্পলে কি আর ঠিক থাকতে পারে? পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই অবনীর কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পরিবারের লোকজন অবনীর কথাই মেনে নিল। ইন্দ্রাণীকে ঘর থেকে—পরিবার থেকে জোরে বের করে দেয়। ওর কোন চিকিৎসাই হয়নি।

ইন্দ্রাণী স্বামীর জি পি এফের টাকা, এল আই সি এবং গ্রুপ ইন্সুরেন্সের কোন টাকাই পেল না। উপরন্তু ধর্ষিতা হয়ে কাঁদতে থাকে। একদিন তুহিন মদের ঠেক থেকে ফিরছিল। মধ্যরাত। উন্মাদ ইন্দ্রাণীকে খুঁজে বের করে বলে—এই পাগলী, এদিকে আয়, আমি তোকে সন্তান দেবো। স্বামী দেবো। নিবি? আয় তো, এদিকে আয়—কাছে আয়।

— আমাকে সন্তান দিবি? দিবাকর দিবি? সত্যি? পাগলী হাসে।

— আরে — আয়, দেবো তো বলছি। আমি সব পারি।

ইন্দ্রাণী এখন ভালমন্দ বোঝে না। শত্রু মিত্র বোধ যে হারিয়ে ফেলছে। তুহিন ইন্দ্রাণীকে ডেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ভাঙা কালিমন্দিরের পেছনে ইন্দ্রাণীকে রেপ করে। ইন্দ্রাণী শিশুর মতো সরলভাবে বলেছিল, তুই আমাকে সন্তান দে। আমাকে তুই ইতা কিতা করছিস? কামড়া-কামড়ি করিস কেন? আমাকে মারিস কেন? যাতিস কেন? কষ্ট লাগে। পাগলী বুঝতেই পারেনি যে, সে ধর্ষিতা হলো! এইভাবে তুহিন প্রায় সময়ই পাগলী ইন্দ্রাণীকে ভোগ করে। যৌন লালসা মেটায়। এতে তুহিনের কিছু বন্ধু-বান্ধবও জুটে যায়। সিরাপ খায়। মাতাল হয়। ফলে পাগলী সন্তান-সম্ভাবা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে একটি সন্তান প্রসব করে। দু'মাস বেঁচেছিল সন্তানটি। মৃত সন্তানটির পাশেই ইন্দ্রাণীকে বসে থাকতে দেখেছে অনেকেই। একদৃষ্টে সন্তানের দিকে চেয়েছিল। মৃত বাচ্চাটিকে কয়েকটি কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। এখন ইন্দ্রাণী কাঁদতেও পারে না। শুধু হাসে । দুঃখ-শোকের অতীত। বিড় বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করে। বোঝা যায় না।

ভদ্র সমাজের কল্যাণে ইন্দ্রাণী দ্বিতীয় বার মা হয়। পিতা কে? তুহিন না অন্য কেউ?

পার্টির নেত্রীর ছেলে বলে কেউ মুখ খোলে না। তখন শুধু তুহিন নয়। শরীরের লোভে তথাকথিত ভদ্র সমাজের অনেক পিশাচ রাতের অন্ধকারে ইন্দ্রাণীকে তুলে নেয়। একটা রাস্তার পাগলী এসব বোঝে না। পাগলীর মা হবার খবরটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে দেখে যে, সমাজের বড় মাথাই এর সঙ্গে জড়িত। ডাল ধরে টান দিলে গাছ নড়ে, বিষয়টা অনেকেই জানে। মান্য ব্যক্তিত্বের ছেলের নাম জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ধামাচাপা দেয়। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, পাগলীরাও সমাজে নিরাপদ নয়। রেপ হয়। গর্ভবতী হয়। লজ্জা নেই আধুনিক ভদ্র সমাজের? মেয়েরা কতটা অসহায় ও বিপন্ন তা ইন্দ্রাণী পাগলীকে দেখলেই বোঝা যায়। বসন্ত আসে। ধানে দুধশিষ হয়। পাগলী এসব বোঝে না। মহিলা কমিশনও বেশি দূর এগোয় নি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে যায় একসময়। কিন্তু সন্তান-মমত্ব বোধ জেগে ওঠে পাগলীর বুকে। পাগলী হলেও সে তো মা! ছেলে এখন দু'বছর। পাগলী ওকে আঁকড়ে ধরে রাখে। স্থানীয় মানুষেরা ছেলেটিকে গোবর্ধন নাম দিয়েছে। পাগলীকে এখন আর পাগলী বলে না। বলে— গোবর্ধনের মা। ডাস্টবিনের নোংরা ফেলনা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। হাজারো দুঃখে আশ্চর্যজনক ভাবে গোবর্ধন বেঁচে থাকে। বড় হতে থাকে। মায়ের বুকে মাথা রেখে ফুটপাতে ঘুমায়। ছেলেটি একটু দূরে গেলেই পাগলী হাউমাউ করে কাঁদে। ডাকাডাকি করে। খুঁজে আনে। কিন্তু কতদিন গোবর্ধন পাগলী মায়ের সাথে বেঁচে থাকবে? উন্মাদ মা তাকে কতদিন বাঁচাতে পারবে? হয়তো কোনদিন মা নিজেই ছেলেটিকে আঁচড়ে মেরে ফেলবে। পরে কাঁদবে। বাজারের ফুটপাতে পাগলীর ছেলে গোবর্ধন বড় হচ্ছে। সে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও অনাথ। কুলাইয়ের এক নিঃসন্তান দম্পত্তি বোবর্ধনকে দত্তক নিতে চায়। থানায় এসে ওসি সাহেব প্রবীরবাবুকে ধরলেন, আমরা পাগলীর ছেলেকে দত্তক নিতে চাই। আমরা ওকে নিজ সন্তানের অধিক স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করবো। মানুষ করবো। লেখাপড়া শেখাবো। আইনগতভাবে নিতে চাই। প্লিজ সাহায্য করুন।

—আপনি কী করেন?

আমি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে এগ্রি-ইন্সপেক্টর হিসাবে চাকুরি করি। আমার স্ত্রী সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। আমরা নিঃসন্তান। তাই...।

—চলুন গিয়ে দেখি গোধর্ণের মা কোথায় আছে। আপনারা গোবর্ধনকে নিয়ে যান। নইলে ও বাঁচবে না। একটা মানুষের বাচ্চা কতদিন নোংরা-আবর্জনার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। আইনগত সমস্যা পরে দূর করা যাবে। ও সি সাহেব ধরণীবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যান। উদ্দেশ্য গোবর্ধন ও তার মাকে খুঁজে বের করা।

কালিমন্দিরের নাট-বারান্দায় গোবর্ধন ও তার মা পাগলী শুয়ে আছে। গোবর্ধন তার মায়ের পেটের ওপর বসে খেলছে। পাগলী মিটমিট করে হাসছে। ও সি সাহেব এগিয় জোরে জোরে বলেন, গোবর্ধনের মা, তোমার গোবর্ধনকে দিয়ে দাও। ওরা মানুষ করবে।

বড় হলে তোমার ছেলে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। এভাবে তোমার গোবর্ধন বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না। নোংরা পচা খাবার খেয়ে মরে যাবে। জন্মের পর হয়তো স্নানও হয়নি। তেল-সাবানও পড়েনি। ওরা তোমার সন্তানকে আদর দিয়ে মানুষ করবে। পাগলী চেয়ে চেয়ে হাসে । — দিয়ে দাও। ও সি আরো এগোয়। পাগলী তার বাচ্চাকে দিতে চায় না। আঁকড়ে ধরে। প্রবীরবাবু জোর করে কেড়ে নিয়ে আসে। ধরণীবাবুকে বলেন, যান নিয়ে যান, তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করুন। ওকে মানুষ করুন। পাগলী হাসে । ওরা গোবর্ধনকে নিয়ে কুলাই চলে যায়। গোবর্ধন নতুন ঠিকানায় নতুন মা-বাবা পেল।

ঠিক দশদিন পরে দেখা গেল যে গোবর্ধনের মা মানিকভাণ্ডার বাজার থেকে পঁয়ত্রিশ কিমি পথ পায়ে হেঁটে কুলাই ধরণীবাবুর বাড়িতে উপস্থিত। এটা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মাতৃত্বের বড়ো অদ্ভুত টান। পাগলীটা প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিল। কী করে চিনল পথ? কেমন করে খুঁজে বের করল ধরণীবাবুর বাড়ি? সবই বড়ো অবাক লাগে না। ভয়ংকর উগ্রমূর্তি ধারণ করেছিল, পাগলী সন্তানকে পাওয়ার আশায়। ধরণীবাবুরা ভয় পেয়ে গোবর্ধনকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মাতৃত্বের আকর্ষণকে ছিন্ন করতে পারেনি। মায়ের টানের কাছে হার মানে। গোবর্ধনের মা গোবর্ধনকে নিয়ে হাসতে হাসতে আবার মাণিকভাণ্ডারে ফিরে আসে। পাগলী মাতৃত্বের উজ্জ্বল ভাস্কর প্রতিমূর্তি। মা-ছেলের বন্ধন চিরন্তন। কোন অবস্থাতেই একে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মা পাগলী হোক, আর যা-ই হোক। পাগলী আজ মাতৃত্বের গর্বে অহংকারী । এ সব শুনে ও সি সাহেব চুপ মেরে গেছেন। নতুন করে আবার পাগলীকে চেনেন।

গোবর্ধনের মা তিনদিন ধরে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। মৃতবৎ। অনাহার । খাওয়া নেই অনেকদিন। গোবর্ধন কী খাবে? কে তাকে খাবার দেবে? ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলো। ওরা এসে গোবর্ধনের মাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। গোবর্ধনও সেখানে গেল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপাতত গোবর্ধনকে অনাথ আশ্রমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। কেউ দত্তকও নিতে পারে। একদিন পরে ইন্দ্রাণীর জ্ঞান ফিরে আসে। শরীর সাংঘাতিক দুর্বল। উঠে বসতেই পারে না। ধরে ধরে ওঠবস করাতে হয়। হাসপাতালের খাবার খেয়ে শরীর আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। কিন্তু সে তো মনসিক ভারসাম্য-হীনতার রোগিনী। মানুষের সামনে সে আসতে চায় না। সর্বদা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। হয়তো লজ্জায়।

ইন্দ্রাণীর এই পরিণতির জন্য দায়ি কারা?

পাত্র

কি হে-ভাই টেম্পু, কেমন দেখলে? পছন্দ হয়েছে তো? ওখানে তো খোঁজখবর নিয়েই তোকে পাঠালাম। এবার নিশ্চয় আর অমত করবি না।

না-জামাই দাদা, এবারও জুৎসই হলো না। নাক উঁচু। বাঁ দিকের একটা দাঁত যেন বেরিয়ে আসছে। অনেকটা পাগলা ষাঁড়ের মতো মুখ!

হারামজাদা কস কি-রে? এবারও পছন্দ হলো না? তুই ঘাটে এসে হাঁড়ি ভাঙলি! তোর কপালে দুঃখ আছে। চিত্রগুপ্ত তোর কি ললাটে বিয়ে লেখেননি? তোর গলায় যদি কোন মেয়ে না ঝোলাতে পারি — তবে আমার অন্নজল যে বন্ধ হবে-রে! ঘরে গেলেই তোর দিদির এককথা — আমার ভাইডা কি সারাজীবন আইবুড়ো হয়েই থাকবে? আজ পর্যন্ত একটা মেয়েকেও পছন্দ করে দিতে পারলে না! অত নিষ্কর্মা হলে কি মানুষের চলে? চকমবোধাইয়ের তো একটা সীমা আছে? এক সপ্তাহের মধ্যে একটা সুশ্রী গুণবতী ভাল মেয়ে যদি যোগাড় না করতে পার — তবে স্বাদের টিফিনটা খাওয়ামু ঠিক মতন! তোমাকে ঘরেই তুলবো না। পথে পথে পাগলের মতো ঘুইর‍্যা বেড়াইতে হইব। কথাডা মনে থাকে যেন। একটা মাত্র শালা — তার বিয়েই দিতে পারলে না! এমন ভগ্নিপতি থাকন থাইক্যা না থাকন অনেক ভালা। বাড়ির কুত্তাও এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। সারাদিন-রাত খালি অফিস আর কাজ। সংসারে এক্কেবারে অনভিজ্ঞ, গাধা। এমন জানলে ...।

পাত্রী পছন্দ না হলে আমি কি করুম? দিদির কথা ছেড়ে দিন।

ছেড়ে দিলে কি হয় রে পাগলা। বয়স তো পঁয়ত্রিশে পড়ল। বয়োধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে। সময় মতো বিয়ে দিতে না পারলে — পরে আধপাগলা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবি, ফিরবি। কেউ জু-জিজ্ঞাস করবে না। এদিন না — ঐ দিন —মানুষ বাঁচে কদিন? তাছাড়া পুলা-মায়াডিরে মানুষ করতে হবে না?

— এসব বাদ দেন। বিয়ে বিয়ে করে আর আমাকে উস্তম-কস্তম করবেন না। সংসার ধর্ম আমার কপালে নেই। কত মানুষই তো সংসারধর্ম না করে জীবন পার করে দেয়। বিবাগি হয়। তারা দেখছি — ভালই আছে, পিছুটান নেই। তারচেয়ে আমি কাজকর্ম নিয়ে বেশ আছি। এমনই চলতে দেন। কোথাকার একটা অচেনা-অজানা মেয়ে উড়ে এসে ঘাড়ে বসবে। ঘর সামলাবে, খবরদারি করবে — তা আমার সহ্য হবে না।

— কস্ কি-রে ডাকাত? তোর বাপ নেই। মার বয়স হয়ে গেছে। কোন্ সময় কি ঘটে -- কে জানে। তোর বিয়ে দিতে না পারলে — স্বর্গে গিয়েও মহিলা শান্তি পাবেন না। আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। কত জ্বালা দিবি। তোর দিদি উঠতে বসতে আমাকে

খোঁচায়। এমন কি গালিগালাজও করে। এ বছর যদি তোর বিয়ে দিতে না পারি তবে তোর দিদি আমার পাতে ভাতের পরিবর্তে ছাই দেবে ! বেড়াল কি এমনিতেই গাছে চড়ে? তাইসে! বুঝলি?

— দিদি একটু বেশিই বলে। ওসব আপনার সহ্য হয়ে গেছে।

— হ্যাঁ-রে, আজকাল নাক উঁচু মেয়েদের নাকি সিনেমায় কদর বেশি। গেঁজদাঁতি নায়িকারা তো দর্শকদের পাগল করে তোলে। আচ্ছা, মেয়েটার হাইট কত? গান জানে?

— পাঁচ ফুট ২/৩ ইঞ্চি হবে। মেপে তো আর দেখিনি। রবীন্দ্র সংগীত জানে। একটা শুনিয়েছিল।

— কি নাম?

— উষারানি।

— বাঃ বড়ো প্যায়ারি নাম রে! লাগিয়ে দিলে পারতিস!

— কিন্তু নাক যে ভীষণ উঁচু। ভাগ্নে মানিক তো তাই বলল। চলতে ফিরতে যদি অন্যের গায়ে গুঁতো লাগে?

— রং কেমন? আই মিন গায়ের অন্যান্য গঠন-গাঠন?

— রং তো ফর্সাই। নাক এবং দাঁত ছাড়া আর সবই ভাল। দোতালা দালান-বাড়ি। দুটো চার চালা টিনের ঘর। পাকা ভিটে। তিন ভাইয়ের একমাত্র বোন। জমিজমাও প্রচুর। ঘরের ভাত। পুকুরের মাছ। ভাইয়েরা চাকুরে।

— তাহলে রাজি হলি না কেন রে পাগলা? আমি গেলেই সব ঠিক করে ফেলতাম। এমন সম্বন্ধ কি ছাড়তে আছে? যখন-তখন শ্বশুরবাড়ি বইয়া-ঘুমাইয়া খাইতি। তোর সঙ্গে আর কে কে গিয়েছিল?

— ভাগ্নে ছাড়া আমার বন্ধু তুহিন, আর পরেশ কাক্কু।

— তোর কাক্কু কি বলেন?

— উনি তো মেয়ে দেখেই মোহিত। সব মেয়েতেই হ্যাঁ। আমাকে কোন কিছু জিগ্যেস না করেই বলে দিয়েছিলেন — মেয়ে আমাদের খুব পছন্দ। এবার অন্যান্য কথা হবে। ভাতিজা অমত করবে না। বলেই আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে এবং ফিসফিস করে বলে — কি বলিস, টেম্পু বাবাজি? এ মেয়ে তো গানে বিশারদ, শিক্ষিতা, আর কি চাই! বড়ো লক্ষ্মী বউ হবে রে টেম্পু।

শুনে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমিও মুখের ওপর বলে দিয়েছি — এ মেয়ে আমার পছন্দই নয়। দাঁত উঁচু, নাক চোখা, দেখেন নাই?

— তোর ব্যবহারে কাক্কু খুব ব্যথা পেয়েছেন সেদিন। রাস্তায় দেখা হতেই বললেন — দেখ জামাই, টেম্পুর বিয়ে তোমরা দিতে পারবা না। ও-বিয়েই করবে না। মনের মধ্যে কি

আছে কে জানে। ও একটা গদাই। টেম্পুর জন্য মেয়ে দেখতে আর কখনোই যাবো না। এত ভাল মেয়েও ওর পছন্দ নয়। অপসরার মতো মেয়ে — তাতেও অমত। ও কি চায়? ফাজিল কোথাকার! বৌদি মানে — তোমার শাশুড়ি আমাকে অনুরোধ করেছিল — বলেই না আমি চেষ্টা করেছি। নতুবা এই বগাডার জন্য। নইলে ....। ভাবছি বাপ নাই। আ-রে কাকা তো আছি। ভাতিজাকে বিয়ে দেই, আনন্দ করি। সব কিছু কি আর সবার কপালে থাকে জামাই। তুমি একবার তুহিনের বাড়ি যেও। অন্য একটা গন্ধ পেয়েছি। যামু, বলে চলে এসেছি।

— কাক্কু যে মেয়ে দেখে তাতেই মজে যায়। সব মেয়েই ওনার পছন্দ। সবগুলোতেই সাক্ষাৎ ভগবতীকে খুঁজে পায়।

— কিন্তু আমি শুনলাম — ঊষারানি দেখতে খুবই ভাল। নম্র স্বভাব। গৃহকর্মে নিপুণা। যাক গে, তোর যখন মত নেই।

— তার চেয়ে এসব বিয়ে বিয়ে খেলা ছেড়ে দিন। বিয়ে আমি করবো না। ভাল লাগে না। বিয়ের গন্ধে বমি বমি ভাব হয়।

— বিয়ের পর তো বউকে চোখের আড়াল করবি না। এ পর্যন্ত কত নম্বর মেয়ে দেখলি?

— চৌদ্দ।

—তের নম্বর যেন, কেন বাদ দিলি?

— চোখ দুটো বড়ো বড়ো — রক্তিম ছিল। লাল চোখ আমার ভীষণ ভয়। কাক্কু তো ওকেও পছন্দ করেছিল।

— ঠিক আছে। তোর কাক্কুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নেব। উনি কি বলেন দেখি। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখিস দামড়া, বয়স কিন্তু পঁয়ত্রিশ পেরোল। এরপর মেয়ে পেতে কষ্ট হবে। পথে পথে শিবের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে।

— এসব মেয়ে দেখার জ্বালা থেকে আমাকে মুক্তি দেন। বিয়ে বিয়ে করে মাথা গরম করবেন না।

— বিয়ের পরই মুক্তি দেবো। তাছাড়া তুই তো কামাস বেশ ভালই। তোর এই ধন সম্পদ খাবে কে?

— মানুষে লুটে-পুটে খাবে। দশভূতে লুটে খাক। তাতে আপনার কি?

— দামড়া কয় কি-রে! তোর দিদি পাপোকে যখন আমি বিয়ে করি, তখন তোর বয়স কত হবে। বড়ো জোর নয়-দশ। সেই ছোটবেলা থেকেই তোকে দেখে এসেছি। কোলে পিঠে মানুষ করেছি। কিন্তু এখনো যে তোর হাব-ভাব সব বুঝতে পারি — এমন নয়।

মাঝে মাঝে কোথায় যেন ভুল হয়। তোর একটু চাপা স্বভাব কিনা। আর একটা কথা মনে রাখিস গোবর্ধন ঠাকুর — তোর মার বয়স হইছে, ওনাকে আর কষ্ট দিস্ না। সকাল-

বিকাল তো রান্নাভাত খাস্। মা, ভাত দাও — বললেই — দেরি করে না। কিন্তু মা যখন থাকবেন না তখন রান্না করবে কে? তেচাইল্ল্যা বয়সে কিন্তু বিয়েও পাবি না। মানুষ সন্দেহের চোখে দেখবে।

— কি যে বলেন জামাইদাদা। দিদি আছে না। রোজ গিয়ে দিদির কাছে চেয়ে খেয়ে আসব। এখন গেলেই তো খুব সাদাসাদি করেন — এটা খা, ওটা খা। তখন কি ফিরিয়ে দেবেন?

— জোলা কোথাকার! এ বছরে তোকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবই।

— আপনিই একটা বিয়ে করে ফেলুন। ঘরকন্নার কাজের অভাব হবে না।

— হারামজাদা কস্ কি-রে? তোর দিদি কি আমারে আস্তা রাখবে-রে? তোর দিদিকেই সামাল দিতে পারছি না। আবার আরেকটা আগুন ...। এমনিতেই পুড়ে ছাই। পরে দুটো মিলে আমাকে চিবিয়ে খাবে। ও সব বাজে কথা ছাড়। সিরিয়াস হ। হাসিস না গবেট।

— মনে হয় বিয়ের জন্য আমার চেয়ে আপনিই বেশি পাগল।

— শ্যালকের বিয়ে বলে কথা। পাত্রী দেখার ধরনই আলাদা। তোর গলায় এবার একটা কুসুমপাখি ঝুলিয়েই ছাড়বো। নইলে তোর দিদির আর প্যাডার-প্যাডার বন্ধ হবে না। ভাইবউ লইয়া কেমন রঙ-রস করে দেখুম নে।

— পাত্রীই দেখা হলো না। সানাই বাজবে কবে — তার ঠিক নেই। আবার ভাইবউ! দিদি একটা পাগলী।

—রাস্তাঘাটে, হাটবাজারে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় কেউ কেউ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে ধরায়। অপসবাকেও হার মানায়। স্কুল-কলেজে অনেক মেয়ে দেখি, যদি একটাকে ধরে আনতে পারতাম। কিন্তু পারি না রে-গোবরা, পারি না।

আনুষ্ঠানিক পাত্রী দেখতে গেলেই — যত ঝঞ্ঝাট। তোর পছন্দ হয় না। খালি দোষ দেখিস। খুঁত ধরিস। শুধু না বাচক বাক্য বলিস। ঠিক আছে আমি পরেশ কাক্কুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তোকে কিছু অষুধ দিতে হবে। এবার তোকে খেমটাতালে নাচতে হবে। বিকেলে বাড়ি থাকিস। অফিস থেকে ফেরার পথে তোদের ওখানে একবার যেতেও পারি।

— আচ্ছা, আইয়েন। তবে বিয়ের ব্যাপারে কোন কথা না বলাই ভাল। এসব মেয়ে দেখা পাগলামী আর ভাল লাগে না। মেয়েদেরও তো মান সম্মান বলে একটা জিনিস আছে! সামনে বসাইয়া প্রশ্ন — বাবার নাম কি? মামার নাম কি? কয়জন ভাইবোন? কতটুকু পড়াশুনা? আরো কত কি? এসব আবোল-তাবোল আমার ভাল লাগে না। ভীষণ লজ্জা লাগে। মাথা তুলতে পারি না।

— এসব ব্যাপার তোর না ভাবলেও চলবে। তোর দিদিও মা'র সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেবো। কবে যে তোর মাথায় টোপর উঠবে? ফুল ফুটবে বিয়ের? কে জানে!

কেন যে টেম্পুর মেয়ে পছন্দ হয় না — বুঝতে পারি না। প্রতিবারই একই ঘটনা, মেয়ে দেখতে যাই, চা-মিষ্টি খাওয়া-দাওয়া করি। খবর নেই। সমন্ধ নাকচ হয়ে যায়। অথচ দেখতে শুনতে ভাল সুশ্রী মেয়েই দেখে চলেছি। মেয়ে পক্ষকে পরে জানানো হবে বলে — চলে আসি। ব্যাপারখানা কি? নাকি ও কোথাও ডুব দিয়ে জল খায়। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই তুহিনের বাড়ি‑ সামনে চলে আসি। তুহিন বাড়িতেই ছিল।

— কি ব্যাপ:র জামাইদা। একটা চেয়ার টেনে বসতে বলে।

— টেম্পুর কোন মেয়েই পছন্দ হয় না। এ পর্যন্ত চৌদ্দ-পনেরটা মেয়ে দেখালাম। একটাওতে মন গলেনি। অনেক মেয়েই তো সুশ্রী নম্র ও শিক্ষিতা ছিল। তবু কেন ...।

— আমি একটা গোপন কথা কই। ওর নাকি একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিল। তবে সেটা কতটুকু গভীর বা হালকা জানা নেই। নয়নপুরে একটা স্কুল বাড়িতে রঙের কাজ করানোর সময় পার্বতী নামে এক বিধবা মহিলার মেয়ের সাথে মাখামাখি হয়। মেয়েটির নাম বুলি। খুবই সুন্দরী। ঝরনার জলের মতো। টেম্পুকে জলখাবার দিত। রূপ সুধা পান করার জন্য টেম্পু খুব উদ্বিগ্ন ছিল। একদিন পাড়ার ছেলেরা নাকি ওকে ধরে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়েছিল। বুলির সাথে দেখলে নাকি প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছিল। এরপর ঐ স্কুল বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে বড় বাঘাই চলে যায়। কোনদিন আর নয়নপুরে যায়নি। তবে আমি এ পর্যন্তই জানি। খোঁজ খবর নিলে আরো অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। সাপও ফোঁস করে উঠতে পারে।

— এখন উঠি তুহিন। অনেক কিছুই জেনে নিলাম। আসল রহস্যটা আন্দাজ করতে পারছি। এবার টু-দি পয়েন্টে অগ্রসর হবো। সব গোপন কথা সবখানে প্রকাশ করা যায় না।

সেদিন অফিস থেকে তাঁড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। টেম্পুকে একটা মোবাইল করি —

— হ্যালো।

— তুই কোথায় আছিস?

— আমি আছি বড় বাঘাইয়ের দক্ষিণে-পুরাণবাজারের কাছে।

— কি করছিস?

— ল্যাবার পেমেন্ট। ঠিকেদারির কাজকর্ম ইদানিং বড়ো ঝামেলা। সাইডে না থাকলে কাজ হয় না। ফাঁকি দেয়।

— আ-রে ফাঁকি তো তুইও কম দেসনি।

— আমি আবার কি করলাম? কেন ফোন করেছেন, কন?

— তোর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

— আমি দশ মিনিটের মধ্যে অবসর হয়ে যাবো। আপনি হরিদাসের চা-দোকানে চলে আসুন।

— ঠিক আছে, রাখি।

দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে একটু ভেতরের দিকে নিরাপদ স্থানে জাঁকিয়ে বসি। চা খেতে খেতে টেম্পুকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করি।

— অনেকগুলো মেয়ে দেখার পর্ব শেষ করলে, কিন্তু কোন মেয়েই পছন্দ করলে না। কোনটা দাঁত উঁচু, কোনটা নাক উঁচু, কোনটায় আবার গালে মেজ, বড় চোখ, বাঁকা দৃষ্টি ইত্যাদি , ইত্যাদি। কত কি! কিন্তু নৈদারচাঁন গোঁসাই, তুই তো কোন মেয়ের দিকে মুখ তুলেও তাকাসনি। পাত্রী দেখতে গেলেই মাথা নিচু করে থাকিস। জানালা দিয়ে বাইরে গরু ছাগল দেখিস। মাঠ বা আকাশে পাখি ওড়া দেখিস। তুই তো একটা মেয়েরও মুখের দিকে দেখিস না। তাহলে পছন্দ হলো — কি হলো না — কি করে বলিস? হারামজাদা!

— ভাগ্নে মানিক — মানিকই তো দেখে। ও যা দেখে, আমাকে বলে। আমিও তাই বলি।

— আরে গবেট কোথাকার! তুই মেয়ে না দেখে মন্তব্য করিস কেন? বাইরে গরু ছাগল দেখতে দেখতে তুই একটা আস্ত রামছাগল হয়ে গেছিস। দাঁড়িওয়ালা পাঁঠা কোথাকার! তুই পাঁচ-ছয় বছর আগে নয়নপুরে একটা বিল্ডিংয়ে রঙের কাজ করিয়েছিলি না?

— অ, তাতে কি হয়েছে?

— ওখানেই তো যত গিঁট। সেখানে তোকে একটি মেয়ে জলখাবার দিত না? তুই গায়ে পড়ে আলাপ করতিস। তারপর প্রেম। কিছু ঢলাঢলিও হয়েছিল। বুলির সঙ্গে তোর খটমটি কেন হলো? কেন ঝগড়া করে চলে এলি?

— এসব তিক্ত বিষয় আলোচনা না করাই ভাল। অতীতকে বর্তমানে টেনে আনা যায় না। দুঃখের অতীত মানুষকে কষ্ট দেয়। এসব কথা তুলে লাভ নেই। যা গেছে—গেছে। ওতে আর ফিরে যেতে চাই না। পুরানো কিচ্ছাতে পাঁচাগন্ধ বেরোবে।

— বুলিকে তুই ফিরিয়ে দিলি কেন?

— আমি ফিরিয়ে দেইনি। বরং ওই আমাকে যা-তা বলে শাসিয়ে ছিল। টিফিন দেবার আছিলায় আমার বিরুদ্ধে কতগুলো যুবককে লেলিয়ে দিয়েছিল। ওরা সেদিন আমাকে শারীরিক টর্চারও করে। একমাত্র বুলির জন্যই। তাছাড়া বুলি অন্যের বাগদত্তা। তাপস নামে একটা ছেলের সাথে বিয়ে হওয়ার কথা। তাপস আমাকে সরাসরি বলেছিল , বুলি আমার বাগদত্তা। ও আমার ভাবী স্ত্রী। ওর দিকে যদি হাত বাড়াস, তবে হাত কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেমু। জ্যান্ত পুঁতে ফেলুম। কুত্তার বাচ্চা! নয়নপুর থেকে পালিয়ে যা। এখানে কাজ করতে আইছিস —না মেয়ে পটাইতে আইছিস? তাপসের হাতে ছুরি ছিল। অন্যেরাও খুব বকাবকি করছিল। পরে জানলাম, বুলিই ওদেরকে পাঠিয়েছিল, আমাকে শায়েস্তা করতে। বড়ো দুঃখ পেলাম জামাইদাদা। সেই ঘটনার পর থেকে ওদিকে আর যাইনি। মনেও রাখিনি ওসব। নতুন করে

এখানে কাজকর্ম শুরু করি। এখন বেশ ভালই আছি। বিয়ে টিয়ের মধ্যে আমি আর নাই।

— একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। বলবি?

— বলুন।

— পাত্রী দেখার সময় — তুই জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকিস — গরু ছাগল দেখিস, মেয়ের দিকে মুখ তুলিস না, ব্যাপারখানা কি হে?

— যদি মতিভ্রম হয়। মায়াজালে জড়িয়ে পড়ি। এই ভয়ে।

— বুঝলাম না, খুলে বল।

— আমার এক বন্ধু চন্দন। তার সাংসারিক অবস্থা শুনলে আপনি আঁতকে উঠবেন। চন্দন প্রথমবার মেয়ে দেখতে যায় কাশিপুর গ্রামে। রাস্তার পাশেই বাড়ি। গরিব পরিবার। সঙ্গে গিয়েছিল চন্দনের বাবা ও মেসোমশাই, ছোটভাই প্রহ্লাদ। মেয়ে দেখার পর চন্দনের বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি চন্দন, পছন্দ হয়েছে তো? চন্দন কথা বলবে কি! মেয়ের দিক থেকে মুখ ফেরাইতেই পারছে না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তো আছেই! কোনরকম মাথা হেলিয়ে বলল, খুব পছন্দ আমার।

সাদামাঠা বিয়ে হল। আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব গিয়েছিলাম। বিয়ের কিছুদিন পরেই মনোরমা স্বমহিমায় ফিরে এল। মেয়ে মানুষ এমন দজ্জাল ও ঝগড়াটে হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবিনি। নম্র-স্বভাব-মিষ্টিমুখ কোথায় যে হারিয়ে গেল। মাসের শেষে মাইনের সমস্ত টাকাই বউয়ের হাতে তুলে দিতে হয়। নড়চড় হলে পেদানি খায়। গাড়িভাড়া রিক্সাভাড়া কত খরচ হলো, বাজার খরচার পয়সা নয়ছয় হলো কিনা — সব হিসাব দিতে হয়। উঠতে বসতে বাপান্ত। চন্দনের গালে মুখে নখের আঁচড়। সেদিন ওকে বউ জুতো পেটাও করেছিল। বেচারা বড়ো কষ্টে আছে। এরচেয়ে জেল, হাজতবাস অনেক ভাল। শুধুমাত্র ছোট দুটো ছেলেমেয়ের জন্যই সংসারে পড়ে আছে। নইলে কবেই হারামজাদি শালিকে পরিত্যাগ করে বিবাগি হতো। বৃদ্ধ মা-বাপকেও পর্যন্ত আলেদা করে দিয়েছে। অবিবাহিত ছোট বোন ভাই জলে ভাসল। সেদিন দেখা হলে — প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। বয়স যেন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। আমাকে দেখেই — হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমি বোধ হয় — আর বেশিদিন বাঁচব না রে টেম্পু! এই দেখ, আমার হাত-পায়ের অবস্থা। রান্না করতে গিয়ে গরম ভাতের ফেন পড়ে কেমন বিশ্রী ভাবে পুড়ে গেছে। হারামজাদি অষুধের টাকাটা পর্যন্ত দেয়নি। আমি চন্দনের করুণ অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যাই।

— সবার গোত্রকে এক ভাবিস না। সব মেয়েকে এক পাল্লায় তুলে মাপিস না বলদ। বুলি এখনো তোকে ভালবাসে। তোর পথ চেয়ে বসে আছে। নইলে সাতাশ বৎসরের যুবতীর এখনো বিয়ে হয়নি কেন?

— তা আমি কি করে বলবো, জামাইদাদা? টেম্পু চুপ করে থাকে।

—তোকে জানতেই হবে। নইলে যে মারাত্মক ভুল হবে রে।

— তাহলে সেদিন অন্যান্যদের সাথে বুলি কোমড় বেঁধে আমার সাথে ঝগড়া করতে এসেছিল কেন? তাপস পাল যখন বলেছিল — বুলি আমার বাগদত্তা— ভাবী স্ত্রী, কই তখন তো কিছুই বলেনি। প্রতিবাদ করে নি। মুখ দেখে বুঝেছি ও খুশিই হয়েছে। এরপরও কি বলেন বুলি আমাকে ভালবাসে? যত সব আজগুবি কথা।

— অ, ভালবাসে-ভালবাসে-একশবার, দুশোবার শত সহস্রবার অসীমবার ভালবাসে রে। গবেট কোথাকার। তুই একটা দামড়া গরু। নয়নপুরে তুই কুসঙ্গে পড়েছিলি। মদ-গাঁজা খেতে আরম্ভ করেছিলি। তুই যাতে কুসঙ্গ ত্যাগ করিস। খারাপ বন্ধু বান্ধবের সাথে না মিশতে পারিস — তার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু বিষয়টা এতটা গড়িয়ে যাবে ও বুঝতে পারেনি। পরে বুলি কেঁদে ছিল খুব। ওর অভিনয়ও কি তুই বুঝতে পারিসনি? রামকানাই! বুলির জন্য কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। আজও আসে। কিন্তু বুলিকে কোনমতেই রাজি করানো যাচ্ছে না। তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়েই করবে না। তোকেই স্বামী মেনে বসে আছে। তবে এখন দেখতে খাসা হয়েছে, মাইরি!

— সর্বনাশ ! একি বলেন? তাহলে তাপসের সঙ্গে ...?

— না রে টেম্পু, তাপসের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই ছিল না। বাগদত্তার তো প্রশ্নই ওঠে না। সবটাই সাজানো। তাপস বিয়ে সাদি করে সুন্দর সংসার ধর্ম পালন করছে। ঘরদোর সন্তান সামলাতেই এখন ভীষণ ব্যস্ত তাপস। তাপসের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। এ রকম ব্যবহারের জন্য ও এখন অনুতপ্ত।

— এত জানলেন কি করে? টেম্পুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে!

— তুই নাকি দুর্গাপুজোর সপ্তমির রাত্রিতে বুলির সঙ্গে কি করেছিলি সেই ঘটনা বুলি আজও স্বর্গের পবিত্রতম ঘটনার মতো মনে রেখেছে। দেহ মন প্রাণ তোকেই সমর্পণ করে বসে আছে।

—তাহলে দেখছি — সব জেনে গেছেন।

— জানার আর কি বাকি রইল রে? গত রবিবার আমি-তুহিন আর তোর দিদি নয়নপুরে গিয়েছিলাম। বুলিকে সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। ও কেঁদে কেঁদে সব বলল। ওর কাঁদার সঙ্গে যেন মুক্তো ঝরে। ওর মা আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেন, যাতে তোকে রাজি করাই। আমরা কিন্তু পাক্কা কথা দিয়ে এসেছি। খাওয়া-দাওয়াও করেছি। তোর দিদি তো বুলির হাত ধরে চোখের জল রাখতেই পারেনি। কত আদর করে এল। তারিখও ঠিক করেছে — ২২শে অগ্রহায়ণ। বুধবার। আর তুই না করিস না ভাই। ডুবে-ডুবে আর জল খাসনে। এবার আমারও একটু কদর বাড়ুক। আমাদের আর অযথা হয়রানি করাসনে। বল, মেয়ে দেখার নাম করে আর ভাঁওতাবাজি করবি না?

— আপনি আমার গুরুজন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আপনাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি। আপনি-দিদি যেখানে কথা দিয়েছেন, সেখানে কি আর না করতে পারি? বলেই লজ্জায় টেম্পু মুখটা নিচু করে রাখে।

— এই বলদা, মাথাটা তোল। দেখি মুখটা কেমন রাঙা হয়ে উঠল।

বিপন্ন সিঁড়ি

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ২৮শে অক্টোবর, ২০১০ ইং রোজ শনিবার, সকাল আট ঘটিকায় পূর্ব ব্রহ্মছড়া উচ্চবিদ্যালয়ের (প্রাথমিক বিভাগের) অফিস কক্ষে এক জরুরি সভার আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় এলাকার নেতৃবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

আলোচ্য সূচি ঃ

১) প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শ্রীদ্বিজলাল দাসকে বিদ্যালয়ে আসার পথে অভিভাবক কর্তৃক তেমাথার মোড়ে শারীরিক নির্যাতন।

২) বিবিধ

ইতি

নমস্কারান্তে

বি.কে. চক্রবর্তী

প্রধান শিক্ষক

পূর্বব্রহ্মছড়া উচ্চবিদ্যালয় (প্রাতঃ বিভাগ), পশ্চিম ত্রিপুরা।

উল্লেখিত এই চিঠির প্রতিলিপি এম.টি.এ, ভি.ই.সি এবং খুশিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য-সদস্যাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং এস.এফ.আই-এর ছাত্র নেতাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

চিঠির সময় মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে সবাই উপস্থিত। এলাকার অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সভার গুরুত্ব অন্যমাত্রা পেল। সভাপতিত্ব করেন দুপুর বিভাগের প্রধানশিক্ষক

শ্রীপরেশ দত্ত। আহ্বায়ক শ্রীবিকাশকুমার চক্রবর্তীকে সভার উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য বলা হলো। সম্বোধন পর্বের পরই তিনি মূল বিষয়ে আসেন এবং বলতে থাকেন, আমি যা বলব তা নিমন্ত্রণ পত্রেই উল্লেখ আছে। তবু সংক্ষেপে বিষয়বস্তু বলছি। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বিজলালবাবুকে বিদ্যালয়ে আসার পথে অলিক মজুমদারের বাবা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় আক্রমণ করেন। সাইকেল থেকে নামিয়ে পথের মধ্যেই তাকে শারীরিক নির্যাতন করেন। অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষককে প্রহার! উনি আবার দ্বিজলালবাবুকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য জোর করেছেন। স্কুলের সময় শিক্ষককে বাড়িতে নিয়ে কী করবে? গোপন কোন বদ্ উদ্দেশ্য ছিল না তো? মারতে বা বেঁধে রাখতেও পারেন। নাকি কিডন্যাপ? কে জানে? যদি এমনভাবে পথেঘাটে অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষককে আক্রমণ করা হয় তবে কিভাবে আমরা বিদ্যালয়ে আসব? ছাত্রছাত্রীকে পড়াবো? আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। এই অপকর্মের বিচার চাই। নিরাপত্তা চাই। এক নিঃশ্বাসে বিকাশবাবু বলে কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মোছেন।

সভার বিষয়বস্তু অভিনব। 'অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষককে শারীরিক আক্রমণ' আলোচ্য বিষয় মনের কোথায় যেন আঘাত করে। খটকা লাগে। খোঁচা দেয়। দুঃখে ভরে যায় মন। বিষাদে ভরে ওঠে চারদিক। বাতাসে যেন শ্বাসরুদ্ধ বিষাক্ত গ্যাসের বিচরণ। ভূপালের লিক করা বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ যেন এখানেও ছড়িয়ে পড়ছে। অভিযোগকারী শিক্ষক সম্পর্কে বক্তব্য শুনে সভায় পিন্‌ড্রপ্ সাইলেন্স! সবাই নিশ্চুপ মাটির দিকে চেয়ে আছেন ! যেন হয়তো এক্ষুনি ফেটে পড়বে আগ্নেয়গিরি। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক এত অবনমিত কেন? গ্রামপ্রধান সুব্রতবাবু সভাপতির উদ্দেশে বলেন, তাহলে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। অলিকের পিতার নাম কি? কে তাকে রাস্তায় আক্রমণ করল? পাশের দ্বিজলালবাবু বসেছিলেন, তিনি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন , অলিকের বাবার নাম পুলক মজুমদার, ওনার সঙ্গে আরো দু-তিনজন ছিল। নাম জানি না। মুখ চিনি। অলিক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে আসার সময় পথে অলিকের বাবা আমাকে আটক করেন এবং জোর করে হাত ধরেই বলেন, চলেন আমার বাড়িতে, ছেলেকে দেখবেন। নিশ্চয়ই কোন বদ উদ্দেশ্য ছিল। কোনমতে হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসেছি । নইলে ...। হয়তো ওনাদের কোমরে ছুরিও লুকানো ছিল। আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই। রাস্তায় রুক্ষ স্বরে একটি যুবক ছেলেও বলছিল — চলুন, — বাড়ি চলুন। ওকে চিনি না। আমিও কিছুটা গরম হয়ে চুল খাড়া করে বলেছি , না, আমি এখন আপনাদের বাড়ি যাবো না। আপনাদের বাড়ি গিয়ে আমি কি করবো?

— আপনি আমার ছেলেকে পেটালেন, জখম করলেন, এখন দেখতে যাবেন না? তা ও কি হয়? আপনি শিক্ষক না পিশাচ।

— আপনার ছেলেকে আমি পেটাইনি — জখমও করিনি। ছেড়ে দেন, স্কুলে যাবো।

আপনার নামে কমপ্লেইন করবো। তখন বুঝবেন ঠেলা কারে কয়। পাশেই ছিলেন বিপ্লববন্ধু, ক্লাবের সেক্রেটারি, উঠতি যুবক মোহিতোষ মণ্ডল। ওদের কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক সবাই শুনছিলেন।

অলিকের বাবা হঠাৎ মাথা গরম করে রগ চটিয়ে বলেন, এই বেডা, তুই কি লোমের শিক্ষক রে? ছাত্র মাইর‍্যা জখম করিস, রক্ত বের করিস! তুই তো জল্লাদ! ছাত্রদের কী পড়াবি? কী শিখাবি? হারামজাদা, গরু খাইবার গোঁসাই! তুই শিক্ষক নামের কলঙ্ক! ছাত্রদের কী করে শাসন করতে হয় এটাই এতদিনে শিখলি না! আলা-ইয়াল্যার পুত। এই বলে দ্বিজলালবাবুকে হাত ধরে টান দিতেই মাটিতে পড়ে যান। ঘাবড়ে যান। মাইগগো-মাই, আমার মাইর‍্যা লাইল রে। বলে চিৎকার দিয়ে উঠে দৌড়াতে লাগলেন এবং স্কুলে এসে প্রধানশিক্ষককে গুছিয়ে ব্যাপারটা বললেন।

মোহিতোষ মণ্ডল বলল, দ্বিজলালবাবুকে অলিকের বাবা মোটেই মারেন নি। আঘাত দিবার উদ্দেশ্যেও হাত ধরে টান দেননি। হয়তো সামান্য ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। এতেই দ্বিজলালবাবু মাটিতে পড়ে যান। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের এই সভা।

গ্রামপ্রধান সুব্রতবাবু ভিলেজ এডুকেশন কমিটির চেয়ারপার্সন পদেও অধিষ্ঠিত। উনি বলেন — আমরা দ্বিজলালবাবুর বক্তব্য এবং প্রারম্ভিক কিছু কথা শুনে বুঝতে পারলাম, বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ভাল নয়।

এটা বিদ্যালয়ের অশনি সংকেত। যাক, এবার পুলক মজুমদারের বক্তব্য জানতে চাই। সভাপতির অনুমতি নিয়ে পুলক মজুমদার বলতে আরম্ভ করেন, মাঝখান থেকে বললে কিছু অসুবিধা হতে পারে। তাই একদম গোড়া থেকেই সব বলি।

— ঠিক আছে, বলেন, সুব্রতবাবু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

মোহিতোষ মণ্ডল ঝট করে বলে ওঠেন, প্যাঁচাইয়া-প্যাঁচাইয়া আজাইরা কথা কম কন। আসল কথা বুঝাইয়া কন!

— চেষ্টা করুম। ঘটনাটা দুর্গাপুজোর আগে। ক্লাস চলছে। একদিন ক্লাসে পড়াতে গিয়ে দ্বিজলালবাবু আমার ছেলেকে খুব মারধোর করেন। তবে কি কারণে মারেন, দুষ্টামির জন্য, নাকি পড়া না পারার কারণ, সেটা বলতে পারবো না। তিনি বেপরোয়া আমার ছেলেকে আঘাতের পর আঘাত করেন। স্কুলের পুরানো একটা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে অলিকের পেটে চেপে ধরে নাভির গোড়ায় মোচড় মারেন। এতে অলিক প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করে ওঠে ব্যথায়। রক্ত ঝরে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাওয়ার পর সাংঘাতিক ব্যথা ওঠে। কেন এমন হলো? ছেলেকে বারবার জিজ্ঞাসা করার পর, বলল, দ্বিজলাল স্যার আমাকে পেটে মেরেছে। তারপর থেকেই ব্যথা। রাতে জ্বরও হয়েছিল প্রবল। জ্বরের ঘোরে বারবার বলছিল, স্যার আমাকে আর মারবেন না, স্যার আমাকে আর মারবেন না। কাল আমি পড়া শিখে আসুম— পড়া শিখে আসুম... ইত্যাদি।

ক্লাসের অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে সত্যতা যাচাই করে নিলাম। এইভাবে একজন

শিক্ষক শ্রেণিতে একটি শিশুকে মারতে পারেন — ভাবতেও পারি না! কয়েকবার স্থানীয় হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েছি। ব্যথা না কমায় জি.বি.তে নিয়ে গেছি। সবসময় ব্যথা না করলেও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ব্যথা ওঠে। ফলে অলিক চিৎকার করে ওঠে। চোখ মুখ নীল হয়ে যায়। কখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। রাতে ব্যথা উঠলে ঘুমোতে পারে না। বড়ো অসহায় লাগে। ডাক্তারের পরামর্শে সনোগ্রাফি করিয়েছি। নাভির গোড়া ফেটে গেছে। পৌষ্টিক নালীতেও আঘাত লেগেছে। কী হবে বুঝতে পারছি না। প্রতিদিন ওকে অষুধ খাওয়াতে হয়। ঠিকমতো পড়াশুনাও করতে পারছে না। ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে। যদি কিছু হয়ে যায়। পুলক হাতজোড় কবে অদৃশ্য ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করে, ঠাকুর তুমিই জান, আমার নীলমণির ধন ...।

আ-রে, যা-যা পুলক। তুই খঞ্জনি আর বাজাস না। তোর ছেলের এসব ব্যারাম আগেই ছিল। অহন-ছুঁতা পাইছস। দ্বিজলালবাবুর মাবের চোটে এ রোগ হয়নি। রোগ হয়েছে তো হয়েছে। মাষ্টারবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস কেন? মাষ্টারবাবু কি রোগ জীবাণু? বেকুব কোথাকার!

এসব ফন্দিবাজি ছাড়। আসল কথা হলো — এই সুযোগে কিছু টাকা পয়সা যদি ভাগিয়ে নিতে পাবিস। তোর মতলবটা আগে পাল্টা। সভার মধ্যিখান থেকে প্রৌঢ় জগদীশবাবু একথাগুলো বলেন। উনি বিদ্যালয়েব প্রাক্তনশিক্ষক। সবেমাত্র রিটায়ার্ড করেছেন।

— দেখুন জগদীশদা, আপনাকে আমি মান্য করি। আমি কোন মতলব নিয়ে কথা বলিনি। ফন্দিবাজি করিনি। একমাত্র ছেলের জন্যই এ-সব কথা বলছি। জি.বি. হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে প্রচুর টাকা খবচ হয়ে গেছে। এখন হাত শূন্য।

—- আগে তোকে দুইশ টাকা দ্বিজলালবাবু দেয়নি?

— অ, দিছে তো। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? দুইশ টাকা দিয়েই খালাস? দায় মুক্ত? ছেলেকে চিকিৎসা করাতে যে এত টাকা খরচ হয়ে গেল — তার কী হবে? আমি গরিব মানুষ। কিছু সঞ্চয় ছিল — সব শেষ। অহন কী যে করি!

— আয় বেড়া পথে আয়। তাহলে টাকাই চাস তুই?

— না জগদীশদা, আবার ভুল করলেন। টাকা আমি চাইনি। তবে যিনি আমার ছেলেকে জখম করেছেন ওনাকে বলে দেন — চিকিৎসা করাতে— আরোগ্য করে দিতে। তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকে না।

— আবি, বেহুদা। তোর ছেলেকে তো তুইই চিকিৎসা করাবি। নাকি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিবি? জন্ম দিয়েছিস তুই — দেখভালও তোর। ভবিষ্যতে ছেলেকে কি বানাবি, কোথায় চিকিৎসা করাবি, না অষুধের অভাবে মেরে ফেলবি — সেটা তোর ইচ্ছে। ছেলেটা তো তোকেই বুড়া বয়সে খাওন দিব। কাজেই তোর ছেলে তুই -ই দেখ। কিন্তু মনে রাখিস নৈদারচাঁন! আমি সাত সমুদ্রের খবর জানি। তোর ঘরের হাঁড়ি-পাতিল কোথায় খটখটায় তাও জানি। কাজেই ভাঁওতাবাজি করবি না।

তোর ছেলে আগেই অসুস্থ ছিল। দ্বিজলালবাবুর মারের চোটে আঘাত পায়নি। সুযোগ পাইয়া ফন্দিগিরি। লোক হাসাইয়া আর কলঙ্ক বাড়াস না চান্দু!

— আপনি একটু বাড়িয়ে বললেন জগদীশদা। আপনি তো সবই জানেন। তবে কেন উকালতি মারছেন? কথা আছে না, জাইন্যার মা পাইন্যা, উদারি গো মাই! সত্য কথা হলো দ্বিজলালবাবুর আঘাতেই আমার ছেলে অসুস্থ হয়েছে। আঘাত মারাত্মক না হলে কিছুই বলতাম না। গুরুজন তো শাসন করতেই পারেন, তাই বলে ...। ডাক্তারও বলেছেন, আঘাত থেকেই নাভির গোড়া ফেটে গেছে এবং প্রচন্ড ব্যথা ওঠে। সনোগ্রাফিতেও ধরা পড়েছে। কেন দাদা কথা ঘোরাতে চাইছেন? মোটিভটা অন্য পথে নিয়ে যাচ্ছেন?

জগদীশবাবুর গায়ে কোথায় যেন খোঁচা লাগল। খোঁচাতে জ্বালা ধরে। প্রাক্তনশিক্ষক এলাকাতে গণ্যমান্যতা পেতে চায়। ওনার চেয়ে বয়সে ছোট, ধরতে গেলে অর্ধশিক্ষিত, খেটে খাওয়া গরিব মানুষ, তার মুখের উপর কথা! জগদীশবাবু কথাতে সমর্থন না করা যেন সমাজে তার শ্রদ্ধা একটু কমিয়ে দেওয়া। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। চোখ মুখ লাল হয়। নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। আজকালের ছেলেদের হয়েছে কি— বড়দের কথা মানতে চায় না। কথায় কথায় যুক্তি দেয়। জগদীশবাবু তার নিজস্ব সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরতে চান। ঘুরপাক খান নিজস্ব চিন্তা ধারণার কুম্ভীপাকে — রক্তে মাংসের ঝড়ো সমুদ্রে ...।

— তোদের কাজটা ভাল হয়নি পুলক। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একজন ভদ্র শিক্ষককে যা-তা বলা, শারীরিক নির্যাতন করা গুরুতর অন্যায়! এই অন্যায়ের কি বিচার হবে সভার মাতব্বরেরাই ঠিক করবেন।

— কেন বারবার ভুল বলেন জগদীশদা? শারীরিক নির্যাতন আমি করিনি। সঙ্গে যারা ছিল — তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন — প্রমাণ পাবেন।

— তাহলে দ্বিজলালবাবু মাটিতে কিভাবে পড়ে যান? বাঁ-কনুইটা ছড়ে গেল কেন? সভার পেছন থেকে পঞ্চায়েত মেম্বার কমলেশ উঠে বলেন, হয়তো ভূতের ঠেলা! দিন দুপুরে ভূতে মারে ঢিল। সকলেই হেসে ওঠে। একমাত্র জগদীশবাবুই জানালা দিয়ে আকাশের নীল দেখেন। ছাত্রনেতা মৃণাল সেন বলেন — আপনারা সবাই উপস্থিত এবং অবগত আছেন যে, আজকের সভা ডাকা হয়েছে — পুলক মজুমদারের অপকর্মের বিচার করার জন্য, তার অপরাধ, প্রকাশ্য দিবালোকে শিক্ষক দ্বিজলালবাবুকে শারীরিক নির্যাতন। আচ্ছা দ্বিজলালবাবু, আপনাকে কি সত্যই ওরা রাস্তায় আক্রমণ করেছিলেন?

দ্বিজলালবাবু ঝটপট উত্তর দিতে পারেন না। একটু চিন্তা করে বলেন, হ্যাঁ আক্রমণ করেছিল। তবে ...। পুলক আমাকে ধরতেই আমি পড়ে যাই। ঠেলা মেরেছিল। এই দেখুন কানুইটা কেমন বিশ্রীভাবে ছড়ে গেছে।

সুব্রতবাবু প্রশ্ন করেন, এই আঘাতের জন্য কি আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

দ্বিজলালবাবু চুপ করে থাকেন। বুঝতে পারছেন না কী বলবেন। হেডমাষ্টার মশাইয়ের দিকে তাকান। হেডমাষ্টার মশাই মাথা হেলিয়ে কী যেন বলেন।

— তেমন কিছু ক্ষতিপূরণ চাই না। শ' দেড়েক টাকা খরচ হয়েছে। তবে ভয় যা পেয়েছি, তাতে পাঁচ হাজার দিলেও উসুল হবে না। আমি তো দৌড়ে ছুটে এলাম। ধড়ে প্রাণ ছিল না।

— আচ্ছা দ্বিজলালবাবু সত্যি করে বলুন তো, আপনি অলিককে কি দিয়ে মেরেছেন? ক্লাশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ব্যাপারটা দেখেছে। ওদের কাছ থেকে সত্য ঘটনাটা জেনে নিয়েছি। তবু আপনার মুখ থেকে আবার জানতে চাই। শিক্ষক হলে আপনি সত্যি কথাই বলবেন। সুব্রতবাবু জানতে চাইলে।

— অ, ব্যাট দিয়েই পেটে মেরেছি। এতটা লাগবে ভাবতে পারিনি। রাগের মাথায় তো ...।

— আপনার রাগ তো বেশ কড়া। যাক্, আপনারা সবাই দ্বিজলালবাবুর মুখ থেকেই সব সত্য জানতে পারলেন। এখানে আজ সভা ডাকা হয়েছে মূলত পুলক মজুমদারের বিচারের জন্য। আসলে ওর বাবার অপরাধ আংশিক সত্য হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সাক্ষি নেই। ছেলে মৃত্যুপথযাত্রী। সংসারে অভাব-অনটন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই দ্বিজলালবাবুকে রাস্তায় পেয়ে ছেলেকে দেখাতে বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উনি ভয়ে পেয়ে যান। চোরের মনে ক্ষীরাখেত। উনি তো সত্যই ওকে আঘাত দিয়েছেন। এটাকে আর লুকানোর প্রলেপ দেওয়ার দরকার নেই। তারপর সুব্রতবাবু সভাপতির উদ্দেশে বলেন — আমার কিছু বলার আছে ....।

— ঠিক আছে, বলুন।

— আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, দ্বিজলালবাবুকে শারীরিক নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সভা ডাকা হয়েছে। দ্বীজলালবাবু কী করেছেন এবং পুলক মজুমদার দ্বিজলালবাবুর প্রতি কি রকম ব্যবহার করেছে — তাও সভায় আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা, সেটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অলিকের চিকিৎসার খরচ কোথা থেকে আসবে। অথচ দ্বিজলালবাবুর আঘাতের ফলেই অলিক গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অলিকের বাবা গরিব। দিন আনে দিন খায়। ছেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সভায় এই ব্যাপারে আলোচনা হোক। সভায় নীরবতা নেমে আসে। মুখ গম্ভীর। সত্যই তো আলোচনা দরকার। প্রধানশিক্ষক পরেশবাবু বুঝতে পারলেন সভার উদ্দেশ্য ঘুরে যাচ্ছে। ছাত্রকে এভাবে মারা মোটেই উচিত হয়নি দ্বিজলালবাবুর।

দ্বিজলালবাবু তড়িৎ দাঁড়িয়ে বলেন, 'আজকের সভা মূলত আমাকে কেন ওরা শারীরিক নির্যাতন করেছেন — রাস্তায় আটক করে যা-তা বলেছেন — সে ব্যাপারে। ও সব অন্য একদিন হবে।

— রাখুন মশাই, আপনার শারীরিক নির্যাতন, ধমকে উঠেন মোহিতোষ। আপনার পেডার-পেডার আর ভাল লাগে না। এবার রামায়ণ বন্ধ করুন। আপনি তো একটা কসাই। হত্যাকারী। ছাত্রকে এভাবে পেটায় ? যদি অলিকের কিছু হয়, তখন বুঝবেন, কত ধানে কত চাল। জেলের ভাত খাওয়াইয়া ছাড়ুম। আমার নাম মোহিতোষ মণ্ডল। জগদীশদার পায়ের তলায় গিয়েও বাঁচতে পারবেন না। যেহেতু দ্বিজলালবাবুর আঘাতেই অলিকের আজ এই অবস্থা— তাই তাকে সুস্থ করে তোলার যাবতীয় খরচাপাতি দ্বিজলালবাবু ও হেডমাষ্টার মশাই মিলে দেউক। অন্য কোন সিদ্ধান্ত আমি মানি না। নতুবা পুলিশ কেইস করা হোক। কথাগুলো বলতে গিয়ে মোহিতোষ মণ্ডলের চোখমুখ লাল। রাগে কাঁপতে থাকে। মরু ঝড়ের মতন।

প্রাতঃবিভাগের প্রধানশিক্ষক বিকাশবাবু বলে উঠেন, আমি কেন টাকা দেবো ? আমি তো কোন ছাত্রছাত্রীকে পেটাইনি ? আর বেতও ব্যবহার করিনি। তবে ...!

— ডাইলে ফুরন দিয়েছেন — তাই ? বলেই মুচকি হাসেন সুব্রতবাবু।

— দ্বিজলালবাবু তো দুশো টাকা দিয়েছেন। আরো চাই ? চাহিদার শেষ নেই। কিন্তু আমি তো মারিনি। আমাকে টাকা দিতে হবে কেন ?

— আপনি তো প্রধানশিক্ষক। আপনার দায়-দায়িত্ব তো কম নয়। আপনি জানেন না আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীকে পেটানো, বেত মারা একদম বেআইনি। কদর্য অপরাধ। বেত দিলেও আমরা কিছু বলতাম না, যদি জীবন সংকট না হতো, জখম না হতো।

যদি অলিক অথর্ব হয়ে যায়। পড়াশুনা না করতে পারে। তবে ওর ভবিষ্যত অন্ধকার। এরজন্য দায়ি দ্বিজলালবাবু। এক্ষেত্রে আপনিও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

— অলিকের চিকিৎসার জন্য দ্বিজলালবাবুকে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে। লাগলে পরে আরো দেবেন। অন্যথায় পুলিশে মামলা করা হোক। মামলার কারণ স্বরূপ প্রতিলিপি বিদ্যালয় শিক্ষাঅধিকর্তাকে পাঠানো হোক। বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট এ-ব্যাপারে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এ-সব বক্তব্য রেখে ইতি টানলেন ছাত্র নেতা মৃণাল সেন।

— এইবার ঠেলা বুঝেন — দ্বীজলালবাবু। ছাত্রকে মারার প্রতিফল। বিকাশবাবু মুষড়ে যান।

— আমি কোন টাকা দিতে পারবো না। মামলা করুন। যা খুশি করুন গে। আমারও ভগ্নিপতি জোঁদরেল উকিল। আইনের প্যাঁচ কারে কয় দেখান ? উনি দিনকে রাত করেন, আর রাতকে ভোর। কই পুলকের বিচার করবেন — তা-না করে উল্টো আমাকেই ফ্যাসাদে ফেললেন দেখছি।

সভাপতি পরেশবাবু বললেন, দ্বিজলালবাবু, আপনি এখন একটু কথাবার্তা কম

কয়েন। চুপ করুন। পুলিশ কেইজ হলে — অধিকর্তাকে জানানো হলে, আপনার চাকরি চলে যেতে পারে । তখন কি করবেন হে, বাবু দ্বিজলাল, রামধন পুঁটি ? মতি দারোগার গোঁতা খেতে খেতে জেলে যাবেন। পুলিশের গুঁতো বড়ো বেপরোয়া, ধারালো যে ....।

দ্বিজলালবাবু এবং প্রাতঃবিভাগের হেডমাষ্টারবাবু যদি ক্যাশ দিতে অসম্মত হয় — তবে আজকের সভা এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হোক। আজাইর‍্যা কথা কইয়্যা লাভ কি ? পুলিশ কেইসে যা হয় হোক। এতে আমাদের কোন হাত নেই। কি বলেন সভাপতি মশাই ?

সভায় মৃণালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই একবাক্যে বললেন , তবে তাই হোক, পরেশবাবু আবার দ্বিজলালবাবুকে বলেন, দেখুন মশাই, পুলিশ কেইসে গেলে ভাল হবে না, সাতসমুদ্র তের নদীর জল খাওয়াইয়া আনব। তখন নাকে খত দিয়েও পার পাবেন না। চাকরি তো যাবেই। কলঙ্ক রটে যাবে। পত্র-পত্রিকায় নাম ঘৃণ্য অক্ষরে বেরোবে। লোকে আপনাকে কুবাক্য বলবে। আপনি চিকিৎসার খরচ দশ হাজার দিয়েন, আমি প্রস্তাব করি। দ্বিজলালবাবু চুপ। মাথা নিচু করে বলেন, আপনি যেটা ভাল বোঝেন। পরেশবাবু দাঁড়িয়ে বলেন, আমার একটা প্রস্তাব।

প্রস্তাব দিয়া আর কিতা হ-ইত ? জনৈক অভিভাবক মোচ ফাঁক করে বলেন, অলিকের চিকিৎসা বাবদ খরচ —দ্বিজলালবাবু দশ হাজার টাকাই দেবেন — এতে আপনারা আর অমত করবেন না। আসলে উনি ভাল-র জন্যই মেরে ছিলেন। শাসন করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। মন্দ ভাগ্য। বাবার হাতে যদি ছেলেটা ব্যথা পেত। কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটতে.... তাহলে ... ? কাজেই আমার প্রস্তাবটা মেনে নেওয়ার জন্য হাউসকে আনুরোধ করছি।

পুলকবাবু যদি মেনে নেয় — তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। পুলকবাবু বুঝে সুজে হেডমাষ্টার মশাইকে পরে জানিয়ে দেবেন। সুব্রতবাবুর ইঙ্গিতেই পরেশবাবু সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কিন্তু সভার কাজ কি সত্যিই সমাপ্ত হলো ? সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধে কি চেতনা সমৃদ্ধ হলো ?

নৃপেন্দ্র কুমার রায়
শোধন

প্রাক্তন শিক্ষক আকাশ রায় ছিলেন আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। অবসর গ্রহণ করে এখন তিনি দূরে, তাঁর ছেলেমেয়ের কাছাকাছি থেকে জীবনযাপন করছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য আমাদের কাছেও বেড়াতে আসেন। তাঁর ফলপ্রসূ শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও অন্যান্য কিছু উল্লেখযোগ্য কাজকর্মের সাক্ষি, আমি আজো আকাশবাবুর অনুরক্ত। তিনি আমাদের মাঝে শিক্ষকতায় বহাল থাকা অবস্থায়, সুষ্ঠুভাবে আমাদের চাকরি চালিয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয় পরিচালনা করার ব্যাপারে কোনরকম বিপত্তি দেখা দিলে, আমরা মুখ্যত আকাশবাবুর আন্তরিক সহযোগিতায় তা অনায়াসে দূর করে নিতাম। তিনি বিশেষ এক অবস্থানে থেকে বিদ্যালয়ে চাকরি করে গেছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকা সহ সবার পক্ষে বিভিন্ন রকম কাজকর্মে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি আমাদের সকলের মন জয় করে নিতে পারেননি। আমাদের কোন কোন সহকর্মীকে তাঁর প্রতি প্রায়ই অকারণেও ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকতে দেখা যেত। তবে ঈর্ষার আগুন তাঁকে বিন্দুমাত্রও দগ্ধ করতে পারেনি, তিনি সসম্মানে চাকরির সময়সীমা অতিক্রম করে অবসর গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে আমাদের বিদ্যালয়ে এক অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাতে আমরা যথেষ্ট নাজেহাল হই। তখন আকাশবাবু কর্মরত থাকাকালীন সময়ের মধ্যে ঘটা কয়েকটি ঘটনা আমাদের খুব মনে পড়ে।

ঘটনাগুলোর একটি, যা এখানে তুলে ধরছি, ঘটে বেশ কয়েক বছর আগে। সে বছর আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের ছেলে, অভিজিৎ আমাদের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পড়তে আরম্ভ করে দশম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বছর তিনেক ছেলেটি ভালই ছিল। কিন্তু নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে কয়েকটি সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং নানারকম অনভিপ্রেত ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তার উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়তে বাড়তে একসময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

অভিজিৎ এর দুরন্তপনার সম্মুখীন হয়ে এবং তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা কেহ কেহ স্টাফ রুমে বসে ছেলেটির বিরূপ সমালোচনা করতাম। কিন্তু ছেলেটির বাবা, আমাদের প্রাক্তন হেডমাস্টারের কাছে ক্রমাগত নালিশ করা ছাড়া আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছেলেটিকে শোধরানোর ব্যাপারে তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি। আকাশবাবু গম্ভীর মুখে বসে থেকে অভিজিতের বিরুদ্ধে আমাদের করা সমালোচনা শুনতেন, মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাতেন; কিন্তু বলতেন না কিছুই।

যে বছরের ঘটনাটি উপস্থাপন করছি, সে বছর আকাশবাবু নবম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত 'ক' শাখার শ্রেণি শিক্ষক। একদিন ক্লাসে যাবার পর সব ছাত্রীরা তীব্রভাবে আকাশবাবুর কাছে এই বলে অভিযোগ করতে থাকে যে, ওরা প্রাত্যহিক কর্ম, ক্লাসরুম পরিষ্কার করে আবর্জনা বাইরে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার পর, দশম শ্রেণির অভিজিৎ এবং সুবল স্তূপ থেকে কিছু আবর্জনা তুলে এনে ওদের ক্লাসে ছড়িয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে ছাত্রীরা প্রতিবাদ করলে, ছেলে দু'টি নানারকম অশালীন কথা বলে নাকি ওদের উপহাস করে। শুধুমাত্র সেদিনই নয়, ছেলে দু'টি নাকি প্রায়ই ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে জ্বালাতন করে থাকে।

অভিযোগ শুনে আকাশবাবু গম্ভীর হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকেন, তারপর ছাত্রীদের বলেন, "তোমরা যা বললে, তা যদি সত্যি হয়, তবে তার সবকিছু লিখে শ্রেণিশিক্ষক ও তোমাদের স্টুডেন্টস কাউনসিলের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে ছেলে দু'টির অশিষ্ট আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করে দরখাস্ত করতে পার। দরখাস্তে তোমরা প্রত্যেকে সই করে দরখাস্তটি আমার কাছে জমা দিলে, আমি এমন এক ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব, যাতে অভিজিৎ ও সুবল আর কোনদিন তোমাদের উত্ত্যক্ত করতে না আসে।"

তিতিবিরক্ত ছাত্রীরা পরদিন আকাশবাবুর কথা অনুযায়ী দরখাস্ত করে। আকাশবাবুও টিফিনের ঘন্টায় স্টুডেন্টস কাউনসিলের সাধারণ সম্পাদক, সঞ্জয়কে দরখাস্তটি পড়তে দেন। তা পড়ে সঞ্জয়ও উষ্মা প্রকাশ করে বলে, " দরখাস্তে লিখিত অভিযোগ তো এখন অভিজিৎ ও সুবলের নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে আমরা কয়েকজন মিলে কত রকমভাবেই না চেষ্টা করছি! কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছুই করতে পারছি না। আমাদের চেষ্টার ফলে দু'দিন একটু শান্ত থাকে, কিন্তু তৃতীয় দিনেই আবার স্বরূপ ধারণ করে ওরা ওদের নষ্টামি চালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। ওদের দুরন্ত আচরণ চলতে থাকলে, আস্তে আস্তে অন্যদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হতে শুরু করবে, তাতে আমাদের সহশিক্ষার ঐতিহ্যবাহী স্কুলটি একদিন উচ্ছন্নে যাবে। এ ব্যাপারটার সবকিছু দেখেশুনে আপনারা, স্যারেরাও তো স্কুলে এ দু'টি ছেলের অশোভন আচরণ বন্ধ করতে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন না। আমি মনে করি স্কুলে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে দুষ্ট ছেলেদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা দরকার। কিন্তু তা তো বোধ হয় সম্ভব হবে না, কারণ বড় দুষ্টটি হেডস্যারের ছেলে।"

সঞ্জয়ের কথা শুনে আকাশবাবু বলেন, "চাইলে ছেলে দু'টিকে বহিষ্কার করানো অসম্ভব নাও হতে পারে। আজ আমরা ওদের বহিষ্কার করার চেষ্টাই করব। তবে প্রথমে তা করা হবে এদের ভয় দেখিয়ে সংশোধিত করে নিতে, সত্যি সত্যিই স্কুল থেকে বার করে দিতে নয়। কিন্তু ওরা নিজেদের শুধরে না নিলে, ওদের বহিষ্কারের ব্যবস্থা করতেই চেষ্টা করব।"

সঞ্জয় বলে, "তবে তাই করুন স্যার। আমাদের কাউন্সিলের পক্ষে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সমর্থন করে যাব।"

আকাশবাবু ও সঞ্জয় নিজেদের মধ্যে কথা বলে দরখাস্তটিতে যৌথভাবে মন্তব্য করেন — "অভিজিৎ ও সুবলের দিন দিন বেড়ে চলা আপত্তিকর আচরণ, বিশেষ করে ছাত্রীদের সাথে, এক উদ্বেগজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতিটাকে আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। এদের এরূপ আচরণ চলতে থাকলে স্কুলে যেকোন দিন যেকোন বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অনেকেই বারবার বলে কয়ে এবং হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে নালিশ করে ছেলে দু'টিকে অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সুফল কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধান করে নবম শ্রেণির ছাত্রীদের অভিযোগটি যদি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তবে স্কুলের বৃহত্তম স্বার্থে বা স্কুলে শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা নিয়ে অবিলম্বে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।"

মন্তব্য করার পর আকাশবাবু নিয়মমাফিক দরখাস্তটি স্কুল অফিসে জমা দিয়ে দেন। দরখাস্ত যথাসময়ে হেডমাষ্টার মহাশয়ের হস্তগত হয়। দরখাস্তটি পড়ে দৃশ্যত শান্ত হেডমাষ্টার মহাশয় অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি রাগতকণ্ঠে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কিষনদাকে ডেকে বলেন, "স্টাফরুমে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে এখনই আমার চেম্বারে আসতে বল।"

সে সময় স্টাফরুমে উপস্থিত সাত-আটজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। আকাশবাবু তখন একাদশ শ্রেণিতে কর্মরত। হেডমাষ্টারবাবুর ডাকে আমরা ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁর চেম্বারে উপস্থিত হই।

হেডমাষ্টারবাবু ছাত্রীদের দরখাস্তটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, "পড়ে দেখুন, স্কুলে এক নতুন ধরনের উৎপাত আমদানি করা হয়েছে।"

আমরা একে একে দরখাস্তটি পড়ি, পড়ার শেষে গম্ভীর চেহারায় নির্বাক হয়ে বসে থাকি। তখন হেডমাষ্টারবাবু বলেন, "আপনারা তো দেখছি এরকম একটা জটিল ব্যাপারেও কেউই কিছু বলতে বা করতে চাইছেন না। তবে আমাকে বলতে হচ্ছে, আকাশবাবু এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছেন। তিনি নজিরবিহীন এত বাড়াবাড়ি না করে ছেলে দু'টিকে শাসন করে শুধরে নিলেই পারতেন। আপনারা সবাই তাই করতেন বলে আমার বিশ্বাস।"

সমালোচনামূলক এসব কথা শুনে এবার আমাদের মধ্য থেকে দু'জন, যাঁদের প্রায়ই আকাশবাবুর প্রতি ঈর্ষান্বিত রূপে দেখা যায়, একসময় বেশ জোরালো ভাবে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের বক্তব্য সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে স্কুলে টিফিনের ঘন্টা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানশিক্ষক আবার কিষনদাকে দিয়ে আকাশবাবু সহ আমাদের বাকি সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে পাঠান। সবাই তাঁর চেম্বারে উপস্থিত হলে, প্রধানশিক্ষক দরখাস্তটি এবং তাতে আকাশবাবু ও সঞ্জয়ের করা মন্তব্য পড়ে তাঁদের শোনান। তিনি ঘটনাটির সমাধান সূত্রও সবার কাছে দাবি করেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমাধানের কোন পথ আমরা দেখাতে পারিনি, সবে মিলে চুপচাপ বসেই থাকি।

প্রধানশিক্ষক তখন আকাশবাবুকে বলেন, "আপনার আজকের আর এক অভিনব কাজ দেখতে পাচ্ছি, আপনি স্কুল পরিচালন ব্যবস্থাতে ছাত্রছাত্রীদের জড়িয়ে এক নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন। আপনার এ প্রয়াসটি স্বচ্ছন্দ্যে স্কুল পরিচালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, শুধুমাত্র তাই নয়, আমাদের সর্বনাশও ডেকে আনবে। এরকম গর্হিত কাজ করার অধিকার আপনার নেই। আপনার আজকের কাজে উৎসাহিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে আপনাকেও স্কুল থেকে বহিষ্কার করার দাবি করতে পারে। তখন আপনি কি করবেন? ছাত্র দু'টিকে সংশোধন করার চেষ্টা না করে, বহিষ্কার করার সুপারিশ করা নিঃসন্দেহে শিক্ষানীতি বিরোধী কাজ। আপনার এ কাজের মীমাংসাটা এখন আপনাকেই করতে হবে।"

সব কথা শুনে আকাশবাবু বিক্ষুব্ধ চেহারায় প্রধানশিক্ষককে বলেন, "ডেকে এনে আপনি আমাকে যা বললেন, তা শুধুমাত্র আমার কাছে নয়, সঠিক কাজে অনুপ্রাণিত সবার কাছেই অত্যন্ত দুঃখ ও অপমানজনক। বিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে আপনি বলছেন 'গর্হিত' কাজ। তবে বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি পবিত্র কাজ? অনুগ্রহ করে আমার প্রশ্নটির উত্তর দিলে খুশি হব। স্যার, ক্ষমা করবেন, আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বাধ্য হয়ে কিছুটা আত্মপ্রচার করে বলতে হচ্ছে যে, আমি শিক্ষকতার যথাযথ আদর্শকে অনুসরণ করে মনেপ্রাণে ছাত্রছাত্রীদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমার পক্ষে সম্ভব সবরকম শিক্ষাদান করতে চেষ্টা করে আসছি। ফলস্বরূপ দেখতে পাই, বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কারো কাছেই আমি অবাঞ্ছিত বা অগ্রহণীয় বলে গণ্য হই না, সমাদৃত হই। এ অবস্থায় আমাকে বিদ্যালয় থেকে অপসারণ করতে কেউ ভরসা পাবে বলে আমার মনে হয় না। আপনিও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বিদ্যালয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে সমস্যা সৃষ্টিকারী ছাত্র দু'টি সম্পর্কে কর্তব্যবোধে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী যা করণীয়, তা আমি করেছি। এ ব্যাপারে আরো যা করার আছে, তা তো নিয়ম অনুসারে আপনারই করার কথা, আমার নয়। এ সম্পর্কে আমার আর কথা বলা সমীচীন নয়। অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দিন।" বলেই আকাশবাবু দ্রুত প্রধানশিক্ষকের রুম থেকে বেরিয়ে স্টাফ রুমে চলে যান।

পরিস্থিতিটা এরকম ঘোরালো হয়ে ওঠায়, আমরা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে থাকি। এরই মধ্যে এক সময় পঞ্চম ঘন্টায় ক্লাসে যাবার সময় হয়ে যায়। আকাশবাবু সহ আমরা অনেকেই ক্লাসে চলে যাই। ক্লাস সেরে আমরা আবার স্টাফ রুমে এসে বসি। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানশিক্ষকও ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধানশিক্ষককে নিয়ে স্টাফ রুমে আসেন। প্রধানশিক্ষক হাসিমুখে আকাশবাবুর দিকে এগিয়ে যান, বন্ধুর মত তাঁর হাত ধরে বলেন, "আমার ছেলের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য আমিও আপনাদের মত বিরক্ত ও দুঃখিত। আসুন, আজই আমরা ব্যাপারটার সুষ্ঠু ফয়সালা করে ফেলি।"

আকাশবাবু দ্বিরুক্তি না করে প্রধানশিক্ষকের সাথে তাঁর চেম্বারের দিকে চলতে থাকেন। আকাশবাবু ও প্রধানশিক্ষক আমরা উপস্থিতদেরও তাঁদের সাথে যেতে অনুরোধ করেন। আমরাও প্রধানশিক্ষকের চেম্বারে গিয়ে বসি।

প্রধানশিক্ষক অভিজিৎ ও সুবলকে ডেকে পাঠান। ছেলে দু'টি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালে, প্রধানশিক্ষক ছাত্রীদের অভিযোগটি তাদের কাছে তুলে ধরেন এবং এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য জানতে চান। ছেলেরা অভিযোগটি সরাসরি অস্বীকার করে।

প্রধানশিক্ষক তখন ছেলেদের বলেন, "নবম শ্রেণির সব ছাত্রীরা একে একে সই করে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এ অবস্থায় আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে, ছাত্রীরা অহেতুক অভিযোগ করেছে। তাড়াতাড়ি সত্য কথা বল, তা না হলে, পরিণতি খুব খারাপ হবে, তোমাদের স্কুল থেকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।" প্রধানশিক্ষকের অতি কড়া কথা শুনেও ছেলে দু'টি অভিযোগটি আবার অস্বীকার করে। তাতে প্রধানশিক্ষক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং ছেলেদের ভর্ৎসনা করতে থাকেন। তাঁর উত্তেজনার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং একসময় তা চরমে পৌঁছে। এ অবস্থায় আলমারি খুলে মোটা এক বেত বার করে তিনি এক অস্বাভাবিক চেহারা ধারণ করেন এবং ছেলে দু'টিকে বিশেষ করে তাঁর নিজের ছেলেকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করেন, সাথে সাথে নিজেও ভীষণভাবে হাঁফাতে থাকেন। তা লক্ষ্য করে মনে হয়, তিনি নিজের বিশেষ অবস্থান ভুলে গিয়ে তাঁর কোন এক আক্রোশ মিটাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

বেত্রাঘাতের চরম পর্যায়ে আকাশবাবু প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তাঁকে বলেন, "স্যার, নির্মমভাবে প্রহার করা দুষ্ট ছাত্রকে শিষ্ট করার সঠিক উপায় হতে পারে না। তাই বলি, আপনি অনুগ্রহ করে নির্দয় প্রহার করা বন্ধ করুন, শান্ত হয়ে বসুন। ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারটা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সহানুভূতিশীল হয়ে বলছি, মারধর না করে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করতে এখন আমি সম্মত আছি।"

আকাশবাবুর কথা মেনে নিয়ে প্রধানশিক্ষক বসে পড়েন এবং বিচলিত কণ্ঠে আকাশবাবুকে সমস্যা সমাধানের জন্য আবার অনুরোধ করেন।

আকাশবাবু অভিজিৎ এবং সুবলকে তাঁর কাছে ডাকেন। ওরা আসলে, তিনি ওদের বলেন, "তোমরা যদি লিখিতভাবে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনো কারো সাথে অশিষ্ট কোন আচরণ করবে না, বিদ্যালয়ের সব অনুশাসন মেনে চলবে, মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করবে, বিদ্যালয় এবং সকল ছাত্রছাত্রীর মঙ্গলামঙ্গলের কথা মাথায় রেখে চলবে, তবে আমরা তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে নেব, স্কুল থেকে বহিষ্কার করে দেব না। আর যদি প্রতিজ্ঞা না কর বা প্রতিজ্ঞা করেও তা ভঙ্গ কর, তবে কোন রকম অনুকম্পা না দেখিয়ে, তোমাদের নিশ্চিতভাবে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে। আর একটা কাজ, নবম শ্রেণির ছাত্রীদের কাছে তোমাদের

অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, তা করতে হবে তোমাদের ছোট বোন তুল্য ছাত্রীদের মন থেকে তোমাদের প্রতি বিদ্বেষভাব দূর করে তাদের মন জয় করে নিতে।”

স্বস্তির কথা, অভিজিৎ ও সুবল মাথা নত করে আকাশবাবুর সব কথায় রাজি হয়, শ্রুতিলিখন অনুযায়ী প্রতিজ্ঞাপত্রও লিখে দেয়। পরদিন প্রথম ঘণ্টায় প্রধানশিক্ষক ও আকাশবাবু স্টুডেন্টস কাউন্সিল এর সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় এবং অভিজিৎ ও সুবলকে নিয়ে নবম শ্রেণির ‘ক’ শাখায় যান। প্রধানশিক্ষক ও আকাশবাবুর সংক্ষিপ্ত কথার শেষে অভিজিৎ এবং সুবল তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রীদের সন্তুষ্ট করে ও নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনে।

সৌভাগ্যবশতঃ ছাত্র দু'টির সংশোধনের সূচনাটি খুব ভাল হয়। প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে দেবার পর থেকে, নিজেদের যথার্থ পথে পরিচালনা করে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে, অভিজিৎ ও সুবল যথাসময়ে বেশ ভালভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করে। জীবনে আজ এরা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের তথা সমাজের নির্ভরযোগ্য বিশেষ সহায়ক শক্তি।

নিষ্কৃতি

শহর থেকে বেশ দূরে ভাটি অঞ্চলে, কুশিয়ারা নদীর বাঁকে অতি সাধারণ এক গ্রাম, চরহাটি। গ্রামটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া উল্লেখ করার মত জনকল্যাণকর আর কিছু নেই।

কর্মক্ষম অধিকাংশ গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম রামনগরের বিত্তশালীদের বাগানবাড়ি ও চরভূমিতে চাষবাসের সময় খেত মজুর রূপে কাজ করে এবং নদী ও খাল-বিলে মাছ ধরে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেক সময় এরা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ পায় না বা মাছ ধরতে পারে না। তখন তাদের অবস্থা বড় কাহিল হয়ে পড়ে।

চরহাটি গ্রামের অন্যতম যুবক মহকব। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একদিন প্রথম হয়ে পঞ্চম শ্রেণি পাস করার পর সুযোগের অভাবে সে বাইরে গিয়ে আর পড়াশোনা করতে পারেনি। তাদের অনটন দূরীকরণে বাপকে সাহায্য করতে সে চাষবাস এবং মাছ ধরার

কাজে লেগে যায়। পড়াশোনায় বেশি অগ্রসর হতে না পারলেও মহব্বত সচেতন, কর্মঠ, সপ্রতিভ এবং আচার-আচরণে একজনকে মুগ্ধ করার মত। বাবার সাথে এক যুগ ধরে কাজ করার পর মহব্বতের মনে হয়, গ্রামে থেকে তাদের চিরাচরিত কাজের বিনিময়ে যতটুকু আয় হয়, তাতে জীবনের দীনহীন অবস্থা কোনদিনই ঘুচবে না। তাই সে মনস্থির করে, তাদের নিকটবর্তী বড় শহর শ্রীমন্তপুরে গিয়ে স্থায়ীভাবে অন্য কোন কাজ করে ভাগ্যোন্নতি ঘটাবে।

মহব্বত একদিন তার মা-বাবাকে বলল, "গ্রামে থেকে আমি আর আমাদের বংশানুক্রমিক কাজ করে সময় ও শক্তি নষ্ট করতে চাই না। এখানে বাপ-ছেলে মিলে যা রোজগার করি, তা দিয়ে তো আমাদের পাঁচ জনের সংসারটিকে সারা বছর সচল রাখতে পারি না। বাবা, তোমার বয়স হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যও অনেক ভেঙ্গে পড়েছে। ইচ্ছা থাকলেও তুমি আর বেশিদিন চাষবাস বা মাছ ধরার মত কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে না। তখন আমাদের একজনের রোজগার কমে গিয়ে সংসারের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়বে। আমাদের বসবাসের ঘরটিও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এবারের ঝড়-বৃষ্টির দিন আরম্ভ হওয়ার আগে ঘরটিকে মেরামত না করালে সেটিকে দাঁড় করিয়েই রাখা যাবে না। বোনেরাও বড় হয়ে উঠেছে। ওদের বিয়ে দিতে হবে। এসব কাজ করতে যথেষ্ট টাকা-পয়সার প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মিটাতে বেশি বেশি কাজ করে রোজগার বাড়াতে হবে। কিন্তু এখানে চাহিদামত কাজের সুযোগ কোথায়? এ অবস্থায় আমি শহরে গিয়ে অধিক রোজগার করার চেষ্টা করব। আমার শহরে যাওয়া ও থাকার ব্যাপার নিয়ে তোমাদের মনে চিন্তা দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে বলি, মামার সাথে আগেও তো আমি দু'বার শ্রীমন্তপুর শহরে গিয়েছি। তখন দিনের শেষে অন্য অনেকের সাথে আমরা বেশ আরামে ওখানকার রেল স্টেশনে রাত কাটিয়েছি। সে সময় লোকজনের সাথে কথা বলে জেনেছি, শহরের হোটেলে বা ঠিকাদারদের কাছে সহজে বেশ ভাল পারিশ্রমিকের কাজ পাওয়া যায়। এবারও শহরে গিয়ে আমি দু'চার রাত স্টেশনে কাটিয়ে দেব। এভাবে থেকে, চেষ্টা চরিত্র করে কোন এক হোটেল বা ঠিকাদারের যে কোন কাজে নিযুক্ত হয়ে যাব। কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সহজেই হয়ে যাবে। কাজেই আমাকে নিয়ে তোমাদের দুর্ভাবনার কিছু নেই। আমার কথাগুলো বিচার-বিবেচনা করে তোমরা আমাকে ভাল রোজগারের উদ্দেশ্যে শহরে যেতে দাও।"

একমাত্র ছেলে মহব্বতের মুখে দূরে চলে যাবার কথা শুনে মা-বাবার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই ওরা সহজে ছেলের কথায় সায় দিতে পারেননি। নীরবতা রক্ষা করেই চলতে থাকেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলের ক্রমাগত ঐকান্তিকতাপূর্ণ কথা শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা-বাবা ছেলেকে শহরে যেতে অনুমতি না দিয়ে থাকতে পারেননি।

দেরি না করে মহব্বত একদিন কিছু অর্থ, কাপড়-চোপড়, চিঁড়ে-গুড় এবং একটি মগ এক থলেতে করে সঙ্গে নিয়ে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে, শ্রীমন্তপুরের উদ্দেশে নৌকো

যোগে চরহাটি থেকে ভোরের দিকে বেরিয়ে পড়ে, বিকেল চারটে নাগাদ শহরে পৌঁছেও যায়। তার থলেটি কাঁধে ঝুলিয়ে মহব্বত শহরের এদিক-ওদিকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। সন্ধ্যার দিকে তার বেশ ক্ষিধে পেয়ে যায়। ফলে সে সাধারণ একটা হোটেল বার করে নিতে তৎপর হয়। একটু সময় খোঁজাখুঁজি করে রাস্তার পাড়ে, তার মনোমত হোটেল একটি পেয়েও যায়। সেখানে সে ডাল-সব্জী দিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এরপর মনে মনে স্থির করে রাখা তার রাতের আস্তানা, রেল স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

স্টেশনকে রাতের আশ্রয়স্থল করে নিয়ে মহব্বত দিনের বেলা কাজ যোগাড় করে নিতে মনেপ্রাণে চেষ্টা করতে আরম্ভ করে। সৌভাগ্যবশতঃ সে তার প্রত্যয় অনুযায়ী দু'দিনের মধ্যেই শহরের উল্লেখযোগ্য হোটেলগুলোর একটিতে কাজ পেয়ে যায়। হোটেল মালিকের সাথে কথা বলে স্থির হয়, মহব্বত হোটেলে থেকে খেয়ে মাসে দেড় হাজার টাকা বেতন পাবে। তাতে মহব্বত খুব খুশি হয়, কারণ সে তার বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও গড়ে প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে পারেনি। তাই সে উৎসাহ ভরে কাজে লেগে পড়ে।

কাজ করতে আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই মহব্বত একদিন হোটেলের দোতলায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এক ঘরে একজনকে রাতের খাবার পরিবেশন করতে যায়। সে ঘরটির দরজার ঘন্টা বাজালে, ভেতর থেকে গম্ভীর চেহারার এক যুবক আবাসিক সন্তর্পণে দরজা খুলে দেয়। ঘরে ঢুকে মহব্বত টেবিলে খাবার রাখতে আরম্ভ করলে, আবাসিকটি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কাজ সেরে মহব্বত ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবাসিক তার গাম্ভীর্য ত্যাগ করে স্মিতমুখে, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মহব্বতকে একটু দাঁড়াতে বলে। মহব্বত দাঁড়ালে, আবাসিক তার নামধাম এবং হোটেলের কাজ ও পরিবার সংক্রান্ত ব্যাপারে জানতে চায়। মহব্বত সংক্ষিপ্তভাবে তাড়াতাড়ি আবাসিককে তার জ্ঞাতব্য সবকিছু জানিয়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু আবাসিক তখনই তাকে যেতে দেয়নি। সে অনুরোধ করে হাতে ধরে মহব্বতকে তার বিছানায় বসায়।

মহব্বতের ব্যাপারে তার আগ্রহ অনুযায়ী কিছু জানার পর, আবাসিককে অতিমাত্রায়, অনেকটা অস্বাভাবিক রকম করুণার্দ্র হয়ে উঠতে দেখা যায়। সে পরম মমতাময়ের মত মহব্বতকে বলে, "আমাকে মহির বা মহিরসাহেব বলে ডাকা হয়। তোমাকে দেখার পর থেকেই, কেন জানি না, তোমাকে আমার নিজের একজন বলে মনে হচ্ছে। অধিকন্তু এখন তোমার কাছ থেকে জানলাম, তুমি সত্যি সত্যিই আমার সমগোত্রীয়, আপনজন।

একজন আপনজন হিসেবে আমার মনে হয়, হোটেল থেকে মাসে মাসে সামান্য দেড় হাজার টাকা বেতন পেয়ে তুমি তোমাদের সংসারের অভাব-অনটন কোন দিনই ঘোচাতে পারবে না। অন্যের পক্ষে হিতকর কিছু করার ক্ষমতা আমার আছে। আমি তোমাকে আমাদের কোম্পানিতে অনেক বেশি বেতনের চাকরি দিতে পারি। আমাদের কোম্পানিতে চাকরি করতে হলে, তোমাকে অবশ্য আমাদের বিদেশের শিক্ষা শিবিরে ছয় মাস থেকে খেয়ে মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল

চালানো এবং অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিখতে হবে। কাজগুলো শিখে নেবার পর, ফিরে এসে এদেশেই তুমি তোমার নির্ধারিত কাজ করতে পারবে। তোমার চেহারা ও স্বাস্থ্য দেখে এবং কথা শুনে আমার বিশ্বাস, তুমি আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে অনায়াসেই সব কাজ শিখে নিতে পারবে। 'তোমার শিক্ষাকালীন সময়ে তুমি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাসোহারা পাবে। সব কাজ শেখা হয়ে গেলে, তোমার মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা থেকে আরম্ভ হবে। আমি আগামীকাল সকালেই এ হোটেল ছেড়ে চলে যাব। তুমি যদি আমার প্রস্তাবিত চাকরিটি করতে রাজি থাক, তবে তিন-চারদিন পর হীরাগঞ্জ শহরের শাহি হোটেলে, বার নম্বর রুমে সকাল দশটার মধ্যে আমার সাথে দেখা করো। আমি তোমাকে যা বললাম, তার একটি কথাও কোন অবস্থাতেই এখানকার কারো কাছে প্রকাশ করো না।"

প্রলুব্ধ হওয়ার মত অনেক টাকা বেতনের চাকরির প্রস্তাবে মহব্বত দিশেহারা হয়ে পড়ে। কি করবে না করবে ঠিক তখনই বুঝে উঠতে পারেনি। এ অবস্থায় এক সময় সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার কাজে মন দেয়।

তাদের মত গরিবের পক্ষে অতি লোভনীয় মহিরের প্রস্তাবটি মহব্বত সারা রাত ধরে ভেবে দেখে এবং শেষপর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে যে, সে প্রস্তাবিত চাকরিটি গ্রহণ করবে। তাই এক ফাঁকে সে মহিরকে তা জানাতে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের কোম্পানিতে আমি কবে নাগাদ চাকরি পেতে পারি? মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল চালানো শিক্ষা করা ছাড়া আর কি কি কাজ আমাকে শিখতে হবে?"

উত্তরে মহির বলে, "তুমি যেদিন আমার কাছে যাবে, তার পরদিন থেকেই তোমাকে আমি চাকরিতে নিয়োগ করে ফেলব। একই সাথে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, তুমি শিক্ষা শিবিরে যোগদান করার পর শিবিরের প্রধান কর্মকর্তা তোমার সামর্থ্য বিচার করে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তোমাকে জানাবেন। এ ব্যাপারে তোমার চিন্তা করার কিছু নেই।"

মহিরের কথায় আস্থা রেখে মহব্বত তাকে বললে, "হোটেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার কাছে চলে যাব।"

মহব্বতের কথা শুনে মহির খুব খুশি হয়। সে তার মানিব্যাগ খুলে দু'হাজার টাকা বার করে। টাকাটা সে মহব্বতের হাতে তুলে দিতে চায়। কিন্তু মহব্বত তা নিতে অস্বীকার করে। মহির তখন বলে, "তোমাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে এবং তোমাদের দুর্বল আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে তোমার প্রাপ্তব্য মাসোহারা থেকে অগ্রিম হিসেবে টাকাটা তোমাকে দিতে চাইছি, দান বা খয়রাতি হিসেবে নয়। প্রয়োজন মনে করলে, সামান্য কিছু টাকা নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা বাড়ির চাহিদা মিটাতে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও।" এসব বলে মহির টাকা দিতে পীড়াপীড়ি করতে থাকায়, মহব্বত শেষপর্যন্ত টাকাটা নিয়ে নেয়।

মহিরের দেওয়া চাকরি ও দু'হাজার টাকার সব কথা জানিয়ে মহকব তার বাবাকে চিঠি লিখে। চিঠিটি এবং এক হাজার আটশ' টাকা সে লোক মারফত বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

মহকব তার কথা রক্ষা করে নির্দিষ্ট দিনে মহিরের কাছে হাজির হয়। মহিরও তার দেওয়া কথা অনুযায়ী, মহকবকে তাদের কাজে নিযুক্ত করে নেয়। কয়েকদিন পর, সে রসিন নামে এক যুবকের সাথে মহকবকে বিদেশের মাটিতে, পাহাড় অঞ্চলে বিশাল এলাকা নিয়ে স্থাপিত তাদের কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার একজন একদিন মহকবকে নির্জন এলাকায় অবস্থিত প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান কর্মকর্তার দপ্তরে নিয়ে যায়। প্রধান কর্মকর্তাটি মনে সম্ভ্রম উদ্রেককারী চেহারার আর এক যুবক।

কর্মকর্তা মহকবকে তার সামনে বসিয়ে বলে, "তোমার নাম কি? তোমাকে এখানে কে, কার সাথে পাঠিয়েছে?"

মহকব যথাযথ উত্তর দেয়।

কর্মকর্তা বলে, "তোমাকে আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। কারণ তোমার সম্পর্কে সবকিছুই মহির বিস্তারিতভাবে আমাকে জানিয়েছে। তোমাকে এখন প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি সম্বলিত একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে দিয়ে, আগামীকাল থেকে তালিম নেওয়া শুরু করতে হবে।" এতটুকু বলে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি ও প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি মুদ্রিত কাগজ মহকবের হাতে দেয়। মহকব কাগজটি মন দিয়ে পড়ে। তার পঠিত বিষয়ের ভাষা ঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি ঃ—

১) মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, রাইফেল ও রিভলভার চালনা।

২) ম্যাপ দেখে বিশেষ কোন স্থান বার করা।

৩) বোমা তৈরি করা, জনতার ভিড় হয়, এমন স্থানে বোমা লুকিয়ে রাখা বা ছুঁড়ে মারা এবং রিমোট কন্ট্রোলের যন্ত্র ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪) সকল ভোগ্যবস্তু ভোগ করতে অভ্যস্ত হওয়া।

প্রতিজ্ঞাপত্র ঃ— আমাদের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ব্যাপারে আমাদের দলীয় কর্তৃপক্ষের সকল নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে, পরমনিষ্ঠার সাথে আমি পালন করব। কোন নির্দেশ যদি আমি অমান্য করি, তবে যে কোন শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত স্বীকার করে নেব।

স্বাক্ষর — ঠিকানা — তারিখ —

মুদ্রিত কাগজটি পড়ে মহকব আঁতকে ওঠে! তার চক্ষুস্থির হয়ে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে! সে বুঝতে পারে, দরদি আপনজন সেজে মহির তাকে এক মারণ-ফাঁদে নিক্ষেপ করেছে।

এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কোন উপায় সে দেখতে পায় না। ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ার ফলে সে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে ইতস্ততঃ করতে থাকে। তা লক্ষ্য করে কর্মকর্তা বিরক্ত হয় এবং রুক্ষ কণ্ঠে তাড়াতাড়ি সই করে প্রতিজ্ঞাপত্রটি তাকে দিয়ে দিতে তাগিদ দেয়। তাতে সে আরো ঘাবড়ে যায়। মাথা চুলকাতে চুলকাতে মিনমিন করে কর্মকর্তাকে বলে, "স্যার, আমি এক অনুন্নত গ্রামের অতি সাধারণ লেখাপড়া জানা ছেলে, আমার পক্ষে কি রাইফেল, রিভলভার, বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের ক্রিয়াকৌশল শেখা ও প্রয়োগ করা সম্ভব?"

মহকবের কথা শুনে কর্মকর্তার বিরক্তির মাত্রা বেড়ে যায়। তাই সে ভ্রূ কুঁচকে অধিকতর রাগতস্বরে বলে, "হ্যাঁ, সব কিছুই তুমি শিখতে ও করতে পারবে, আর যদি পারবে না বলে মনে কর, তবে তোমাকে মহিরের দেওয়া দু'হাজার এবং তোমার এখানে আসা ও থাকা খাওয়ার খরচ বাবত তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার টাকা এ মুহূর্তে পরিশোধ কর। তারপর আমরা তোমাকে নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখব। মনে রেখো, এখানে এসে কেউই আমাদের এরকম বিশেষ ভাবনাকে এড়িয়ে, কোন কিছু করতে পারে না।"

কর্মকর্তার শেষদিকের কথাগুলোকে মহকব মারাত্মক এক বিপদ সংকেত বলে মনে করে। তাতে সে চূড়ান্তভাবে ঘাবড়ে যায়। কিন্তু চেষ্টা করে তা সে মোটেই প্রকাশ করেনি। পক্ষান্তরে, মনে মনে সে তার মুক্তির একটি পথ নির্ধারণ করে, কর্মকর্তাকে স্মিতমুখে, বিনীতভাবে বলে, "না, না, স্যার, আমি প্রশিক্ষণ শিবিরের কোন কাজ শিখতে ও করতে পারব না বলছি না, আমি শুধু আমার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। সবকিছুই শিখতে ও করতে পারব বলে আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার ওপর ভরসা রেখে, আমি মনেপ্রাণে সব কাজ ভালভাবে শিখে নেব এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবক্ষেত্রে তা অবশ্যই দেখাব।" এসব কথা বলে মহকব তাড়াতাড়ি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে প্রধান কর্মকর্তাকে দিয়ে দেয়।

পরদিন থেকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মহকব নির্ধারিত কাজের তালিম নিতে আরম্ভ করে। নির্দিষ্ট ছয় মাসে সে শিক্ষণীয় সব কিছু ভালভাবে শিখে নিয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। শিবির কর্তৃপক্ষ তাতে খুশি হয় এবং ফল স্বরূপ তার মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে, তাকে ব্যবহারিক ভাবে কাজ করতে মহিরের দ্বারা পরিচালিত তাদের গোপন ডেরায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়। দেশে ফিরে মহকব মহিরের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচরের মত চলতে থাকে। তার আচার-আচরণে মহির মুগ্ধ হয় এবং মহকবকে সে তার বিশেষ আস্থাবান ও নির্ভরশীল বলে ধরে নেয়। সে মহকবকে বাস্তবক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী রূপে গড়ে তুলতে যত্নবান হয়। তাই শুরুতে সে তার দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য অভ্যস্ত কর্মীদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে মহকবকে পাঠাতে থাকে। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকার পর, মহিরের মনে হয়, মহকব তাদের শত্রুনিধনের কাজ ভালভাবেই করতে পারবে।

মহির এক শনিবার খবর পায়, সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মন থেকে ত্রাস দূর করতে দূরবর্তী রাধানগর গ্রামের স্কুল মাঠে পরদিন, রবিবার বিকাল তিনটায় আতঙ্কবাদ বিরোধী এক সর্বদলীয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। খবরটাকে একসাথে তাদের অনেক শত্রু নিধনের সুযোগ বলে ধরে নিয়ে, মহির মহকবকে সব তথ্য জানায় এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়, "তুমি আগামীকাল অবশ্যই মোটর সাইকেল নিয়ে যথাসময়ে স্কুল মাঠে পৌছবে এবং শক্তিশালী বোমা দু'টি অতি দ্রুত সভায় ছুঁড়ে ফেলে চোখের নিমেষে পালাবে।"

নির্দেশমত মহকব মহিরের হেপাজত থেকে বোমা ও পিস্তল নিয়ে মোটরসাইকেলে সভাস্থলের দিকে রওয়ানা হয়।

কিন্তু মহিরের দৃষ্টির বাইরে গিয়েই, সে থানার পথ ধরে, দ্রুতবেগে থানায় পৌছেও যায়। থানা কর্তৃপক্ষের কাছে তাড়াতাড়ি বোমা, মোটরসাইকেল ও পিস্তল জমা দিয়ে, সে নিজের এবং তাকে শঠতাপূর্ণ উপায়ে ঘৃণ্য হিংসাত্মক কাজে নিয়োগকারী সন্ত্রাসবাদী দলটি সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলে। সবশেষে, সৎপথে জীবনযাপন করার আকাঙক্ষা প্রকাশ করে, সে বিনীতভাবে থানার মাধ্যমে সরকারের নিকট আশ্রয় ও নিরাপত্তা দাবি করে। থানা কর্তৃপক্ষও তাকে আশ্বস্ত করেন।

অতিক্রমণ

কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর, আমরা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আমাদেরই একজনের বৈঠকখানায় প্রতিদিন বসার মত এক সান্ধ্য আড্ডার ব্যবস্থা করি। আড্ডার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এখানে যোগদানকারী প্রত্যেককে প্রতিমাসে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গল্প বা কবিতা বা প্রবন্ধ লিখে এনে পাঠ করে আমাদের শোনাতে হবে। এসব লেখা নিয়ে আড্ডায় গঠনমূলক আলোচনা হবে এবং পরবর্তী মাসে লেখাগুলোকে একত্রিত করে ছাপিয়ে সাময়িক পত্রিকা রূপে প্রকাশ করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, যুক্তিবাদী বা সঠিক চিন্তাশীল প্রতিটি শিক্ষিত লোকই জীবনীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন।

আড্ডার বিশেষত্ব অনুযায়ী রাজেনবাবু সেদিন তার জীবনের এক কাহিনি লিখে এনে আমাদের শোনান। শুনাতে গিয়ে তিনি পড়েন —"বহু বছর আগে আই.এ. পাস করার পর, প্রয়োজনের বিশেষ তাগিদে আমি একটি চাকরি যোগাড় করতে খুব তৎপর হয়ে উঠি। ফলে আমার যোগ্যতায় পাবার মত কোন চাকরির বিজ্ঞাপন দেখা মাত্রই আমি দরখাস্ত করতে আরম্ভ করি। বিভিন্ন অফিসে ইন্টারভিউও দিতে থাকি। কোন ইন্টারভিউই নিরাশ হবার মত বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু চাকরি পাবার ক্ষেত্রে আমার আশা দীর্ঘদিন ধরে অপূর্ণই থেকে

যায়। তাতে এক সময় আমি কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ি। এরকম অবস্থায় একদিন আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, মা-বাবা ও ভাই-বোনদের সাথে কয়েকটি দিন আনন্দে কাটাতে আমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত আমাদের দেশের বাড়িতে যাব। যাবার আগে শিক্ষা ও আরক্ষা দপ্তরে চাকরি প্রার্থী হয়ে আবার দু'টি দরখাস্ত করি।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমার পাসপোর্ট ভিসা না থাকায়, আমি একদিন কিছু বেশি অর্থ খরচ করে অন্য অনেকের মত ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম-পাহাড়ের ঘুরপথে বাড়ি পৌঁছে যাই। সেখানে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে থাকি।

একদিন আমি যখন আমাদের পুরানপুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত, তখন আগরতলা থেকে আমার বন্ধু চুনীবাবুর করা একটি টেলিগ্রাম অনেকদিন সময় নিয়ে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে। চুনীবাবু টেলিগ্রামে আমাকে লিখেন — 'Come and appear before interview board on tenth and twelfth instant ' আমি টেলিগ্রামটি পাই তখনকার চলতি মাসের নয় তারিখ, দুপুর বারটা নাগাদ। পরদিন যথাসময়ে ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকতে হলে, আমার তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নয় মাইল দূরত্বের আমাদের রেল স্টেশনের রাস্তা আমাকে হেঁটে অতিক্রম করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়, বিকেল তিনটার গাড়ি ধরে আমার গন্তব্যস্থল আগরতলার দিকে অগ্রসর হতে হবে। তাই মাছ ধরা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি একটু খেয়ে নিয়ে মার মুখে অনবরত দুর্গা নাম জপ করা শুনতে শুনতে আমি সেদিনকার মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে স্টেশনের পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে, উদ্বিগ্ন মনে ছুটতে থাকি। কিছুটা পথ চলার পর, হাওয়া সহ বেশ ভালরকমের বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়। মাথার উপর ছাতা ধরে যতটুকু পারি নিজেকে সামলে নিয়ে টিক্কাপুর হাওড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে এগোতে থাকি। ঝড়-বৃষ্টির কবল থেকে নিজেকে বেশিক্ষণ মুক্ত রাখতে পারিনি, এক সময় বৃষ্টির জল আমার সবকিছু ভিজিয়ে আমাকে স্নান করিয়ে ফেলে। তাসত্ত্বেও আশা রূপ চালনা শক্তিতে অতি শক্তিমান হয়ে উঠে আমি প্রায় জনশূন্য রাস্তা ধরে দ্রুত রেলস্টেশনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকি। এভাবে চলতে চলতে আমি যখন আমার স্টেশন থেকে দু'শ মিটারের মত দূরে, তখন সামান্য দূরত্বের পূর্ববর্তী স্টেশন, সাজিরবাজার থেকে গাড়ির হর্ন বাজানো শুনতে পাই। তাতে গাড়ি ধরার ব্যাপারে আমার উদ্বেগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। ফলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমি স্টেশনের দিকে দৌড়াতে থাকি।কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনে পৌঁছে, আখাউড়া স্টেশন পর্যন্ত টিকিট কেটে গাড়ি ধরতে প্রস্তুত হয়ে আমি প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াই। পরক্ষণেই গাড়ি এসে পৌঁছলে, আমি তাতে লাফিয়ে ওঠার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। ঘন্টাখানেক চলার পর, চারটা নাগাদ গাড়ি আখাউড়া স্টেশনে পৌঁছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে, পূবদিকে অবস্থিত আগরতলা শহরের দিকে পূর্ব পরিচিত রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে থাকি। কিছুটা এগিয়ে আখাউড়া পুলিশ ফাঁড়ি অতিক্রম

করার পর, আমি আগরতলা চেকপোষ্ট পর্যন্ত পাকারাস্তার সমান্তরাল গ্রামের কাঁচারাস্তা ধরে হাঁটতে থাকি। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে থাকে, আবার বৃষ্টি পড়তেও আরম্ভ করে। তাতে মনের আশঙ্কা ও উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ চলার পর, আমার সামনে একটা থলে হাতে প্রৌঢ় একজনকে আমার রাস্তা ধরেই এগিয়ে যেতে দেখতে পাই। আমি আমার হাঁটার গতি বাড়িয়ে লোকটির কাছে যাই, তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "কাকু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

ভদ্রলোক বলেন, "আমি বর্ডারে, আমার বাড়ি যাচ্ছি। তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ?" উত্তরে তাঁকে আমার উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পড়া এবং গন্তব্যস্থল সম্পর্কে সবকিছু খোলাখুলিভাবে বলি। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তান্বিত ও নির্বাক হয়ে থাকেন। পরে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেন, "তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমাকে আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনের জন্য খনন করা কালাপাইন্যা খালের ওপাড়ে ইন্ডিয়া যাবার পথ দেখিয়ে দেব। খালের এপাড়ে আমার বাড়ি। তবে আমার সাথে চলছ বলে প্রয়োজনে তোমাকে কিছুটা অভিনয় করতে হতে পারে। সামনে ফকিরামুড়ায় ই.পি. আর-এর ক্যাম্প। ক্যাম্প এর সিপাইরা কোন কোন সময় গ্রামের এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঘটনাচক্রে আমরা যদি ই.পি.আর বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পড়ি এবং ওরা যদি তোমার সম্পর্কে জানতে চায়, তবে তুমি বলবে যে, আমি, করিম মিয়া তোমার মামা, তুমি মুকুন্দপুর থেকে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছ।"

আমি আশ্বস্ত হয়ে করিম মিয়ার কথায় সায় দেই, তাঁব পেছনে পেছনে চলতে থাকি। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যায়, আমরা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও আবছা অন্ধকারের মধ্যে নির্বিঘ্নে করিম মিয়ার বাড়ি পৌঁছি।

করিম মিয়া আমাকে তাঁর বাড়ির ঠিক পেছনেই প্রশস্ত কালাপাইন্যা খালপাড়ে নিয়ে যান। সেখানে বড়সড় এক বাঁশঝাড় ও কয়েকটি ঝোপঝাড় দেখতে পাই, আর শুনতে পাই বাতাসে দোলায়মান ঝাড়ের বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণে সৃষ্ট ক্যাঁচর ম্যাচর শব্দ।

খালের একটি বিশেষ অংশ দেখিয়ে করিম মিয়া বলেন, "এ জায়গাটায় পানি অপেক্ষাকৃত কম, তবে পাঁক বেশি। অন্ধকার একটু ঘন হয়ে এলে তোমাকে গামছা পরে খালটা পার হতে হবে। খালে পলিমাটি জমে থাকার ফলে তা অতিক্রম করতে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে। সময়ও একটু বেশি লাগবে। এসব সহ্য করে খালটা অতিক্রম করে ওপাড়ে উঠলেই তুমি হিন্দুস্থানে পৌঁছে যাবে। খালপাড় থেকে বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে গেলে কালিকাপুর গ্রামের বাড়িঘর ও রাস্তার আলো তোমার নজবে পড়বে। রাস্তার আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে সোজা আরেকটু এগোলেই কালিকাপুর গ্রামের খেলার মাঠ এবং নিরিবিলি জায়গায় অবস্থিত পুকুর সহ স্কুলবাড়ি পেয়ে যাবে। স্কুলের পুকুরে হাত-পা ও মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে, রাস্তায় উঠে রিক্সা বা অটোতে চেপে শহরে তোমার গন্তব্যস্থলে যেতে কোন

অসুবিধা হবে না। জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কোন কোন ব্যাপারে নিরুপায় হয়ে, আমরাও এ রাস্তা ধরেই একটু দেখে শুনে আগরতলা শহরে যাতায়াত করতে বাধ্য হই। কালিকাপুরের মানুষ ভাল, ওরা কোন কোন সময় আমাদের দেখতে পেলেও, কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর, আমাদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করে না। তবে এখানে একটা কথা তোমাকে বলে রাখা ভাল যে, মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানকার পুলিশ ও বি.এস.এফ এবং আমাদের এখানকার ই.পি.আর. বাহিনী বর্ডার পাহারা দিতে বের হয়। আজ অবশ্য বাদলা দিন, এদিনে এসব বাহিনী ক্যাম্প থেকে বেরুবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই, তুমি বাবা সতর্ক থেকেই রাস্তাটা অতিক্রম করো।"

অন্ধকার কিছুটা ঘনীভূত হওয়ার অপেক্ষায় সময় কাটাতে করিম মিয়া আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকেন। এক মহিলাকে আমাদের চা-পান খাওয়াতেও বলেন। তিনি নিজে তামাক সেজে এনে এসে আমার পাশে বসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা-পান এসে যায়। আমরা চা পান তামাক খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠি। ইতিমধ্যে অন্ধকাব ঘন হয়ে উঠতে আরম্ভ করে, বৃষ্টিও পুরোপুরি থেমে যায়। এসময়টাকে আমার ওপাড়ে পাড়ি দেবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে করিম মিয়া আমাকে আবার নীরব বাঁশ ঝাড়ের নিচে নিয়ে যান এবং খালটা অতিক্রম করতে বলেন। আমিও মোটেই সময় নষ্ট না করে ব্যাঙ, ঝিঁঝি পোকা, আর শেয়ালের ডাক শুনতে শুনতে কালাপাইন্যায় নেমে পড়ি। কিন্তু খালে পাঁক এতই বেশি যে, পা টেনে তুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় একসময় আমি আমার ছাতা ও কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিকে জোরে ঢিল মেরে মেরে খালের ওপাড়ে, ভারতে আমার আগেই পৌঁছে দেই। এরপর খালের জলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, কায়ক্লেশে সাঁতার কেটে তা অতিক্রম করতে আমি চেষ্টা করতে থাকি। তাতে আবার আর এক বিপত্তি দেখা দেয়, জলে সাঁতার কাটার শব্দ সৃষ্টি হতে থাকে। শব্দটি মনের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা জাগিয়ে তুলে।. পরক্ষণেই আশঙ্কাটা আর আশঙ্কার স্তরে থাকেনি, মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়। খালের ওপাড় থেকে দুই টর্চের ঝাঁজালো আলো এসে আমার উপর পড়ে। আলো নিক্ষেপকারীরা তীব্র ধমকের সুরে বলতে থাকেন, "এই, একদম এগোবে না! তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। আমাদের কথা অমান্য করলে তোমাকে গুলি করব।"

ধমক শুনে আমার মনে হল, আমি পুলিশ বা বি.এস.এফ.এর নাগালে পড়ে গেছি। তাই কোন রকমে দাঁড়িয়ে দু'হাত উপরে তুলে এক আত্মসমর্পণকারীর মত বলি, "আমি ভীষণ বিপদগ্রস্ত হয়ে জেনেশুনেই অবৈধ পথে আমার দেশে ফিরে যেতে চাইছি। দয়া করে আমাকে কাছে গিয়ে আপনাদের কাছে দু'টি কথা বলার সুযোগ দিন। কোন্ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়ে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের দিকে পা বাড়িয়েছি জানতে পারলে, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আমার বিশ্বাস।"

আমার কথা শোনার মিনিট খানেক পর ওপাড় থেকে আলো নিক্ষেপকারীদের একজন বলেন, "ঠিক আছে, উঠে এস। তবে একথাটা ভালভাবে মনে রেখে এস যে, কোনরকম কুচক্রী বলে সাব্যস্ত হলে তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

ওপাড় থেকে আশাব্যঞ্জক কথা শুনে আমার মন থেকে ভয়-ভীতি অনেকটা দূর হয়ে যায়।মনে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে, আমি আবার সাঁতার কেটে কোনরকমে ওপাড়ে গিয়ে উঠি। আমাকে ওপাড়ে যাবার অনুমতি প্রদানকারীদের বিরাট আকারের চার্জ লাইটের আলোতে আমি আমার সামনে রাইফেলধারী ত্রিপুরা পুলিশের এক হাবিলদার এবং পাঁচ বি.এস.এফ. জোওয়ানকে দেখতে পাই। ওঁরা আমার নামধাম জানার শেষে বিপজ্জনক অবৈধ পথে আমার ভারতে আসার কারণ জানতে চান।

আমি ওঁদের বলি, "আমার মা-বাবা, ছোট ভাই-বোনরা এখনো পাকিস্তানে। আমার পাসপোর্ট ভিসা না থাকা সত্ত্বেও, গুরুতর অসুস্থ মাকে দেখতে আমি, আইন মাফিক দীর্ঘদিনের ভারতীয় নাগরিক, এরকম অবৈধ পথেই পাকিস্তানে না গিয়ে থাকতে পারিনি। যাবার আগে সাব ইনস্পেক্টর অফ পুলিশ-এ চাকরি প্রার্থী হয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ পাকিস্তানের গ্রামের বাড়িতে, আগরতলা থেকে অনেকদিন আগে করা এক বন্ধুর টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পারি, আমি চাকরিটি পেয়ে গেছি এবং আগামীকালই চাকরিতে যোগদান করার শেষ তারিখ। বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারি জেনেও, সময়সীমার মধ্যে চাকরিতে যোগদান করার উদ্দেশ্যে আজই আগরতলা পৌঁছার অন্য আর কোন উপায় দেখতে না পেয়ে, আমি সংক্ষিপ্ত এ পথটাকেই বেছে নিয়ে ফিরতে বাধ্য হই।"

হাবিলদার বলেন, "আমি সন্দিহান যে, তুমি সরাসরি সাব ইনস্পেক্টর পদে চাকরি পেয়ে যেতে পার। সোজাসুজি এপদে ঢুকতে হলে, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে একজনকে তো অবশ্যই গ্র্যাজুয়েটও হতে হয়। তুমি তো নেহাতই ছেলে মানুষ, এত কম বয়সেই কি তুমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছ?"

রক্ষীদের কবল থেকে মুক্ত হতে আমি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমার বাংলা ভাষার সাথে কিছু ইংরেজী ভাষা মিশিয়ে হাবিলদারকে বলি, "বর্তমানে আমার বয়স কুড়ি বছর, কয়েক মাস। এ বয়সে অন্যদের মত আমারও এ বছর বি.এ. পাস করতে কোন রকম অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া Senior Division N.C.C -র C certificate পরীক্ষাও আমি পাস করেছি। আমার মনে হয় আপনিও জানেন যে, N.C.C-র 'C' Certificate এবং কোন একটি Branch এ Degree পাস করলে এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকলে, একজন Sub Inspector of Police, এমন কি আমাদের দেশের Army তেও Second Lieutenant Post এ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরি পেয়ে যেতে পারে। Besides, I did very well in the written test held for the purpose of recruitment to the post of Sub Inspector

of police. Over and above, আমার Viva voce ও খুব ভাল হয়েছিল।"

আমার কথা শুনে রক্ষীরা নিজেদের মধ্যে নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করেন। একসময় সবাইকে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে হাবিলদার অন্যান্যদের সাথে আস্তে আস্তে কথা বলেন। আস্তে বললেও অল্প দূরত্বে থেকে আমি তাঁদের সব কথাই শুনতে পাই। তিনি বলেন, "ছেলেটার বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী বলার ধরন দেখে মনে হয়, সে লেখাপড়া ভালই জানে, বি.এ. পাস করা হতেও পারে। অবশ্য পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে এখন নিঃসন্দেহ হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একথা আমি জানি যে, N.C.C তে থ্রি নট থ্রি রাইফেল সুটিং করা শেখানো হয়। আমরা যদি সতর্ক থেকে ছেলেটাকে আমাদের সাথের এরকম একটি রাইফেল Loading ও Unloading করে দেখাতে বলি, তবে 'C' Certificate পাস করা সম্পর্কে তার বক্তব্য কিছুটা যাচাই করতে পারব। তাছাড়া, তার পুঁটুলিটাও পরীক্ষা করে দেখব তাতে আপত্তিকর কিছু আছে কি না। সে যদি আমাদের করা এসব পরীক্ষা উতরাতে পারে, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, অবশ্য আমরা সবাই একমত হলে।"

এসব কথা শুনে অন্যান্য রক্ষীরা সাগ্রহে হাবিলদারের বক্তব্য সমর্থন করেন। হাবিলদার তাঁর সাথিদের নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসেন, তাঁরা কর্তব্য বোধে আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। আমি N.C.C র 'B' Certificate Course এর আমার দু'বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং পুঁটুলি খুলে দেখিয়ে রক্ষীদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হই। ফলস্বরূপ রক্ষীরা দয়া করে আমাকে কালিকাপুর স্কুলের রাস্তা দেখিয়ে ছেড়ে দেন। আমি আবার শ্রান্ত দেহ মনে এগিয়ে চলতে আরম্ভ করি, আর হিতোপদেশ "সদা সত্য কথা বলিবে" নিয়ে ভাবতে থাকি।'

হয়রানি

প্রায় পনের বছর আগে, একদিন আমাদের ছুটি ভোগ করা সংক্রান্ত ব্যাপারে এক ঘটনা ঘটে। সে ঘটনার সাথে ইদানিংকালে লব্ধ একটি অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য থাকায়, এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, শিক্ষক আকাশ রায়ের কথা আমার আবার মনে পড়ে যায়।

অতীতের ঘটনাটি যেদিন ঘটে, সেদিন দ্বিতীয় ঘণ্টায় ক্লাস না থাকায়, আকাশবাবু সহ আমরা কয়েকজন স্টাফ রুমে বসে বিভিন্ন ভাবে সময় কাটাতে থাকি। এমন সময় আমাদের আর এক সহকর্মী দীপক সাহা এসে আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি আকাশবাবুর পাশে

বসেন এবং তাঁকে বলতে থাকেন, ''দাদা, আমি বড় এক সমস্যায় পড়ে গেছি। সম্ভবত আপনিও জানেন, মারাত্মক ভাবে অসুস্থ আমার বাবার চিকিৎসা করাতে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। যাবার আগে, দীর্ঘদিন ছুটি ভোগ করার ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী, আমি সুস্থ শরীরেও মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করে যাই। একই সাথে স্টেশন লিভ করার অনুমতিও চাই। পঁচিশ মার্চ, ছুটি আরম্ভ হওয়ার দিন আমি বাবাকে নিয়ে কলকাতা পৌঁছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ায় বাবার পক্ষে চিকিৎসা গ্রহণ করা আর সম্ভব নয় বলে, গতকাল, চার এপ্রিল সকালের প্লেনে আমাদের আগরতলায় ফিরে আসতে হয়। বিকেল বেলা আমাদের গৃহ চিকিৎসকের কাছ থেকে আমার মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আজ, পাঁচ এপ্রিল সার্টিফিকেটটি স্কুল অফিসে জমা দিয়ে আমি কাজে যোগদান করি।

প্রথম ঘন্টায় ক্লাস করে এসে আমি বড়বাবুর কাছে আমার গত মাসের বেতন চাই। বড়বাবু আমার জয়েনিং রিপোর্ট এর সাথে যুক্ত মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটি দেখে বলেন, ''আগরতলার ডাক্তারের কাছ থেকে নেওয়া সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আপনার ছুটি মঞ্জুর ও জয়েনিং রিপোর্ট গ্রহণ করা যাবে না। ফলে সবকিছু নিয়মিত করে আপনাকে এখন বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি যেহেতু ষ্টেশন লিভ করে কলকাতা গিয়েছিলেন, সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে কলকাতার ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে আমাদের কাছে জমা দিতে হবে, তবেই আপনাকে বেতন দেওয়া সম্ভব হবে। কথাগুলো বলে বড়বাবু আমার দাখিল করা সার্টিফিকেটটি আমাকে ফেরত দিয়ে দেন।

টাকার ভীষণ দরকার থাকায়, আমি বড়বাবুর কাছে গত মাসের চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আমার কাজের দিনগুলোর বেতন দাবি করি।

তখন. বড়বাবু বলেন, কাবো নামেই কোন মাসের অংশ বিশেষের বেতনের বিল করার নিয়ম আমাদের নেই, এ কারণে আপনার গত মাসের কাজেব দিনগুলোব বেতনেব বিল করা হয়নি। আমাদের একজন সহকর্মী হিসেবে এ নিয়মটা আপনার জানা থাকা উচিত ছিল। আমাদেব মধ্যে কেউ কোন সময় বেশি দিনের ছুটিতে গেলে এবং ছুটি ভোগ কবে গ্রহণযোগ্য মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা দিয়ে কাজে যোগদান কবলে, আমবা ছুটি মঞ্জুব ও জয়েনিং বিপোর্ট গ্রহণ কবে নিয়ে তাঁকে ছুটি এবং কাজের দিন মিলিয়ে পুরো মাস হিসেবে বেতন দিয়ে থাকি। একবার কাজের দিনের এবং আর একবাব ছুটিব দিনের বেতন হিসেবে দেই না। এ অবস্থায় আপনার চাহিদা মত আমরা কি করে বেতন দিতে পারি? নিযম মেনে আপনি কোনও উপায়ে তাড়াতাড়ি কলকাতার ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনে জমা দিন। দেরি করলে, গত মাসের মত পরবর্তী সময়ের বেতন পেতেও আপনার অসুবিধে হবে।''

আমাদের অর্থ সঙ্কটের কথা বর্ণনা করে আমাকে বেতন দিতে আমি প্রধানশিক্ষক

মহাশয়কেও বিশেষভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি, তিনিও বড়বাবুর মত কথা বলে আমাকে বিদায় করে দেন। আপনি যদি টেলিফোনে কলকাতাবাসী আপনার ডাক্তার ছেলেকে আমার নামে স্পীডপোষ্টে একটি মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট পাঠাতে বলেন, তবে আমি খুবই উপকৃত হব।

আকাশবাবু দীপকবাবুর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তাঁকে তিনি আশ্বস্ত করে ও পাশে বসিয়ে আমাদের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী গৌরাঙ্গকে বলেন, "আমাকে দুই তা সাদা কাগজ ও একটি কার্বন এনে দাও।"

তা শুনে দীপকবাবু বলেন, "দাদা, লেখালেখি করতে গেলে আমার ব্যাপারটার ফয়সালা হতে দেরি হয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে টেলিফোনেই বলুন, তাতে আমি তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট পেয়ে আমার সমস্যার সমাধান করে নিতে পারব।"

উত্তরে আকাশবাবু বলেন, "সব কিছুই তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন বলে আমি আশাবাদী, এমন কি আজই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যাবার আগেও পেয়ে যেতে পারেন।"

আকাশবাবুর কথার যথার্থ অর্থ বুঝতে না পেরে দীপকবাবু চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসে থাকেন।

ইতিমধ্যে গৌরাঙ্গ কাগজ ও কার্বন এনে দেয়। আকাশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে দীপকবাবুর নামে একটি দরখাস্ত লিখেন। দরখাস্তটি এখানে তুলে ধরছি —

মাননীয় প্রধানশিক্ষক মহোদয়, ...

..

মহাশয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বিগত পঁচিশ মার্চ থেকে এগার দিন ছুটি ভোগ করার পর আজ, পাঁচ এপ্রিল নিয়ম মাফিক কাজে যোগদান করি। আমার শিশুর খাদ্য ও মুমূর্ষু বাবার ওষুধপত্র কিনতে এবং পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য আমি আমার গত মাসের বেতন দিতে আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। কিন্তু আপনি ও বড়বাবু বেতন দিতে অস্বীকার করেন এই বলে যে, নিয়ম অনুযায়ী আমাকে কলকাতার ডাক্তারের কাছ থেকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এনে জমা দিতে হবে, আমার দাখিল করা এখানকার ডাক্তারের সার্টিফিকেটের মূলে আমাকে বেতন দেওয়া যাবে না।

আমি চিন্তা করে বুঝে উঠতে পারছি না, এমন কি নিয়ম থাকতে পারে, যে নিয়মে কলকাতার ডাক্তার ছাড়া, আগরতলায় চিকিৎসায়রত এম.ডি. ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সার্টিফিকেটকেও আমার ছুটি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা যায় না। আপনি

যদি অনুগ্রহ করে আমার ছুটি মঞ্জুর করা ও কাজের দিনের বেতন দেওয়ার বাধা স্বরূপ আপনাদের বলা নিয়মের লিখিত রূপের একটি বা একাধিক অনুলিপি আমাকে প্রদান করেন, তবে নিয়মটির ব্যাপারে আমি আমার অজ্ঞতা দূর করে নিয়ে নিজেকে কিছুটা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি। অনুলিপি প্রদানের ব্যয় আমি নিজে বহন করব। আপনাকে আমার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করে জানাই যে, আমার গত মাসের বেতন পেতে দেরি হওয়ায় আমরা নানা রকম সমস্যায় ভুগছি, এ ব্যাপারে আরো দেরি হলে আমাদের পরিবারে যে কোন দিন যে কোন বড় ধরনের বিপদ দেখা দিতে পারে।

আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে আমার দাখিল করা এবং আপনাদের ফেরত দিয়ে দেওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সম্পর্কে বলি যে, আমি চব্বিশ মার্চ অসুস্থ হয়ে আগরতলার ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার আমাকে দেখে এক মাসের ওষুধ লিখে দেন। ডাক্তারের নির্দেশ মত আমি পুরো ওষুধ কিনে সেদিন থেকেই খেতে আরম্ভ করি। কলকাতা যাবার সময় ওষুধগুলো আমার সাথে করে নিয়ে যাই, সেখানে নিয়মিত তা খেতেও থাকি, ফল স্বরূপ কয়েকদিনেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। আগরতলায় ফিরে আমি আবার ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তারবাবু আমাকে পরীক্ষা করে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজকর্মের উপযুক্ত বলে লিখে দেন।

আমি মনে করি, আমার অসুস্থতার চিকিৎসা আরম্ভ করার সময় থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি আগরতলার ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাধীনই ছিলাম, কলকাতার নয়। এ পরিস্থিতিতে কলকাতার ডাক্তারেব কাছ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাটা কি মিথ্যা বা নিয়ম-নীতি বহির্ভূত কাজ হয়ে যাবে না? আমার ধারণা, আগরতলার ডাক্তারবাবুর সার্টিফিকেট স্বীকার করে নিয়ে, আমার ছুটি মঞ্জুর করা এবং অবিলম্বে বেতন দেওয়া যেতে পারে। এ কারণে আগে দাখিল করা আমার সার্টিফিকেটটিই এতদসঙ্গে আবার দাখিল করলাম। নমস্কারান্তে ইতি --

আপনার বিশ্বস্ত,
দীপক চন্দ্র সাহা, শিক্ষক

তারিখ, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং

দরখাস্ত লেখার শেষে আকাশবাবু তা দীপকবাবুর হাতে দেন এবং তাঁকে বলেন, "নিজের কাছে অনুলিপি রাখার উদ্দেশ্যে আপনি এবার একতা কাগজের মাঝখানে কার্বন বসিয়ে দরখাস্তটি পরিষ্কার করে লিখুন এবং মূল দরখাস্তটি স্কুল অফিসে জমা দিয়ে দিন। দরখাস্ত জমা দিয়ে চলে আসবেন না। এখনই আবার বেতন দাবি করে আপনি অফিসে ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে বেতন দেওয়া হয়। আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও চিন্তা ভাবনা করছি। কাজেই নিজেকে একা মনে করে মোটেই

ঘাবড়াবেন না।"

আকাশবাবুর কথামত দীপকবাবু সব কিছুই করেন। বড়বাবু আকাশবাবুর জমা দেওয়া দরখাস্তের সাথে আগে একবার দাখিল করা মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটি দেখতে পান। তাতে তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠেন। তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে দরখাস্তটি তিনি অশোভন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং দীপকবাবুকে বলেন, "আপনাকে তো বলেই দিলাম, আপনার এ সার্টিফিকেট দিয়ে ছুটি মঞ্জুর করে বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কি আমাদের বলা কথার কিছু বুঝতে পারেননি? যান, এখন কাজের সময় আর বিরক্ত করবেন না!"

দীপকবাবু বলেন, "আমার অবস্থার সবকিছু জেনে, আকাশদা আমাকে দরখাস্তটি লিখে দেন এবং বলেন, আমার এ সার্টিফিকেটের ভিত্তিতেই আমার ছুটি মঞ্জুর করা ও বেতন দেওয়া সম্ভব, তা অসম্ভব করে তোলা অসঙ্গত।"

দীপকবাবুর কথা শুনে বড়বাবু দরখাস্তটি আবার হাতে নেন এবং তা মনোযোগ দিয়ে পড়েন। পড়ার শেষে তিনি একটু সময় চুপচাপ বসে থেকে কোন কিছু ভেবে নেন। একসময় দীপকবাবুকে বসতে বলে তিনি দরখাস্তটি নিয়ে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের কাছে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি দীপকবাবুকে বলেন, "আপনার পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে, অন্য ফান্ড-এর টাকা থেকে আপনাকে আমরা গত পুরো মাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি। আপনি রসিদ লিখে দিন।"

দীপকবাবু রসিদ লিখে দেন, পরক্ষণে বেতনও পেয়ে যান। এ ঘটনার পর থেকে ছুটির মাসের বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের আর কাউকেই অহেতুক হয়রাণির সম্মুখীন হতে হয় না।

মাখনদার পিতৃদায়

রোববারের দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ও দিবানিদ্রা সেরে ইজিচেয়ারে বসে আছি, চা খাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে। এমন সময় দীর্ঘদিন পর হঠাৎ করে মাখনদা এক অস্বাভাবিক চেহারায় আমাদের বাড়ি আসেন। তাঁর মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল এলোমেলো, খালি পা, হাতে কুশাসন ও একটি ব্যাগ। আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই, বসতে বলি। তিনি চেয়ারের উপর হাতের কুশাসনটি পেতে বসেন, আর বলেন, "বাবা আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে, সংসারের মায়া-মোহ ত্যাগ করে স্বর্গলোকে চলে গেছেন। আগামী শুক্রবার পিতৃদায় থেকে মুক্ত হতে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করছি।" এতটুকু বলে

মাখনদা তাঁর হাতব্যাগটি খুলে আমার হাতে একটি নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে বলেন, "বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করে, তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি লাভের কামনায়, আমার বিশেষ প্রয়াসটিকে অনুগ্রহ করে সফল করবেন। এ ব্যাপারটা অবশ্যই মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই ভুলে যাবেন না যেন। আমার শুভানুধ্যায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় সিংহদা ও গুপ্তদা, ডাইরেক্টর মহোদয় সহ আমাদের অফিসের সবাই এবং আরো অনেকে বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করবেন বলে আমাকে কথা দিয়েছেন।"

মাখনদার কথা শেষ হলে, আমি তাঁকে সমবেদনা জানিয়ে বলি, "এতদিন পরেও আমাকে মনে রেখে আপনি নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, আর আমি যাব না, তাকি হয়? আমি নিশ্চয়ই আপনার আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করব, যদি আকস্মিক ভাবে তেমন কোন কিছু না ঘটে।"

মাখনদার সাথে আমার পরিচয় হয় বছর দশেক আগে, যখন উনিশ বছর বয়সে সরকারি অফিসে জীবনে প্রথম চাকবি করতে আরম্ভ করি। মাখনদা তখন আমাদের অফিসের একাউন্ট্যান্ট। চাকরিতে যোগদান করার পর আমাকে একাউন্টস সেকশনে কাজ করতে দেওয়া হয়। ফলে অফিসের কাজকর্মে আমাকে ঘনঘন মাখনদার সংস্পর্শে যেতে হত। আরেকটা ব্যাপার, মাখনদার বাড়ি পূর্ব শহরতলির শ্রীপুরে। তিনি তাঁর বাড়ি থেকে সাইকেলে চড়ে শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আমাদের বাড়ির সামনা দিয়ে অফিসে যাতায়াত করতেন। এ কারণে হাতে সময় থাকলে, তিনি আমাকে ডেকে কোন কোন দিন তাঁর সাথে অফিসে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে আমরা একসাথে একই রাস্তা ধরে অফিস থেকে বাড়িতেও ফিরতাম। বাড়ি ফেরার পথে, তাঁর ইচ্ছে হলে মাখনদা আমাদের ঘরে চাও খেয়ে যেতেন। এসব কারণে আমরা দু'জনের মধ্যে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে থাকে। অফিসের কোন কোন সহকর্মী আবার এরকমও বলতেন যে, মাখনদাও আমার মধ্যে নাকি চেহারাগত সাদৃশ্যও আছে।

অফিসের কাজে মাখনদা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। এ কারণে আমরা, বয়োকনিষ্ঠরা তাঁকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করে, তাঁর কাছ থেকে কাজ শিখে নিয়ে অফিসের কাজকর্ম ভালভাবে চালিয়ে যেতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমরা তাঁকে অনেক সময় অফিসে ধরে উঠতে পারতাম না। কারণ, শুধুমাত্র অফিসের মধ্যেই তাঁর ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ক্ষমতাবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত কোন কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও যুক্ত ছিলেন। ফলে তিনি অফিসে পুরো সময় দিতে পারতেন না। তাতে অবশ্য তাঁর কোনরকম অসুবিধে হত না।

মাখনদার নিমন্ত্রণে আমি আগেও বার কয়েক তাঁর বাড়ি গিয়েছি। আমার যাতায়াতের সময়, আমি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে নিয়েই তাঁকে সংসার করতে দেখতাম। তখন

মাখনদার বাড়িতে তাঁর মা-বাবা, ভাই-বোন বা অন্য কাউকেই কোনদিন দেখতে পাইনি। ফলে আমি ধরে নিয়েছিলাম, যাঁদের আমি দেখতে পেতাম, শুধুমাত্র তাদের নিয়েই তাঁর সংসার। কিন্তু তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মাখনদার সংসার সম্পর্কে আমার তখনকার ধারণাটা ভুল বলে বুঝতে পারি। তাই তাঁকে বলি, "কতবারই তো আমি আপনার বাড়ি গিয়েছি। কিন্তু একদিনও আপনার বাবাকে আমি দেখতে পাইনি। ব্যাপারটা এখন আমার কাছে বড় আক্ষেপের হয়ে দাঁড়িয়েছে।" আমার কথা শেষ হলে, তাঁকে আরো অনেক নিমন্ত্রণ চিঠি বিলি করতে হবে বলে মাখনদা চলে যেতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, আর যেতে যেতে আমাকে বলেন, "বাবা শ্রীপুরে থাকতেন না, থাকতেন কুমারঘাটে।"

অফিসে কাজ করে যাওয়ার সাথে সাথে চেষ্টা চরিত্র করে আমি যোগ্যতা আরেকটু বাড়িয়ে নেই এবং আরো ভাল চাকরি পেতে চেষ্টা করতে থাকি। সৌভাগ্যবশত মাখনদাদের সাথে পাঁচ বছরের মত কাজ করার পর প্রশাসনিক পদে চাকরি একটি পেয়েও যাই। নতুন চাকরিতে যোগদান করার কিছুদিন পরেই, আমার সমতুল্য পদাধিকারী একজন দীর্ঘদিনের ছুটিতে যাওয়ায়, তাঁর কর্মস্থল, কুমারঘাটে কাজ করতে আমাকে সাময়িকভাবে সদরের অফিস থেকে পাঠানো হয়। কুমারঘাটে আমার অফিস ও থাকার স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল কুর্তি রোড (আসাম আগরতলা রোড) এর প্রস্তুতকারক, গিল সাহেবের কাঠের পাটাতনের উপর তৈরি করা সুদৃশ্য বাংলো বাড়িতে। এ বাড়িটিতে থেকেই— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাধারণমানের একটি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে আমি আমার করণীয় কর্ম চালিয়ে যেতে আরম্ভ করি।

হোটেলে যেদিন আমি প্রথমবারের মত খেতে যাই সেদিন আমাকে দেখামাত্রই হোটেলের রোগামত বয়স্ক একজন দ্রুত এগিয়ে এসে, একান্ত আপনজনের মত স্নেহের দৃষ্টিতে, অনেকটা ভাবাবিষ্টের মত আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। পরক্ষণেই অবশ্য পরিষ্কার একটা টেবিলে পরিপাটি করে তিনি আমাকে খাবার পবিবেশন করেন। আমি খেতে আরম্ভ করলে, আমার খাওয়ার দিকে লক্ষ রেখে তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে এসে খাওয়ার ব্যাপারে আমার চাহিদা অনুযায়ী আমাকে খাবারও যোগিয়ে যান। একসময় আমি পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে উঠি এবং আমার আস্তানার দিকে পা বাড়াই। ফিরে আসার সময়ও লক্ষ্য করি, আমার খাবার পরিবেশকটি স্মিত মুখে, এক উদাসীর মত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আমার কাছে ব্যাপারটা তখন কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়।

হোটেলে আরো কর্মী থাকা সত্ত্বেও বয়স্ক লোকটি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে আমাকে প্রতিদিন দু'বেলা বিশেষ যত্নসহকারে খাওয়াতে থাকেন। খাওয়ানোর ব্যাপারে আমার প্রতি তাঁর যত্নশীলতা লক্ষ করে মনে হয়, আমাকে খাইয়ে তিনি এমন এক পরিতৃপ্তি লাভ করেন, যা স্নেহপ্রবণ মা-বাবা তাঁদের আদরের সন্তানকে খাইয়ে লাভ করে থাকেন।

সময়ের গতিতে বয়স্ক লোকটির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। একদিন জিজ্ঞেস

করে তাঁর নাম মাধব দেব জেনে, তাঁকে মাধবকাকা বলে ডাকতে আরম্ভ করি। তাতে তিনি বেশ খুশি হন।

তিন মাসের মত কাজ করার পর এক অফিস অর্ডার এই মর্মে জারি করা হয় যে, আমাকে অবিলম্বে বিধিবদ্ধভাবে কুমারঘাট ত্যাগ করে সদরের অফিসে যোগদান করতে হবে। কুমারঘাট ত্যাগ করার আগে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে একদিন খাওয়ার শেষে, মাধবকাকাকে হোটেলের এক নিভৃত কক্ষে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আপনি আমার প্রতি এত স্নেহ ও সহানুভূতিশীল কেন? আমাকে অতিমাত্রায় যত্ন করে আপনার খাওয়ানোর পেছনেই বা কারণ কি?" আমার প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে মাধবকাকা ভাবগম্ভীর হয়ে পড়েন, আস্তে আস্তে মাথা নুইয়ে চুপ করে বসে থাকেন। তা লক্ষ করে আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাই। আমি তো মন খারাপ করার মত এমন কিছু তাঁকে বলিনি! তবে স্নেহ-ভালবাসা সম্পর্কিত আমার প্রশ্নে তাঁর মন ও চেহারার এরূপ আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেল কেন! তাই অপ্রত্যাসিত ভাবে, হঠাৎ করে মাধবকাকার মানসিক পরিবর্তনে কিছুটা বিচলিত হয়ে তাকে আবার জিজ্ঞেস করি, "কাকু, কি ব্যাপার, আমার সাদা-মাটা প্রশ্ন শুনে আপনি এত ভাবলেশহীন হয়ে পড়লেন কেন? আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার কারণ জানতে চেয়ে, আমি যদি আপনার মনে কোন রকম ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার কাছে আমি আর কোনকিছু জানতে চাইব না।"

এবার আমার কথা শুনে মাধব কাকা সম্বিৎ ফিরে পান। মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন, "না, না, আপনার কোন কথায় কি আমি ব্যথা পেতে পারি! আপনি আমাকে আপনজনের মত বিবেচনা করে কাকা বলে ডাকেন, আমার মত অতি সাধারণ একজনের সাথে সম্মান দেখিয়ে অমায়িকভাবে কথা বলেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, আমাদের জীবনের এক অতি দুঃখজনক ঘটনা প্রকাশ করে বলতে হয় যে, দেখতে অনেকটা আপনার মত, আমাদের একদিনের সহজ-সরল, শিক্ষাদীক্ষা ও মানবিক গুণে সমৃদ্ধ প্রাণের ধন, সোনার টুকরো একমাত্র ছেলেটি, তার বিয়ের কিছুদিন পরেই হারিয়ে গেছে। এ কারণে অবুঝ মনে আপনার প্রতি বিশেষ একটা টান অনুভব করি। এর পেছনে অন্য আর কোন কারণ নেই। এখন আপনার প্রশ্ন শোনার সাথে সাথে আমার ছেলের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় এবং কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। ফলে যথাসময়ে আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিনি। এজন্য আমি দুঃখিত।"

আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি, "আপনার ছেলে কখন, কি করে হারিয়ে গেল?"

এবারের প্রশ্ন শুনে আমার মনে হল, মাধবকাকা কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়েন। তবে আগের মত দেরি না করে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, "এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে

আমি তীব্র মনোব্যথা ও লজ্জা বোধ করি। তাই আমি আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে সম্পর্কে কারো কাছে বিশদভাবে কিছু বলি না।"

কথাগুলো বলা শেষ করার প্রায় সাথে সাথেই, মাধব কাকার কাছে কাজ করার তাগিদ আসে, ফলে আমাকে ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। এ কারণে আমার পক্ষে তাঁর ছেলে সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি। প্রায় দু'বছর হল, মাধবকাকাকে কুমারঘাটে ছেড়ে এসেছি। কিন্তু এখনো তাঁকে ভুলতে পারি না, প্রায়ই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমি মাখনদার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করতে যাই। মাখনদা সমাদর করে আমাকে অতিথিপূর্ণ বড় একটি ঘরে নিয়ে যান। ঘরের একপাশে চেয়ারের উপর ফুল ও ফুলের মালায় প্রায় ঢেকে থাকা তাঁর বাবার ছবি দেখিয়ে বসতে বলেন। ভিড় এড়াতে, আমি দূরে দাঁড়িয়েই আংশিক দৃশ্যমান তাঁর বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে বসে থাকি। বসে থেকে ঘরের চার দেয়ালে করুণাসাগর বিদ্যাসাগর. মশায় থেকে আরম্ভ করে দেশবরেণ্য অনেক মনীষীর ভাল ভাল ছবি টাঙ্গানো অবস্থায় দেখতে পাই। ছবিগুলো দেখে, মনে মনে মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি মাখনদার অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধের তারিফ না করে থাকতে পারিনি। একসময় অন্য অনেকের সাথে আমাকেও পঙ্‌ক্তিভোজনে বসতে বলা হয়। আমরা বসে পড়ি এবং বেশ কিছুটা সময় নিয়ে অনেক রকমের খাবার খেয়ে উঠি।

খাওয়ার শেষে মাখনদার সাথে কথা বলতে, তাঁর খোঁজ করি। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, মাখনদা অতিথিদের সাথে তাঁর বাবার ছবি রাখার ঘরেই আছেন। আমি কথা বলতে সেখানে যাই এবং তাঁর সাথে কথা বলি। বাড়ি ফিরে আসার আগে, মাখনদার বাবার ছবিখানি পরিষ্কারভাবে দেখতে আমার ইচ্ছে হয়। আমি ছবির কাছে যাই। মাখনদাও আমার সাথে সাথে গিয়ে, যে সব ফুল ও মালা ছবিটিকে অনেকটা ঢেকে রেখেছিল, সেগুলোকে সরিয়ে দেন, আর বলতে থাকেন, "ফটোগ্রাফার বাবার ফটোখানি ভাল করে তুলতে পারেনি। মা আনাড়ি একজনকে দিয়ে কুমারঘাটে ছবিটি তুলিয়েছিলেন। আমি এরমধ্যেই ছবিটিকে কম্পিউটার মেশিনে সংশোধিত করিয়ে নিয়ে আসব।"

অতিরিক্ত ফুল ও মালা সরিয়ে দেওয়ার ফলে মাখনদার বাবার ছবিটি ভালভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। আমি ছবির দিকে তাকাই, তাকিয়ে ছবির মানুষটির চেহারা এবং ছবিতে লিখিত তাঁর নাম ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। তাতে আমি আঁতকে উঠি, স্তম্ভিত হয়ে যাই, অনেকটা আবেগাপ্লুতও হয়ে পড়ি। কারণ, সুস্পষ্ট ছবিটি সেই মাধক কাকার, যিনি একনাগাড়ে প্রায় তিন মাস নিজের হাতে পরিবেশন করে পরম যত্নে আমাকে কুমারঘাটে হোটেলের ভাত খাইয়েছিলেন। একথা ঠিকই যে, মাখনদার দেওয়া তাঁর বাবার

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ চিঠিতে মাধব কাকার নাম আমি আগেই পড়েছি, কিন্তু তখন ভাবতেও পারিনি যে, নিমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখিত মৃত ব্যক্তিটি 'সেবামূলক কাজে অনুরক্ত, নিবেদিত প্রাণ' মাখনদার পিতা হতে পারেন।

আত্মীয়

ইন্দ্রবাবু এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি আবার একটি দলের হয়ে রাজনীতিও করে থাকেন। এজন্য সম্প্রতি তাঁকে এক বিশেষ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। কারণ, দিন কয়েক আগে অর্থ ও বাহুবলে অধিকতর বলীয়ানদের দ্বারা সৃষ্ট ভয়ংকর এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে তাঁর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়ে যায়। তাতে এক দশক ধরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ইন্দ্রবাবুদের দলকে অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

নির্বাচনপর্ব শেষ হয়ে গেলেও তখনকার সময়ে সৃষ্ট উত্তেজনা মোটেই কমেনি। বরং তা দিন দিন বাড়তেই থাকে। বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এক সময় মারাত্মক রূপ ধারণ করে। নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা ক্ষমতাচ্যুতদের উপর জুলুমবাজি চালাতে আরম্ভ করে। জুলুমবাজিতে মারামারি, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারিত্বের চরম লাঞ্ছনা, এমনকি প্রাণহানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে শুরু করে। তাছাড়া, রাজ্যের বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে মারাত্মক অপরাধে অপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে রচিত আইনের ধারায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়েও ব্যতিব্যস্ত করা হতে থাকে। ফলে বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা তাঁদের জীবন ও সম্পত্তির কথা ভেবে মহা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন। ওঁদের কার ভাগ্যে কখন কিযে ঘটে যাবে, তা কেউই জানেন না। এরূপ আতঙ্কজনক অবস্থায় এঁদের বহুলোক প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। এমনকি নির্যাতনকারীদের নাগালের বাইরে থাকতে অনেকে ওপারে গিয়েও আশ্রয় নিয়েছেন।

এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে জানমান, সহায় সম্বলের নিরাপত্তার প্রশ্নে অন্য পাঁচ জনের মত ইন্দ্রবাবুও ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে দিন যাপন করছেন। উপরন্তু তিনি আর একটি দুঃশ্চিন্তায়ও ভুগছেন।

ওপারে ইন্দ্রবাবুর এক নিকট আত্মীয় তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। আত্মীয়টির সাথে ইন্দ্রবাবুর সম্পর্ক অতি আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ, এক কথায় খুবই মধুর। এতই মধুর যে আত্মীয়টি তাঁর মাকে সঙ্গী করে তাঁদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি, এমনকি একান্ত পারিবারিক ব্যাপাওে ইন্দ্রবাবুর সাথে কথা না বলে বা পরামর্শ না করে, একটা সময় পর্যন্ত, কোন ব্যবসায় বা

কাজে হাত দিতেন না। আত্মীয়টি আজ ধনসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভের পর, দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ পেতেও ইন্দ্রবাবুর আত্মীয়টি খুব যত্নবান হয়ে ওঠেন। তাই তাঁর ছেলেরা বড় হয়ে উঠতে আরম্ভ করলে, তাঁদের অধিকতর কল্যাণের কথা মাথায় রেখে, তিনি তাঁর বড় ছেলে, দীপুকে ইন্দ্রবাবুদের অঞ্চলে রেখে পড়াশোনা করাতে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এ ব্যাপারটা নিয়েও তিনি ইন্দ্রবাবুদের রাজ্যের নির্বাচনের বছরখানেক আগে, ইন্দ্রবাবুর সাথে কথা বলেন। ইন্দ্রবাবু অনায়াসে আত্মীয়টির ছেলেকে তাঁর কাছে রেখে পড়াতে রাজি হন। তাতে আত্মীয় ভদ্রলোক খুব খুশি হন।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইন্দ্রবাবুদের রাজ্যের নির্বাচন পর্ব শেষ করবেন বলে নির্বাচন কমিশন আভাস দেন। একই মাসের গোড়া থেকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি হওয়াও শুরু হয়ে যাবে। এসব খবর জেনে আত্মীয়টি ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে তাঁর ছেলেকে ইন্দ্রবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন।

নির্বাচনের সময় 'বুথ ক নভেনর' হিসেবে ইন্দ্রবাবুকে তাঁর দলের পক্ষে অনেক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। একারণে এ সময়টায় তিনি ভীষণ কর্মব্যস্ত থাকেন। তাঁর অতি ব্যস্ততার মধ্যেও ফাঁক বুঝে ইন্দ্রবাবু দীপুকে স্কুলে ভর্তি করাতে চেষ্টা করতে থাকেন। অনেক চেষ্টার পর, নানারকম প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি একদিন নির্দিষ্ট সময়ের প্রথমদিকেই ছেলেটিকে মফঃস্বলের একটি স্কুলে ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি করাতে সক্ষম হন। তখন অন্য অনেকের মত ইন্দ্রবাবুও আশাবাদী ছিলেন যে, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে সত্যিকারের অর্থে জনকল্যাণে কাজ করতে অভ্যস্ত তাঁদের দলই অল্প কিছুদিন পর নতুন করে আবার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। তখন তিনি ধীরস্থিরভাবে স্কুলবদলের নিয়মে দীপুকে তাঁর বাড়ির কাছে, শহরের কোন একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাবেন। এরকম চিন্তা করে ছেলেটিকে তিনি কিছুদিন বাড়িতেই পড়াশোনা করতে বলেন।

চরম সন্ত্রাস ও অনিয়মের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর, অন্য অনেকের মত ইন্দ্রবাবু আশাহত হন, বিপদগ্রস্তও হয়ে পড়েন। দীপু ওপারের ছেলে বলে, তাঁর থাকা এবং পড়ার ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতেও ইন্দ্রবাবু এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যান।

ইন্দ্রবাবুর উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা চলতে থাকা সময়ে একদিন সরকারি ক্ষমতার অধিকারী এক শুভানুধ্যায়ী তাঁর কাছে আসেন। ভদ্রলোক ইন্দ্রবাবুকে বলেন, 'অন্য বহুলোকের মত আপনার বিরুদ্ধেও বেনামে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পত্রে লেখা হয়েছে, আপনি ওপারের লোকজনের সহায়তায় দেশদ্রোহিতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত। আপনার দেশ বিরোধী কাজের সহায়করা নাকি প্রায়ই আপনার বাড়িতে আসা যাওয়া করে। এখনো নাকি এমন একটি ছেলে আপনার কাছে আছে। অন্য সবার মত আমরা, সরকারি কর্মীরাও এ সত্যটা ভালই জানি যে, আমাদের এখানকার অনেকেরই ওপারে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আছেন, আপনারও থাকতে

পারেন। আমরা একথাও জানি যে, ওপারের এসব লোক অনেক সময় নিরাপত্তা, চিকিৎসা, শিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে বাধ্য হন। এসব ব্যাপার আমাদের ভালভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও এবারকার নির্বাচনের ফল ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত, আমরা কেউই এ নিয়ে কোন সময় তেমন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু বর্তমানে বিরাজমান অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে, বিশেষ এক মারণাস্ত্র রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরাও এরূপ অস্ত্রের ব্যবহারকারী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওপারের কোন ছেলে যদি আপনার বাড়িতে থেকে থাকে, তবে তাড়াতাড়ি তাকে অন্য কোথাও, অন্তত কিছুদিনের জন্য চলে যেতে বলুন। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে যে কোন সময় থানা থেকে অনুসন্ধানকারীরা আপনার বাড়ি আসতে পারেন। ওঁরা এসে যদি ওপাড়ের কাউকে আপনার বাড়িতে পেয়ে যান, তবে আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন। অনুসন্ধানকারীরা আপনার কোন কথাই শুনতে চাইবেন না। তাছাড়া, রাজনীতির নামে চারদিকে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ যা চলছে, তাতে এমনিতেও বিরোধী, রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা আজ নিজ বাড়িতে পর্যন্ত নিরাপদ নন। তাই বলি, যত বেশি সম্ভব সাবধানে চলাফেরা করবেন। সম্ভব হলে কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে চলে যান।'

বিশ্বস্ত শুভানুধ্যায়ীর কথা শুনে ইন্দ্রবাবুর দুঃশ্চিন্তার মাত্রা বেড়ে যায়। তিনি আত্মবিশ্বাসের উপর আর ততটা ভর না করে বিপন্মুক্ত থাকার ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন। অনেকক্ষণ ধবে চিন্তা করার পর, শুভানুধ্যয়ীর পরামর্শ গ্রহণ করাকেই তিনি সমীচীন বলে মনে করেন। এতদিন তিনি দীপুকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে এখন তিনি মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলে দেন এবং দীপুকে অন্য এক বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরক্ষণে তিনি তাঁদের বর্তমান অবস্থা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে দীপুর বাবাকে এক চিঠি লিখেন। চিঠির শেষদিকে লিখেন — '.... আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এখানে বিরাজমান ভয়ংকর পরিস্থিতি সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় ও লোকমুখে কিছু জেনেছ। এ পরিস্থিতিতে আমাদের, অর্থাৎ বর্তমানে বিরোধী রাজনৈতিক দলভুক্তদের মধ্যে কে, কখন, কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে যাব জানি না। আমাদের কাছে থাকা দীপুর পক্ষেও এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এখানে ক্ষমতাসীন আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা, রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করতে, আমাদের দলভুক্ত লোকদের বাড়িতে অবস্থান করতে থাকা ওপারের কোন কোন লোককে জড়িয়ে মারাত্মক রকমের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করছে এবং নানাভাবে তাদের নাজেহাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল এক বন্ধু এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, ইতিমধ্যে আমার সাথে দীপুকেও জড়িয়ে বিপজ্জনক এক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ অবস্থায় আজ ভোরে দীপুকে আমি অন্যত্র সরিয়ে রেখেছি। আমাদের পক্ষে এখনকার সঙ্কটজনক অবস্থায় তুমি দীপুকে সাময়িকভাবে তোমাদের পছন্দমত কোথাও রাখার একটা ব্যবস্থা কর। তাতে ছেলে নিরাপদ থাকবে, পরে অনুকূল পরিস্থিতিতে

আমরা সবে মিলে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করব। এখানকার অবস্থা এখন এমনই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, বর্তমানে বিরোধী রাজনৈতিক দলভুক্তদের অনেকে বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র, এমনকি তোমাদের ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

আমি চূড়ান্তভাবে লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত যে, কথা দেওয়া সত্ত্বেও তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান অসহনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দীপুকে আমাদের কাছে রাখতে পারছি না। আমার চিঠিখানির প্রাপ্তি সংবাদ দিও। ইতি —....,

ইন্দ্রবাবুর চিঠি আত্মীয় ভদ্রলোক তাড়াতাড়িই পেয়ে যান। তিনিও মোটেই সময় নষ্ট না করে ইন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেন এবং তা লোকমারফত পাঠিয়ে দেন। আগ্রহান্বিত হয়ে ইন্দ্রবাবু চিঠিখানি পড়েন। চিঠিতে অন্যান্য দু'চার কথা লিখার পর আত্মীয়টি লিখেন—...'আপনি পত্রবাহকের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দীপুকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমাদের অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় আমার দেওয়া বিশেষ কাজটি আপনি করিয়ে রেখেছেন এবং দীপুকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সত্যি সত্যিই যদি তা করে থাকেন, তবে সেই বিশেষ কাজের প্রামাণ্য বস্তুটি এবং দীপুর স্কুল থেকে তার ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সার্টিফিকেটটিও পত্রবাহকের মারফত আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন, অবশ্য আপনার ইচ্ছে হলে। এ জিনিস দু'টি আপনার কাছ থেকে না পেলে, সময়মত অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করে নিতে আমার অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আজ জানিয়ে রাখি, আমার ছেলের পড়ার ব্যাপারে আপনাকে আর কোনরকম চিন্তা করতে হবে না। আমার একটা কথা জানতে খুবই ইচ্ছে করছে যে,আমাদের এখানকার অনেক ছেলে-মেয়েই তো আপনাদের ওখানে পড়াশোনা করে বলে জানতাম। এব্যাপারটা তো আপনার এবং আরও অনেকের ভালই জানা বলে আমরা জানি। এখন এসব ছেলে-মেয়েরা কি আপনাদের অঞ্চল ত্যাগ করে চলে গেছে বা যাচ্ছে? পারলে জানাবেন। সবশেষে আমাকে আর একটা কথা জানাতে হচ্ছে যে, দীপু কোন রাস্তার কুকুর বা ভিখারীর সন্তান নয়, যাকে কেউ লোভ বা খাবার দেখিয়ে ডেকে নিয়ে তামাশা করে ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে।

চিঠি পড়ে ইন্দ্রবাবু ভীষণ ক্ষুব্ধ হন, শেষপর্যন্ত অবশ্য নিজেকে সংযত করে নিয়ে পরদিন আত্মীয়ের চাহিদা ও নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।'

আত্মীয়ের চিঠিখানি ইন্দ্রবাবু দ্বিতীয়বার পড়েন, পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। এক সময় উঠে গিয়ে, তাঁদের এলবাম থেকে সুবেশী ও সুন্দর সুপুরুষ, এক সময়ের প্রিয় আত্মীয়টির একটি ছবি বার করেন এবং একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। চিঠি পড়া এবং ছবি দেখার পর, ইন্দ্রবাবুর মনে লঙ্কার অতিদর্শী রাবণরাজার পৌরাণিক কাহিনীটি আবার জেগে ওঠে।

সোমনাথ চক্রবর্তী

আলকাতরার জীবন

শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটা অভিজাত হোটেলের সামনে জীবনলাল ওর দুমড়ানো মোচড়ানো দেহের মত বাঁকাচোরা টিনের থালাটা নিয়ে বসে থাকে রোজ সন্ধ্যায়। প্রথম দর্শনে ওকে মনুষ্যেতর কোন জীব বলেই ভ্রম হয়। লম্বা লম্বা চুল, দাঁড়ি, ছোট দু'টি চোখ কেন জানি সব সময়ই লাল। একটু ঠাহর করলে বোঝা যায় মানুষই।

ভিক্ষা পাত্রে টুং টাং করে যা পড়ে, তাতে 'হাতখরচা' মোটামুটি চলে যায়। বিড়ি দেশলাই কেনা, দু'বেলা দু'কাপ চা। জীবন লালের খাওয়ার একটা পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যে হোটেলের সামনে সে রোজ বসে, তার মালিক কি করে যেন বুঝে গেছেন জীবনলাল পয়া ভারি। তাই তাকে দু'বেলা দু'টো খেতে দেয়।

অথচ জীবনলাল ভিখারী ছিল না। আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে আগরতলায় এত পাকা বাড়ির রমরমাও ছিল না। ঢেউটিন নয়, কেরোসিন টিনের ছাউনি দেয়া ঘর-বাড়িই বেশি। ছাউনির টিন পুরানো হলে জীবনলালের ডাক পড়ত তাতে আলকাতরা মাখার। একাজে জীবন লালের জুড়ি ছিল না। ছোট খাটো চেহারা, গায়ের রং আলকাতরার পোঁচ, ছোট মাথায় কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটি লাল। ছেলে ছোকরারা তার নাম দিয়েছিল ড্রিমগার্ল। ভুঁইফোড় জীবনলাল জ্ঞান হওয়ার পর নিজেকে আবিষ্কার করেছিল শিশু উদ্যানের খোলা আকাশের নিচে। ওর বাপ মায়ের পরিচয় সে জানে না। তাকে বড় করে তুলেছে শিশু উদ্যানবাসীরাই, যারা কাগজ ও টায়ারের রাবার পুড়িয়ে কোন ক্রমে জুটিয়ে নেয়া খাদ্য দ্রব্য রান্না করে খায়। এরাই তার আপনজন। এদেরই মাঝে ক্রমশ সে বড় হয়ে ওঠে। তার কর্মজীবনের হাতেখড়ি কাগজ কুড়োনয়। তখন তার বয়স বছর দশেক। বছর দুয়েক পর একটা জীপের পিছনে উঠে পড়ে —ড্রাইভারের সহকারি, যাত্রীদের ভাড়া আদায় ও গাড়ি ধোয়ামোছার কাজ। তাও চলল বছর চারেক। কিন্তু একদিন বিনা কারণে সন্দেহেব বশে গাড়ির চালক তাকে চোটপাট করে তাড়িয়ে দিল, সে নাকি ভাড়ার টাকায কারচুপি করেছে।

এরপর সে মঠ চৌমুহনীব একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। চায়ের দোকানেব মালিকটা ছিল হাড়-বজ্জাত। যখন তখন বাপ তুলে গালাগাল দিত, হাতও চলত তার। মজার কথা, বাপ তুলে গালাগালটা ওর মনে ততটা লাগত না, বাপকে তো সে চোখেই দেখেনি! নিরবয়ব ব্যক্তির নাম তুলে গালাগালে গা করত না জীরনলাল। কিন্তু গায়ে হাত তোলাটা শরীরে মনে লাগতো খুব। কিন্তু কিছু করার নেই। এই-ই জীবনের দস্তুর, ভেবে নীরবে চোখের জল গোপন করে কাজ করে যেত জীবনলাল।

সেই দোকানে চা খেতে আসত নিবারণবুড়ো। হাতে ঝুলত আলকাতরার দাগঅলা একটা বড় বালতির মত টিনের পাত্র। এতে আলকাতরা ঢেলে বাড়ি বাড়ি টিনের চালে লাগাত। চায়ের দোকানে জীবনলালের বেগতিক অবস্থা দেখে একদিন চুপিসারে বললো— আলকাতরার কাজ করবি? অমার লগে আইয়্যা পর, আমার একজন লোক আছে তবু আমি তোরে নিমু; একাজে তোরে ওস্তাদ বানাইয়্যা দিমু। তোর লেইগ্যা আমার পরণডা ফাইট্যা যায় রে, এত বকাঝকা খাছ্!

প্রথম প্রথম কাজটা মনে ধরেনি। কিন্তু বুড়ো ক্রমাগত লেগে থাকায়, সে একদিন সত্যিই রাজি হয়ে গেল।

সেই যে আলকাতরায় হাত ডোবাল আর বের করতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে আলকাতরা লাগানোর কাজে দক্ষ হয়ে উঠল। কাজটা তার কাছে খারাপ লাগত না। কোন ঘরের টিনের চালে উঠে দাঁড়ালেই ওর মনে হত নীল আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। প্রাণ ভরে সে শ্বাস নিত এবং অনুভব করত আকাশের নীল যেন তরল হয়ে ওর বুকের ভেতর ঢুকে যেত। শুধু শহরেই নয়, শহর তলিতে এমন কি গাঁয়ে গঞ্জেও জীবনলালের দক্ষতার কথা ছড়িয়ে পড়ে।

যোগেন্দ্রনগরে নিবারণবুড়োর ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে। জীবনলালকে সেখানে গিয়ে থাকতে বলে। কিন্তু চিলড্রেন-পার্কের নিজস্ব মহল্লা ছাড়ার কথা ভাবেতই পারে না জীবনলাল।

এভাবে তার জীবনের আরো বিশটা বছর কিভাবে কেটে গেল খেয়াল করেনি সে। ইতোমধ্যে নিবারণবুড়ো মারা গেছে। শেষে বয়সের ভারে আর কাজে যেতে পারত না নিবারণবুড়ো। মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে খুকখুক করে কাশত। জীবনলাল মাঝে মধ্যে কিছু টাকা ধরিয়ে দিত ওর হাতে। নিবারণবুড়ো কিন্তু হাত পেতে টাকাটা নিত। খুকখুক করে কাশতে কাশতে বলতা—তুই আমারে কমিশন দিতাছছ্‌শালা, দে দে গুরু দক্ষিণা। কেমন, কইছি না তোরে ওস্তাদ বানাইয়া দিমু? লোকে এহন আমার কাছে আইয়্যা তোরে খোঁজে।

জীবনলাল কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে।

নিবারণবুড়োর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেক আগেই। নাতি-নাতনিও আছে। ছেলে নেই। নিবারণবুড়ো ও তার বৌ ছেলের মতই তাকে দেখে।

নিবারণবুড়ো ও তার বৌ জীবনলালের বিয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চাল চুলাহীন অজ্ঞাত কুলশীলকে কেউ মেয়ে দিত চায়নি। বিয়ের কথা জীবনলাল আর ভাবেনি। কিন্তু তারজন্য যে জীবনের অন্য পরিণতি অপেক্ষা করছিল দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি সে। তখন জীবনলালের বয়স ছত্রিশের মত। শহরতলিতে একটা বাড়ির ঘরের টিনের চালে আলকাতরা লাগানোর কাজ ছিল। দুপুরের টিফিনের পর আবার চালে উঠেছে। হঠাৎ মাথার উপরে আকাশে কিসের শব্দ। জীবনলাল ভেবেছিল, প্লেন-ট্রেন বুঝি।

কিন্তু সে যা দেখল, অবাক হয়ে গেল। প্রজাপতির আকারে বিশাল এক 'ব্যোম' ঘুড়ি। নীল আকাশের প্রেক্ষিতে যেন এক অতিকায় প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দটা সেই ঘুড়ি থেতেই আসছে। কে কোথায় উড়াচ্ছে এই ঘুড়ি? দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়।

— কি অইল? তার সঙ্গীর প্রশ্নে থত মত খেয়ে বসতে গিয়ে পা হড়কে যায়। আর পড়বি ত পড় টিনের চালের কোণায় পাকা কলতলার উপরে। ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ ছিটকে আসে জীবনলালের মুখ থেকে। ভাগ্যিস, ওর মাথাও কোমর কলতলায় বাইবে পড়েছিন। কিন্তু বাঁ পাটা বেকাদায় পড়ে ভেঙে গেল।

দীর্ঘ ছয় মাস হাসপাতালে পড়েছিল জীবনলাল। ওষুধপত্রও পরীক্ষা নিরীক্ষায় ওব জমানো টাকা শেষ হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে জীবনলাল সুখীকে বলেছিল—সুখী, আমারে বিষ আইন্যা দে, বিষ খাইয়্যা মরি। ল্যাংড়া অইয়া বাঁইচ্যা থাইক্যা লাভ কি?

সুখী তার হতাশা পত্রপাঠ উড়িয়ে দেয়—

—কি যে কস তুই! দুনিয়ার সব ল্যাংড়ারা বুঝি মইরা গ্যাছে?

— আমি খামু কেমনে!

— তোরে আমি খাওয়ামু।

সুখী তার বিয়ে করা বউ নয়। চিলড্রেন-পার্কেই পরিচয়। কেন জানি তার সঙ্গে মানসিক ঘনিষ্ঠতা ত বটেই, শারীরিক সম্পর্কও তৈরি হয়েছে। কাঁচা-বাচ্চা না হওয়ার টেকনিকটা সুখী জানত। সেই সুখী একদিন তার জীবন থেকে উধাও হয়ে গেল! কোথায় গেল কেউ জানে না। কেউ বলল সুখী কারো সঙ্গে পালিয়েছে। কেউ বলল সুখীকে গুম করে মেরে ফেলা হয়েছে। সুখী তার মনের মানুষের সঙ্গে পালিয়েছে—এব্যাপারটা মেনে নিতে পারে। কিন্তু তাকে মেরে ফেলতে পারে—সুখীর এমন কোন শত্রু আছে বলে মনে হয় না জীবনলালের।

সুখীহীন জীবনলাল আবার একা।

বহু বছর সুখী নিজেই রোজগার করে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে জীবনলালকে।

তার জীবনে সুখীপর্ব শেষ হওয়ায় পাকাপাকিভাবে পথে নেমে আসে জীবনলাল।

দেখতে দেখতে জীবনলাল বুড়ো হয়ে এল। তার ভিখারী জীবনেরও তো অনেকদিন হল।

জীবনলাল এখন আর মরার কথা ভাবে না। বেঁচে থাকার এক প্রবল আকুতি এখন তার মনের মধ্যে কাজ করে। এই শহর, এই শহরের লোকজনকে সে ভালবেসে ফেলেছে।

সন্ধ্যায় সে শুধু ভিক্ষের জন্যই বসে না, সে সন্ধ্যার এই শহরের রংও মন ভরে উপভোগ করে। রাস্তার দোকানপাটের আলোতে চলমান মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মানুষগুলো সুন্দর পোশাক-আশাক পরে থাকলেও, ওর মনে হয় মানুষগুলো সুখী নয়। জীবনলাল মনে মনে বিড়বিড় করে—মানুষগুলো যেন সুখী হয়।

সেদিন ছিল ঝড়জলের রাত। সময়টা কাল বৈশাখীর। ঝড় বৃষ্টি থামলে জীবনলাল

রাতের খাবার খেয়ে যখন তার ডেরায় ফিরছিল, তখন রাত অনেকটা গড়িয়েছে। বাঁ হাতটা বাঁ পায়ের হাঁটুতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মত প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। দুর্যোগের রাত বলে অন্যদিনের চেয়ে তার হাঁটার বেগ ছিল বেশি।

তুলসীবতী স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছে । হঠাৎ তার পায়ে কি যেন ঠেকল। জীবনলাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে হাতিয়ে দেখল জিনিসটা একটা কাপড়ের ঝোলাব্যাগ। ভেতরে ভারী মোটাসোটা প্যাকেটের মত কিছু। কি আছে ওতে ? জীবনলাল যখেরধনের মত ব্যাগটা বুকে আগলে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ওর ডেরা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোডের যাত্রীশেডের দিকে দ্রুত চলতে থাকে । শেডের সিমেন্টের বেঞ্চের একধারে জীবনলাল ছেঁড়াখোঁড়া বিছানা পাটিসাপটার মত গোটানো। জীবনলাল হাত দিয়ে দেখল বিছানাপত্র ভিজে গেছে। ভেজা বিছানার তলায় সে ব্যাগটা চালান করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বেঞ্চের উপর বসে হাঁফাতে লাগল। আজ হাঁটার বেগটা বেশি ছিল, ফলে ভিক্ষের স্থান থেকে ডেরায় ফিরতে ওর পরিশ্রমটা হয়েছে বেশি। জীবনলাল অন্ধকারে ওর এক্সরে দৃষ্টি দিয়ে বিছানা ভেদ করে ব্যাগের ভেতরের জিনিস দেখার যেন চেষ্টা করল। ওর তর সইছিল না। ভারী খাকি হাফপ্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া দেশলাইটা বের করল।

তারপর বিছানার তলায় হাত ঢুকিয়ে ঝোলার ভেতর থেকে প্যাকেটটা বার করতেই রাস্তার আলো চলে এল। জীবনলাল চমকে উঠে—স্বচ্ছ পলিথিনে মোড়া এক বাণ্ডিল টাকা! তার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে! ব্যাগের ভেতর টাকাটা ঢুকিয়ে আবার বিছানা চাপা দেয়। তারপর সন্তপর্ণে রাস্তার দিকে তাকাল—কেউ দেখে ফেলল কিনা! কিন্তু রাস্তা তখন জনশূন্য। একে বিছানা ভিজা, তাছাড়া টাকাটার জন্যে ওকে সজাগ থাকতে হবে। সুতরাং আজ তার ঘুম নেই। জীবনলাল একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে থাকে। অন্য দু'জন ভবঘুরে রাতের বেলা এই শেডটা তার সঙ্গে শেয়ার করে। আজ তাদের এখনো হদিশ নেই। আজ না এলেই ভাল। সারারাত নির্ঘুমই কেটে গেল জীবনলালের। পরদিনও ডেরা ছেড়ে বেরুল না। যক্ষের ধনের মত টাকাটা পাহারা দিল। চা-বিস্কুটের উপরেই সারাটা দিন চালিয়ে দিল। সে রাত্রিটাও জীবনলাল না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল। তারপর সকালে পথচারী চা বিক্রেতা থেকে চা বিস্কুট খেয়ে টাকার ব্যাগটা একটা ময়লা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বগল দাবা করে ডেরা থেকে বেরুল। এই শহরে এমন একজন মানুষ আছে যে তাকে হ্যার্দিক ভালবাসে। জীবনলালের সুমন দাদাবাবু। আদর্শবাদী সমাজ সেবক যুবক। কৃষ্ণনগর বাড়ি। শখের ফটোগ্রাফার। ওর তোলা জীবনলালের একটা ছবি 'বিশ্বপ্রতিবন্ধী' দিবসে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। সুমন তাকে মজা করে বলে—জীবনলাল, লন্ডনে যেমন টাউয়ার ব্রীজ, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, দিল্লীর কুতুবমিনার, কলকাতার হাওড়াব্রীজ, তেমনি তুই হচ্ছিস এই শহরের প্রতীক।

আমার তোলা ছবিটা দেখে তোকে এই শহরের সবাই চেনে।

সুমন কখনো ওকে বিড়ির প্যাকেট কিনে দেয়, চা খাওয়ায়, খুচরো টাকা পয়সাও দেয়।

জীবনলাল একবার অসুস্থ হয়ে শেডে পড়েছিল ক'দিন। সুমন জানতে পেরে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে, সুস্থ করে তুলেছিল।

টাকাটা নিয়ে জীবনলাল সুমনের বাড়ি সুমনের কাছে যায়। টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা খুলে বলে।

সুমন টাকার বাণ্ডিলটা বের করে বললো— এতো দেখছি অ-নেক টাকা!

গুনে দেখে প্রায় দুই লাখ টাকা। সবই হাজার টাকার নোট । সুমন বললো— চল, টাকটা থানায় জমা করে আসি, থানার অফিসার আমার চেনা।

থানার অফিসার বললেন—এখনো কেউ মিসিং ডায়েরি করেনি। অবশ্য কালো টাকা কেউ করবেও না। যাই হোক, আপনার এই জীবনলালকে সংবর্ধনা দেব। পুরস্কারও দেব, পাবলিককে জানাতে হবে —পথের ভিখারীও কেমন সৎ হতে পারে।

থানার সামনের প্রাঙ্গনেই সামিয়ানা টাঙিয়ে, মঞ্চে চেয়ার সাজিয়ে জীবনলালর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। মঞ্চে পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বসে আছেন শহরের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। মঞ্চের সামনের সারিতে চেয়ারে দর্শকাসনে নতুন পাঞ্জাবি পায়জামা পরে সুমনের সঙ্গে বসে আছে জীবনলাল। পাঞ্জাবির সেটটা সুমন তাকে উপহার দিয়েছে তার জীবনের আজকের বিশেষ দিন উপলক্ষে। জীবনালাল কিছুতেই পরতে চায় না। সুমন বলেছে, আজকের অনুষ্ঠানে তুই-ই হিরো। সবার চোখ থাকবে তোর উপর। তোর এই ছেঁড়াগেঞ্জি ও হাফপ্যান্টে চলবে না।

সুমনের চাপা চাপিতে পরতে বাধ্য হয় জীবনলাল। আজকের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনে জীবনলালের মত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিরা যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ কথাই ইনিয়ে বিনিয়ে বক্তারা কয়েকজন বললেন। বক্তৃতার শেষে জীবনলালকে পুরস্কার নেয়ার জন্য মঞ্চে আসতে আহ্বান জানানা হল। সুমনই ওকে ধরে নিয়ে আসে। উচ্চপদস্থ এক পুলিস কর্তা ওর গলায় জড়িয়ে দিলেন নতুন একটা শাল, হাতে ধরিয়ে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা ভর্তি একটা খাম। পরিশেষে জীবনলালকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হল।

জীবনলাল ঠক ঠক করে কাঁপছিল। সুমনের একটা হাত ওর কাঁধেই ছিল। বললো— ঘাবড়াস না, আমি তো আছিই! সুমন ওকে মাউথপীসের সামনে নিয়ে যায়। খোঁড়া বাঁ-পায়ের হাঁটুতে বাঁ হাতটা চেপে ধরে জীবনলাল কোন ক্রমে ভীতুচোখে সামনে তাকায় । অনেক লোক লাল চেয়ারে বসে। জীবন লালের বুকের ভেতর একটা আবেগের সমুদ্র জেগে উঠছে ! হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে বলে জীবনলাল— আমি ত এইডির যোগ্য না, আমি ত টাকার বান্ডিল থেইক্যা কয়েকটা নোট সরাইছি!

জীবনলাল বসে পড়ে গায়ের শাল ও খাম ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর রাখে।

রূপ লাগি

ঘরে পা দিয়েই আমি থমক দাঁড়ালাম। আমাদের সাজনো ড্রয়িংরুমে উজ্জ্বল আলোয় লোকটি হেসে হেসে বাবার সঙ্গে কথা বলছিল । এরকম কুৎসিত লোক আমি জীবনে দেখিনি। বেঁটে মোটাসোটা, গায়ের রং মিশকালো ; দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট। মাথার ছোট ছোট চুল শলাকার মত খাড়া। আমি ঘরে ঢুকতেই ঘাড় ঘুরিয়ে ওব কুতকুতে দুটো ছোট চোখ দিয়ে হাঁ করে যেন আমাকে গিলছিল।

বাবা আমাকে দেখে বললেন— রানি মা, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি মিঃ হিরন্ময় চ্যাটার্জি, দুর্গাবাড়ি টি এস্টেটের মালিক। আর মিঃ চ্যাটার্জি, আমার মেয়ে ইন্দ্রাণী....

আমরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করি। লোকটার নাম শুনে আমার হাসি পেল। হিরন্ময় না হয়ে কৃষ্ণময় হলেই উপযুক্ত হত। আমার মুখের হাসির আভাস বোধ হয় লোকটার নজর এড়ায়নি। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো— আমার নামটা শুনে বোধ হয় আপনার হাসি পাচ্ছে। আসলে নামটা রেখে ছিলেন আমার মা আর তিনি খুবই সুন্দরী মহিলা ছিলেন।

বলতে বলতে লোকটা সেন্টার টেবিলে একটা পুরানো হলদেটে বড় সাদা কালো ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ছবির মহিলা সুন্দরীই বলতে হবে।

বাবা বললেন—রানিমা, মিঃ চ্যাটার্জি ওর মৃতা মায়ের ছবি আঁকাতে এসেছেন। ওর এক বন্ধু আমার নাম সুপারিশ করেছেন।

এতক্ষণে লোকটার আগমনের আসল কারণ আমি বুঝতে পারলাম। আর, না দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াতেই লোকটা বলে উঠলো—মিস্ চ্যাটার্জি, প্লিজ একটু দাঁড়ান।

আমি ঘুরে দাঁড়তেই বলে উঠলো—লাল পিওর সিল্কের শাড়িতে আপনার দুধে আলতা শরীরে আপনি নিজেই একটি নিঁখুত রক্ত গোলাপের মত। আপনার হাতে প্লাস্টিকের লাল গোলাপটা একেবারে বেমানাম এই নিন....।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে একটি সত্যিকারের লাল গোলাপ আমার সামনে ধরে।

আমি ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ন হাসিতে বিদ্ধ করে ওকে বললাম—মিঃ চ্যাটার্জি, আমার নিজের গাছের গোলাপ আমাকেই উপহার দিয়ে—বোঝাতে চাইছেন, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না!

—বারান্দায় টবে লাল গোলাপগুলো দেখে আমি লোভ সামলাতে পারিনি। তাই একটা তুলে নিয়েছি। আসলে আপনার হাতে এই সত্যিকারের লাল গোলাপটা থাকলে আপনার সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হতো।

— কিন্তু একটা সৌন্দর্য পূর্ণ করতে গিয়ে, আরেকটা সৌন্দর্য খণ্ডিত করলেন মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার ছেঁড়া ফুলটার সৌন্দর্যের বেশি প্রকাশ গাছেই নয় কি?

সত্যিকারের লাল গোলাপটা তখনো হিরন্ময়ের হাতেই ধরা ছিল।

সেটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত জড়ো করে বললো— ফুলটা ছেঁড়ার জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

—সৌন্দর্য পিপাসুর অত্যাচার সুন্দর জিনিসের একটু আধটু সইতে হয় বৈকি! লোকটাকে বিদ্ধ করে আত্মতৃপ্তিতে ভরে গেল মন। ওর কালো মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে এলো।

—তাহলে একথাই রইল মিঃ চ্যাটার্জি। একমাস পরে এসে আমি মায়ের ছবিখানা নিয়ে যাব। কথাগুলি বাবার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে ফুল হাতে আহত বাঘের মত ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে বাঁচল। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে ওকে এগিয়ে দিতে ঘরের বাইরে গেলেন।

ঘরে আমি তখন একা চুপ করে দাঁড়িয়ে। এ বাড়িতে লোকটার উপস্থিতি কেন জানি আমার ভাল ঠেকছে না। মনে হল, এক দুষ্টগ্রহের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের বাড়িতে।

লোকটা আমাকে কেমন খোঁচা দিয়ে আহত করে গেল। আমার হাতে প্লাস্টিকের ফুল মানায় না। আমি ফুলটার সৌন্দর্য দেখেই কিনে এনেছি। কোন্ উপাদানে তৈরি ভাবিনি।

আমি ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জি—শিল্পী সাত্যকি চ্যার্জির মেয়ে— সৌন্দর্যের প্রতি আশৈশব অমোঘ আমার আকর্ষণ। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর সব আমি ভালবাসি। আমার কাছে A thing of beauty is joy for ever সৌন্দর্যের প্রতি আমার এই নিবিড় আকর্ষণ বাবার স্টুডিওর সৌন্দর্যের পরিবেশে জন্মেছিলাম বলে। ঘরের অভাবে বাবার ছবি আঁকার ঘরটাই আঁতুড় ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেটা ছিল ছন বাঁশের তৈরি মাটির ভিটির ছোট্ট একটা কাঁচা ঘর। তখন বাবা ছিলেন অনামী টাকা পয়সাহীন এক বাউন্ডেলে শিল্পী। গ্রাসাচ্ছাদন চলত প্রাইমারি স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষকের চাকুরিতে। এখনও যে খুব টাকা পয়সা আছে তা নয়। তা শিল্পী হিসাবে যশ ভাগ্য যতটা আর্থিক ভাগ্য ততটা নয়। রিটায়ারের পরে প্রাপ্ত অর্থে ছিমছাম এই পাকা একতলা বাড়িটা করেছেন।

একমাত্র সন্তান বলে আমি খুব আদরে আহ্লাদে বড় হয়েছি। খাওয়া পরার ব্যাপারে বাবা-মা কখনো আমার চাহিদা অসম্পূর্ণ রাখেননি।

— কি রে, তুই এখনও দাঁড়িয়ে? কি ভাবছিস? বাবার কথায় সম্বিত ফিরল। হিরণ্ময় চ্যাটার্জিকে এগিয়ে দিয়ে বাবা ফিরে এসেছেন ঘরে।

বাবা আবার বললেন—রানিমা, হিরন্ময় চ্যাটার্জি কি বললেন, তোর হাতে প্লাস্টিকের ফুল মানায় না। বাবার মুখে স্মিত হাসি।

বাবার কথায় আমি হাতের ফুলটার দিকে তাকালাম। সবুজ পাতায় ঘেরা একটা টকটকে রক্ত গোলাপ। আমি নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ শুঁকতেই প্লাস্টিকের বোঁটার গন্ধে

আমার গা গুলিয়ে এল। আমি জানালার শিকের ভেতর হাত গলিয়ে ফুলটা বাইরে ফেলে দিলাম।

প্রায় এক মাস পর একদিন হিরণ্ময় চ্যাটার্জি এসে তার মায়ের ছবিখানা নিয়ে গেল।

ছবিটা দেখে খুব খুশি।

উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো—বাহ্, চমৎকার ছবি এঁকেছেন মিঃ চ্যাটার্জি। হলুদ কালো পটভূমিকায় লাল পেড়ে শাড়ি, কপালে জ্বল জ্বলে সিঁদুরের টিপ, মায়ের মুখ বিষাদে ভরা কিন্তু ঠোটে স্মিত হাসি যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মিঃ চ্যাটার্জি, এই নিন আপনার পারিশ্রমিক।

এক তাড়া নোট প্যান্টর পকেট থেকে বের করে সেন্টার টেবিলে রেখে বলে—এতে বিশ হাজার রয়েছে ।

বাবা বললেন—অত লাগবে না। আমার দশ হাজার হলেই চলবে।

বাবা গুনে গুনে নোটের তাড়া থেকে ঠিক দশ হাজার টাকাই নিলেন।

হিরণ্ময় চ্যাটার্জি হাঁ! আজকের দিনে এমন নির্লোভ লোক দেখার অভ্যাস বোধহয় ওর নেই।

ছবি নিয়ে চলে গেলেও হিরণ্ময় চ্যাটার্জি আমাদের বাড়ি আসা ছাড়ল না। বেশ ঘন ঘন আসতে লাগলো আমাদের বাড়ি। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সময় কাটালেও—তার আসার উপলক্ষটা যে আমি এই ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

অবশেষে আমার আশঙ্কটাই সত্য হল।

বাবা একদিন বসার ঘরে আমাকে একান্তে ডেকে বললেন—রানিমা, হিরণ্ময় চ্যাটার্জিকে তোর কেমন লাগে?

আমি না বোঝার ভান করে বললাম—কেমন লাগে মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?

বাবা আমতা আমতা করে বললেন—না, মানে...

হিরণ্ময় চ্যাটার্জি তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

— লোকটার স্পর্ধা ত কম নয়! বাড়ি এসে... কিন্তু নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখেছে কি?

— রূপ না থাকলেও হিরণ্ময় চ্যাটার্জি খুব সুন্দর মনের মানুষ। শিল্প ও সাহিত্যের সমঝদার, ওর সঙ্গে আলাপ করেই বুঝেছি। তাছাড়া ইতোমধ্যে শহরের এক শিল্পীর প্রদর্শনীতে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রতিটি ছবি ভাস্কর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন আর আমার সঙ্গে প্রকৃত রসবোদ্ধার মত আলোচনা করছিলেন।

মা বোধহয় আড়ালে কোথাও ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও এসে জুটেছেন। বললেন—

ইন্দু, দেখতে কুৎসিত হলেও লোকটার মনটা খুব সুন্দর। তুই ভুল বুঝিস না, আমরা ধনসম্পত্তি দেখে ভুলিনি, মনের দিকটাই বিচার করেছি। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখেই থাকবি। তাছাড়া তুই ত সাজতে ভালবাসিস। তোকে মন মত দামি গয়না শাড়ি কি আমরা কখনো দিতে পেরেছি? ওর সঙ্গে বিয়ে হলে শাড়ি গয়নার তোর অভাব হবে না।

জীবনযাপনে বাবা-মা আমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমার উপর তাদের ভরসা ছিল, আমি খারাপ কিছু করব না।

রূপবান ধনবান এবং অবশ্যই শিক্ষিত এমন কিছু পুরুষ বন্ধু আমার আছে, কিন্তু বন্ধুত্বের সোপান বেয়ে স্বামীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য ওদের কাউকেই আমার মনে হয়নি।

কিন্তু তা বলে হিরণ্ময় চ্যাটার্জি? বানরের গলায় মুক্তোহার!

হিরণ্ময় চ্যাটার্জি সুন্দর মনের মানুষ! ক'দিনের পরিচয়েই বাবা-মা লোকটাকে চিনে নিয়েছেন। কি জানি! সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকি আমি। তবু বাবা-মার আকূতি আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। সময় গড়িয়ে যায়। আমি ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না। অবশেষে বাবা-মার পীড়াপীড়িতে আমি রাজি হয়ে যাই। শুধু কি বাবা-মার তাড়না! হিরণ্ময় চ্যাটার্জিও যেন অমোঘ নিয়তির মত তার দিকে টানছিল আমাকে।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে বিয়ের পর সুখের সুনামিতে ভাসতে থাকি আমি। বাবা-মা রতন চিনেছেন ঠিকই।

হিরণ্ময় বাইরে দেখতে কুশ্রী বটে, তবে ওর অন্তরটা খুবই সুন্দর। আমাকে পাগলের মত ভালবাসে।

বিয়ের পর প্রথম যখন আমি হিরণ্ময়ের চা বাগানেব বাংলোতে আসি, হিরণ্ময় হলঘরে বাবার আঁকা ওর মায়ের ছবির নিচে আমাকে দাঁড় করাল।

হিরণ্ময় মায়ের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে বললো—মায়ের আশীর্বাদে আমি তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছি।

হিরণ্ময়ের মায়ের ছবিতে প্রণাম করে ওর দিকে তাকালাম। খুশিতে টইটম্বুর মুখ।

ওর চা বাগানের কুলি কামিনদের চোখেও হিরণ্ময় দেবতার মত। বৌ-ভাতে ওদের সবার নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলোর সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় ওরা সন্ধ্যায় নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচ-গান হৈ-হল্লোড় করেছে।

প্রায়ই বিকেলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি।

হেঁটে যাই বাগানের কুলিদের বস্তিতে।

ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করি। ওদের সুখ-দুঃখের কাহিনি শুনি। কখনো বাগানের একটা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করি।

নিচে ঢাল বেয়ে অনেক দূর বিস্তৃত ছোট ছোট চা গাছগুলো। মনে হয় উর্মিল এক সবুজ সমুদ্র হঠাৎ স্থির হয় আছে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় হিরণ্ময় বাংলোর অদূরে একটা ঝিলে নৌকা বিহারে আমাকে নিয়ে যায়।

আসলে নৌকা নয়। কাশ্মীরে ডাললেকে যেমন সাজানো গোছানো শিকারা থাকে, সেই রকম। এটি হিরণ্ময়ের একান্ত ব্যক্তিগত। আমাকে বসিয়ে হিরণ্ময়ই বৈঠা চালায়।

কি করে যে একটা বছর কেটে গেল টেরই পেলাম না। কিন্তু এক বছর পর যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি হিরণ্ময়ের সন্তানের মা হতে চলেছি, তখন আমি মুষড়ে পড়লাম। আমার বদ্ধমূল ধারণা হিরণ্ময়ের সন্তান ওর বাবার মতই দেখতে কদর্য হবে। এভাবনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। দিন দিন কেমন একটা বিষণ্ণতা আমাকে গ্রাস করতে থাকে।

আমার মনে হয় পাতলা কুয়াশার মত অন্ধকার আমার গর্ভে অনুস্যূত হয়ে ক্রমশ ঘণীভূত হয়ে মানবদেহের অবয়ব পাচ্ছে।

একটা কুৎসিত সন্তানের মা হব আমি ভাবতেই পারছি না। ইচ্ছে হয় গর্ভের সন্তান নষ্ট করে ফেলি। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথাটা কেমন পাগল পাগল লাগে। আমার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যের গ্রহণ হিরণ্ময়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। একদিন রাতে খাবার টেবিলে বললো—তুমি সারাক্ষণ এত কি ভাব বলতো?

এখন তো আনন্দে ভাসবার সময়—

আমি কি বলব, মাথা নিচু করে চুপ করে থাকি।

এরই মধ্যে হিরণ্ময় একদিন দুপুরে শহরে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে শোবার ঘরে ঢুকল। আমি তখন শোবার ঘরে। ওর হাতে পোষ্টারের মত কতগুলো কি?

হিরণ্ময় আপন মনে এক একটা পোষ্টার আঠা দিয়ে দেয়ালে আঁটতে লাগলো। অবাক চোখে আমি দেখলাম, পোস্টারে নানা ভঙ্গিতে সুন্দর সুন্দর শিশুদের ছবি। সব পোষ্টার লাগানো শেষ হলে হিরণ্ময় আমার কাছে এসে হেসে বললো— রানি, আমাদের সন্তান যেন এরকম সুন্দর হয়। সহসা আমার চোখে জল এসে গেলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে হিরণ্ময়ের গলায় আমার বাহুলতার মালা পরিয়ে ওর বুকে মাথা রেখে বললাম—না হিরণ্ময়, আমাদের সন্তান যেন তোমার মত একটা সুন্দর মনের অধিকারী হয়।

তোলা

১

সায়নদের গৃহ প্রবেশের দিন পাড়ায় একটি যুবক খুন হয়ে গেল। যুবকটির গায়ে সমাজ বিরোধী তকমা আঁটা ছিল। কে বা কারা ভর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বাড়ির সামনেই গুলি করে মেরে বাইকে চড়ে পালিয়ে যায়। সন্ধ্যা হতে না হতেই পাড়ায় যেন অঘোষিত কার্ফু, পুলিশ মোতায়েন, মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যানও টহল দিয়ে যাচ্ছে।

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আজ সায়নদের বাড়ি অনেকে আমন্ত্রিত ছিল। ওর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার কেউ কেউ। ছোট শহর হলেও দূরের যারা খবরটা পায়নি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন এল। কিন্তু কাছে ধারের এবং পাড়া প্রতিবেশী প্রায় কেউই এল না। সুতরাং সায়নের অনেক আয়োজনই নষ্ট হলো। যারা এল তারাও তড়িঘড়ি করে চলে গেল। রাত আটটা না বাজতে বাজতেই বাড়ি ফাঁকা । প্রায় দশটা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করল। কিন্তু আর কেউই এল না। ক্যাটারাররাও বিদায় নেবার জন্য উসখুস করছিল। সায়নদের খেয়ে নিতে বলল। সায়ন জানাল যে তারা একটু পরে খাবে। সুতরাং ক্যাটারাররা নিজেরা খেয়ে নিয়ে ঝটিতি বিদায় নিল। কাল সকালে এসে পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবে এবং মাল পত্র নিয়ে যাবে।

ছাদের উপর সামিয়ানার নিচে দুটো লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে ছিল সায়ন ও শ্রী। সায়ন বসে বসে হাই তুলছিল । আজ অনেক শ্রম হয়েছে ওর।

এক সময় বললো— আর দেরি করে লাভ কি?

চলো আমরা খেয়ে শুয়ে পড়ি। সায়ন লক্ষ করছে অনেকক্ষণ ধরেই শ্রী যেন কিছু ভাবছিল। সায়নের কথায় শ্রী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে—দেখো ত কি অলক্ষুণে কাণ্ড! আজই কিনা—

—কি অলুক্ষণে কাণ্ড? সায়ন অবাক—পুজো আচ্চা ত ঠিক মতই হয়েছে। দেখেছ, পুরুতমশাই কি বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্রগুলো আউড়েছিল!

— আমি সে কথা বলছি না, আজকের পাড়ার ঘটনাটা—

— ও। আপদ গেছে! যেন একটা পোকামাকড় মরেছে এমন তাচ্ছল্যের সুরে সায়ন বলতে লাগলো—ওর ঠিকুজি কোষ্ঠী আমার নখদর্পণে। তোলাবাজ, দাঙ্গাবাজ, দু একটা খুনের অভিযোগও আছে ওর বিরুদ্ধে। তোমার কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, সেই কথাই ভাবছো। এখনো কয়েকটি গামলা— খিচুড়ি পায়েস ও লাবড়ায় ভর্তি। পাশে কয়েকটি বালতিতেও অপরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য। কলাপাতা বিছিয়ে ও মাটির ভাঁড় সাজিয়ে ওরা দু'জন খেতে বসল। সায়ন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিল। পরিপাটি করে খিচুড়ি লাবড়া পায়েস খেল। কিন্তু

খেয়াল করল শ্রী প্রায় কিছুই খেল না। সায়ন বললো— তোমারও কম খাটুনি যায়নি, তার উপর সারা দিন উপোস। তুমি, কিছুই খেলে না দেখছি—

তারপর একটু থেমে জিভে চুকচুক শব্দ করে বললো— ছেলেটা ভাগ্যবান। মরার আগে জানতে পারল না, একটি সুন্দরী মহিলা তার জন্যে শোক প্রকাশ করছে। হাত মুখ ধুয়ে সায়ন বললো— আজেবাজে ভাবনা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলো। ভাব ত, কি সুন্দর স্বপ্নের বাড়ি হয়েছে আমাদের। তারপর হিন্দি সিনেমার নায়কের মত—শ্রী-র সুন্দর মুখটা অঞ্জলি বদ্ধ করে সায়ন বললো—এই বাড়িকে আমরা ' প্যারকা মন্দির' করে তুলব। ' প্যারকা মন্দির' কথাটা শুনে সায়নের হাতে ধরা শ্রী-র মাথাটা কেঁপে উঠলো। সকালে ছেলেটা ঠিক এই কথাই বলেছিল।

সাত সকালেই স্নান সেরে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি , কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে পুজোর বাজারের ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র ডালায় গুছিয়ে রাখার সময় শ্রী আবিষ্কার করল ধূপ কাঠির প্যাকেট আসেনি । পুরতমশাই ও এসে পড়লেন বলে । সুতরাং শ্রী নিজেই ছুটল পাড়ার একটি দোকানে। ধূপকাঠি নিয়ে ফেরাব সময় পাখির ডানার মত দু হাত ছড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়ায় ছেলেটি। ছোট খাঁটো রুক্ষ চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শরীর টলছিল। ভক করে মদের গন্ধ এসে নাকে লাগে শ্রীর। বিরক্তিতে ভ্রূকুচতে উঠলো শ্রীর। ছেলেটির আস্পর্দ্দা দেখে অবাক হয়ে গেছে ও। ছেলেটি শ্রীর বিড়ম্বিত অবস্থার পরোয়া না করে বললো— বৌদি, আজ আপনাদের গৃহপ্রবেশ বুঝি ? বাড়ির দরজায় দেখলাম কলাগাছের সেন্ট্রি, আমপাতা ফুলের মালা ঝুলছ!..... বেশ সুন্দর বাড়ি হয়েছে আপনাদের— প্যারকা মন্দির। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে নিরাবেগ কণ্ঠে শ্রী বললো— বেশ তো যাবেন, সন্ধেবেলা...

— উহুঁ, প্রবলভাবে মাথা নাড়ে ছেলেটি—আমাকে দেখলে তো আপনার গেস্টরা ভির্মি খাবে। আমি বরং পরে একদিন গিয়ে আপনার হাতে চা খেয়ে আসবো।

শ্রী চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলো পাড়ার কেউ কেউ ওর বিব্রত অবস্থাটা হাসি মুখে উপভোগ করছে।

— পথ ছাড়ুন। এইবার মৃদু হুঙ্কার দিল শ্রী।

—আসল কথাটাই তো বলা হয়নি বৌদি। টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে ছেলেটা।

—এ পাড়ায় যারা নতুন বাড়ি করে তাদের আমাকে তোলা দিতে হয়। অন্যদের থেকে বেশি নিলেও আমি আপনার থেকে মাত্র হাজার পাঁচেক নেব ; কেন না, আমার মনে হয়— আপনার মনের ভেতরটা আপনার মতই সুন্দর।

ছড়ানো হাত গুটিয়ে নিতেই ঝটিতি শ্রী ওকে অতিক্রম করে হন্‌হনিয়ে বাড়ি ফিরে।

(২)

সুখ... সুখ... সুখ। অনাবিল সুখের আসরে ভাসছে শ্রী। টাকা পয়সা, খাওয়া পরার অভাব নেই। জীবনের সমস্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ এ বাড়িতে মজুত। সর্বোপরি তার প্রতি সায়নের অতলান্ত ভালবাসার উচ্ছ্বাস। জীবনে আর কি চাই!

সায়ন তার আরো দুটো স্বপ্নের কথা বলে। তার একটি ফুটফুটে নতুন অতিথি চাই,আর দু চাকার বাইকে মন ভরছে না, চার চাকার একটি গাড়ি চাই।

শ্রী হাসি মুখে আশ্বস্ত করে—হবে মাশাই, সবই হবে। অফিসে যাওয়ার সময় সায়ন পইপই করে সাবধান করে — গেটে কালিং বেল বাজলে উটকো লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিও না।

একদিন ভর দুপুরে বাড়ির লোহার গেটে ঠক্‌ঠক্ করে কে আওয়াজ করছে, শুনতে পেল শ্রী। সায়ন অফিসে। কাজের মহিলা রান্নাঘরে ব্যস্ত। শ্রীই এগিয়ে গিয়ে লোহার দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। অভাবী চেহারার ময়লা কাপড় পরা ব্যাগ হাতে এক প্রৌঢ়া। হয়তো কিছু চাইতে এসেছে। এসব লোকের প্রতি শ্রীর হৃদয়ে সহানুভূতির একটু জায়গা আছে।

সয়নের সাবধান বাণী ভুলে পাল্লাটা খুলতেই সড়ুৎ করে এক মহিলা গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো। শ্রী গেট লাগিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই এক গাল হেসে বললো— গোলা ঠিকই বলেছে, তোমার বাড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে মা।

শ্রী অবাক কণ্ঠে বললো—গোলা কে ? আপনি কে?

বিষাদে ডুবে গিয়ে মহিলা বললো— গোলা আমার ছেলে, মা। ওই যে তোমার গৃহ প্রবেশের দিন খুন হয়ে গেল! মহিলা চোখে আঁচল চাপা দিল। শ্রী চমকে ওঠে! ধাতস্থ হতে সময় নিল। আঁচল সরিয়ে গোলার মা বললো— গোলা থাকতে খাওয়া পরাটা তবু চলছিল। এখন একজনের পেটই চালাতে পারছি না। তুমি আমাকে রাখবে মা, তোমার কাজের লোক।

— কিন্তু আমার তো কাজের লোক আছে।

মাহিলা হাত দিয়ে কপাল চাপড়ে বললো—অভাগী যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। আসলে গোলার মা বলেই আমাকে সবাই রাখতে ভয় পায়।

শ্রী কাঁপা কণ্ঠে বলে ওঠে—না, না, সে রকম কিছু নয় ! আমার সত্যিই কাজের লোক আছে।

— তবে যাই মা। পিছন ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই শ্রী কি ভেবে বললো— দাঁড়াও। মহিলা আবার ঘুরে দাঁড়াল।

— এসো। শ্রী তাকে আন্তরিক ঘরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানালো। প্রচণ্ড গরম।

কুলকুল করে ঘামছে মহিলা। ঘরে ঢুকেই সোফাতে ধপ করে বসে বললো—এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার মা?

ঘরের পাখাটা চালিয়ে দিয়ে শ্রী রান্না ঘরে এসে কাজের মহিলাকে দিয়ে এক গ্লাস জল ও প্লেটে কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিল গোলার মায়ের জন্য।

তারপর শ্রী শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলে একশ টাকার একটা নতুন নোটের বান্ডিল বের করল। তার থেকে গুনে গুনে পঞ্চাশটা কড়কড়ে নোট তুলে নিয়ে বসার ঘরে এসে নোটগুলো গোলার মায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো— নাও, পাঁচ হাজার...

মহিলা হাত না বাড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললে—তোলাবাজের মাকে তোলা দিচ্ছ মা!

তারপর কাঁদতে কাঁদতেই মুখের আঁচল সরিয়ে বলল—গোলা ঠিকই চিনেছিল তোমায়! তোমার মনটা খুব ভাল। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ও টাকা আমি নিতে পারব না। তবে কোন দিন যদি কাজের লোকের অসুবিধায় পড়, আমাকে খবর করো। মহিলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে শ্রী। 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন' আশীবার্দের ঘণ্টাধ্বনি ওর কানে বেজে উঠল। শ্রীর সুখের সাগরে মাঝে মাঝে ভয়াল তিমির মত ঘাই দিয়ে যেত—গৃহ প্রবেশের দিন গোলার খুনের ঘটনাটা। সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের দেয়ালে চোখ রাখত রক্তের ছিটা লেগে আছে কিনা! দশ মণ ভারী পাথরের বোঝা হয়ে বুকের উপর চেপে বসেছিল যে ঘটনাটা, তা যেন ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

শ্রী দাঁড়িয়েই থাকে। নোটের উপর আঙ্গুলের বাঁধন আলগা হয়ে আসে। পাখার জোর হাওয়ায় পাখির মত দিগ্‌বিদিক উড়ে যেতে থাকে কড়কড়ে একশ' টাকার নতুন নোটগুলো।

বাঘের গায়ের গন্ধ

১

বড় বড় গাছগুলির শাখা প্রশাখা বেয়ে ছত্রী সৈন্যের মত ঝুপঝাপ অন্ধকার নামছিল রাবার বাগানে।

গাছ পালার ফাঁকে একটা লাল রঙের বলের মত আটকে আছে অস্তগামী সূর্যটা। বনবীর তন্ময় হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু সেই দিকে চোখ ছিল না নালন্দার। অস্তগামী সূর্যের চেয়েও এ মুহূর্তে বনবীরকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল তার। পাশে দাঁড়ানো

ছফুটের উপর দীর্ঘ অবয়ব বনবীরকে এই অরণ্যেরই এই বনস্পতি বলে মনে হচ্ছিল। ওর লম্বা চুল, গোঁ ফ দাঁড়ি পরনের সাফারি এত পুরানো ও ধূলি বালিতে ময়লা যে, আসল রং কি ছিল বোঝার উপায় নেই। ওর গায়ে কেমন একটা গন্ধ— চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এমন একটা গন্ধ পেয়েছিল নালন্দা। স্নানটানের পাট আছে কিনা কে জানে! দাঁতটা মাজে কিনা সন্দেহ। হাতে পায়ের নখগুলো কেমন বড় বড় ও অপরিচ্ছন্ন। টয়লেট করেও হাত পা ধোয় কিনা সন্দেহ। সভ্যজগৎ থেকে যেন চ্যুত হয়ে যাচ্ছে বনবীর। কিন্তু কেন তার এই বুনো চালচলন? তবে কি, নালন্দার প্রত্যাখ্যান? কিন্তু নিজেকে ওভার এস্টিমেট করে ফেলেছে নালন্দা। বনবীর তো নালন্দাকে না পেয়ে দেবদাস হয়ে যায়নি! বনবীর তো বিয়েও করেছে! যদিও বউ মরে গেছে। ওর জলজ্যান্ত একটা জোয়ান ছেলেও রয়েছে। কলেজ জীবনে বনবীর মহার্ঘ পোশাক না পরলেও মোটামুটি ফিটফাট থাকত। এরকম অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করত না। তবে কেন যে বনবীরের এই ভেক ধারণ তার ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না নালন্দা। কারণটা জিজ্ঞাসা করতে চাইলেও বনবীর হয়তো কোন দিক থেকে আহত হবে মনে ভেব নালন্দা আর জানতে চায়নি।

প্রায় মাসখানেক আগে আগরতলায় একটা ব্যাঙ্কে বনবীরের সঙ্গে অনেক বছর পর দেখা। প্রায় ত্রিশ বছর হবে। কলেজ জীবনের পর এই প্রথম। বনবীরের চুল দাঁড়ি ময়লা পোশাকের বর্মভেদ করে ওকে চিনতে ভুল হয়নি নালন্দার।

কাউন্টার থেকে টাকা তুলে বনবীর ফিরে আসছিল। হঠাৎ নালন্দা এসে সামনে দাঁড়ালো— বনবীর, না? কলেজ জীবনে তার ধ্যানের প্রতিমাকে এত বছরের ব্যবধানেও এক নজরেই চিনে ফেলেছে বনবীর। কিন্তু নদীর মত ওর খাঁ খাঁ সাদা সিঁথিতে ওর দৃষ্টি থমকে গেলো।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তার একটা ঝুপড়ি চায়ের দোকানে দু'কাপ চা নিয়ে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে ওরা। দুপুরের ব্যস্ত সময়ে চায়ের দোকানে আরও কয়েকজন ছিল। তাদের কান বাঁচিয়ে যথা সম্ভব নিচু গলায় নালন্দার খবরাখবর নিল বনবীর।

কলেজ জীবনে নালন্দাকে এমন একান্তে পায়নি বনবীর। আর যেদিন পেল সেদিনই বনবীর প্রোপোজ করেছিল। শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল নালন্দা। তারপর মাথা নিচু করে মৃদু স্বরে বিনম্র জানিয়ে দিল বাবা-মার পছন্দ কলকাতার এক পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। কলেজের পরীক্ষা শেষ হতেই সেই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়।

বনবীরেরও সব কথা জেনে নিল নালন্দা।

পড়া শেষ করে বনবীর কোন চাকরি জোটাতে পারেনি। ঠিকেদারির টুকটাক কাজ ও ছোট খাটো নানা ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে একটা রাবার বাগানে থিতু হয়েছে। বাগান থেকে আয়ও হচ্ছে ভাল।

সবশেষে বনবীর বললো—এসো না , আমার বাগানে একদিন, দু একদিন থেকেও যেতে পারো। খারাপ লাগবে না।

বনবীরের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেনি নালন্দা। একটা ছোট্ট হাত ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সত্যিই একদিন পা রাখে বনবীরের সাধের রাবার বাগানে। রাবার বাগানের পাশেই একটা টিলার উপর বনবীরের বনবাংলো। সাদা রং করা লাল টালির ছাউনি —একটা লম্বা মাটির ঘর। পার্টিশন দিয়ে তিনটি ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এক প্রান্তে বনবীরের ঘর, মাঝখানে অফিসঘর, অন্য প্রান্তের ঘরটা অতিথি কেউ এলে থাকার ব্যবস্থা হয়। নালন্দাকে প্রথমে নিজের ঘরেই একটা কাঠের চেয়ারে এনে বসিয়েছিল বনবীর। ঘরে আসবাবপত্র বলতে বসার দু'টো কাঠের চেয়ার, শোয়ার একটা খাট, একটা ছোট আলনা , আর ময়লা প্লাস্টিকের টেবিল ক্লথে ঢাকা ছোট একটা কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর ল্যমিনেট করা বনবীর ও ওর বৌর ছবি। ছবির দিকে চেয়ে বনবীর বললো—ফুলমতি। আমার বৌ। আমার ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। নালন্দা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ছবিতে বনবীরের বৌকে। সাদামাটা এক গ্রাম্য তরুণী। চেহারায় কোন বিশেষত্ব নেই।

—মা মারা গেল আমার ছেলে দাদু-দিদার কাছেই মানুষ হয়। বনবীর জানাল।

— কেন তোমার বাবা-মা ? নালন্দা অবাক।

—তারা এই বিয়েটা মেনে নেননি।

নালন্দা কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

—বাবা বেঁচে থাকতেই আমার ছেলে আত্মপরিচয় নিয়ে একদিন হাজির হয়েছিল আমার শহরের বাড়ি । আর আশ্চর্য কি জান, ওরা ওকে সাদরে গ্রহণ করেছে ।

—তুমি আর ফিরে যাওনি তাদের কাছে?

বনবীর নিরুত্তর থাকে।

—শহরের বাড়িতে কারা আছেন ?

— মা, ছোট ভাই, তার বৌ ছেলেমেয়ে। শহরে কাজে গেল আমার ছেলেও সেখানে গিয়ে থাকে।

এসময় একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক চায়ের কাপ প্লেট হাতে করে ঢুকে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হেসে নালন্দার দিকে তাকালো।

বনবীর বললো—আমার ছেলে অরণ্য।

নালন্দা ভালো করে তাকালো অরণ্যের দিকে।

বনবীরের ছেলে তার মত অপরিচ্ছন্ন নয়। পরিষ্কার স্যান্ডো গেঞ্জি লুঙ্গি পরনে। চোখ দু'টি খুব উজ্জ্বল ও বড়। শেভ করা গালে পাতলা নীলচে মেঘের আস্তরণের মত দাঁড়ির আভাস ।

— তুমি চা করে আনলে ? ... তোমাদের কাজের লোক কোথায় ?

—আসলে আমাদের কাজের মেয়েটি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ । জ্বরে ভুগছে।

— তাহলে রান্না-বান্না ?

—আমিই করব। আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি।

অরণ্য আর দাঁড়ায় না, ঘরের বাইরে চলে গেল।

— তোমার ছেলে কি করে ? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে নালন্দা।

— চাকরি বাকরির কথা বলছো ? কিচ্ছু করে না।

— বেকার ? লেখাপড়া ?

— সেই অর্থে ফর্ম্যাল এডুকেশন ও নেয়নি, মানে নেওয়াইনি। ওর শিক্ষা প্রকৃতির কাছ থেকে —সেই যে কবিতায় আছে না ?

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল নালন্দা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে ভুলে যায়।

বনবীর নালন্দার বিস্ময় উপভোগ করতে করতে বলতে থাকে— তথাকথিত শিক্ষিত না করে ওকে প্রকৃত মানুষ করার চেষ্টা করেছি।

ও পরোপকারী । বাগানের আশেপাশের লোকের সবার বিপদে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ ছাড়া ওদের ডাক্তার ও সে।

— ডাক্তার!

—হ্যাঁ। রাবার বাগানের কাছেই একটা জঙ্গল, সেখানে নানা রকম বনাজি ওষুধিগাছ আছে। সেখান থেকে জরিবুটি সংগ্রহ করে ছোটখাটো রোগ সারানোর অষুধ দেয় । অনেক সময় রোগ সারেও। আমাদের কাজের মেয়েটিকে ও-ই অষুধ দিচ্ছে। নালন্দা চা খাওয়া শেষ করে কাপটা প্লেটের উপর রাখে।

— তুমি বিস্কুট খেলে না ? বনবীর জিজ্ঞেস করে;

চায়ের সঙ্গে দু টো দুটো বিস্কুটও ছিল।

নালন্দা বলে— ইচ্ছে করছে না। আমি বাড়ি থেকে ব্রেক ফাস্ট করে এসেছি।

— বাবা, আমি যাচ্ছি, কাল ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে।

অরণ্যের কথায় চটকা ভাঙ্গে নালন্দা ও বনবীরের।

শহরে কতগুলো কাজ জমে আছে অরণ্যের । যে প্রতিষ্ঠান ওদের তরল রাবার কেনে, তার কাছে ওদের কিছু পেমেন্ট আটকে আছে।

বিশেষ করে এই জন্যই যে শহরে যাচ্ছে।

শহরে নিজেদের বাড়িতে রাতটা কাটাবে।

বাগান তখন সম্পূর্ণ অন্ধকারের দখলে।

মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে নালন্দা ও বনবীর বাংলোয় ফিরে এল। অরণ্য চলে গেল শহরের দিকে।

২

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না নালন্দার। এই রকম একটা জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। সকালে এসে বিকেলেই চলে যাবে ভেবেছিল নালন্দা। কিন্তু বনবীরের সঙ্গে বিকেলে বেরিয়ে বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। তাছাড়া বনবীরের রাবার বাগানের গাছগুলো যেন শাখা-প্রশাখা সমেত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ওকে। রাতটা কাটিয়ে যেতে বনবীরের পীড়াপীড়ি ত ছিলই। সুতরাং রাতটা এখানে কাটিয়ে যাওয়াই মনস্থ করে নালন্দা। মুঠোফোনে বাড়িতে জানাতেই দাদা— হাঁ-হাঁ করে উঠল!

নালন্দা ওকে আশ্বস্ত করে— চিন্তার কিছু নেই দাদা। বনবীরকে আমি জানি।

কাল সকালেই চলে যাবে ও।

হঠাৎ শয্যা থেকে উঠে পড়ে নালন্দা। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। জোরে হাওয়া বইছে। রাবার বাগানের মাথার উপর আধখানা চাঁদ। সেই আধখানা চাঁদের আদরেই যেন বাগানের রাবার গাছগুলো আহ্লাদে আটখানা। হাওয়ায় মাথা নাড়ছে। বাগানের ভিতর গাছপালার ফাঁকে আলো আঁধারের কারুকাজ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বুকের ভেতর রাবার গাছের হাতছানি অনুভব করে নালন্দা। পায়ে পায়ে নেমে আসে বারান্দা থেকে। তারপর হাঁটতে লাগলো বাগানের দিকে। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...।

হাঁটতে হাঁটতে বাগানের ভেতর অনেক দুর এসে পড়েছে নালন্দা। আশ্চর্য ওর একটুও ভয় করছে না। বাগানের গাছগুলো যেন তার প্রহরী। নালন্দা একটা রাবার গাছের তলায় ধপ করে বসে পড়ে। তারপর এক সময় দুহাত ছড়িয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। মাথার উপরে গাছের পাতার ফাঁক ফোকরে খণ্ড খণ্ড আকাশ। বন কাঁপানো উত্তাল হাওয়ায় আরামে চোখ বুজে আসে ওর।

বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারেনি বনবীরও। কত কি ভাবছিল। তারপর এক সময় উঠে পড়ে দরজা খুলতেই বনবীরের চোখে পড়েছিল, নিশি পাওয়ার মত একটা ঘেরের মধ্যে বাগানের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে নালন্দা। কি ভেবে সপ্তপর্ণে বনবীরও পিছু নেয় ওর। হাঁটতে হাঁটতে বনবীর একসময় দেখে মাটিতে শুয়ে পড়েছে নালন্দা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনবীর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁটতে শুরু করে নালন্দার দিকে।

হঠাৎ সেই চেনা বোঁটকা বাঘের গায়ের গন্ধে নালন্দার শরীর কেঁপে উঠল। চোখ না খুলেই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে।

পায়ে পায়ে নালন্দার কাছে এসে দাঁড়ায় বনবীর। তাকিয়ে থাকে নালন্দার মুখের দিকে। বন পরিক্রমার শেষে যেন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন বনদেবী।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নালন্দার শিয়রের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বনবীর। নালন্দার শরীরের দু'দিকে দু'হাতের ভর দিয়ে ওর মুখটা ঝুলিয়ে রাখে নালন্দার মুখের উপর। বনবীরের নিঃশ্বাসের গরম হাল্কায় ঝলসে যাচ্ছে ওর মুখ। বাঘের মুখের মতই বনবীরের দাঁড়ি গোঁফ সমেত মুখের একটা বিকট গন্ধ ভক করে এসে নাকে লাগলো নালন্দার। কিন্তু কই — একটুও ত ঘেন্না হচ্ছে না নালন্দার। ওর বুকের ভিতর যেন সহস্র ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের অভিঘাত। দাপুটে হাওয়ার প্রবাহেও কুল কুল ঘামছিল নালন্দা।

কি ভেবে বনবীর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে চলতে শুরু করতেই আচমকা গুলির শব্দের মতই ধ্বনিত হয়ে উঠে নালন্দার স্বর— দাঁড়াও।

এই অরণ্যেরই যেন একটা বনস্পতি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনবীর। কঁকিয়ে উঠে বললো বনবীর আমাকে ক্ষমা কর। জঙ্গলে থাকতে থাকতে সত্যিই আমি একটা জানোয়ার হয়ে গেছি।

বনবীর আর দাঁড়াল না। একরকম ছুটেই আহত একটা বন্য জন্তু পালিয়ে গেল যেন। বনের ভেতর আবছা আলোয় পাথর প্রতিমার মত স্থির বসে নালন্দা। বনবীর ত জানলা না, চোখ বন্ধ করে মনের দরজাটা খোলাই রেখে ছিল এককালের তার পুজোর দেবী।

আশেপাশে বাঘের গায়ের সেই বোঁটকা গন্ধটা তখনো ভাসছে। প্রাণভরে সেই গন্ধ নাকে টানল নালন্দা।

হরিপদর বাড়িটা যেন পক্ষীনিবাস। দিনভর কত রকমের পাখির ডাক যে শুনতে পান সত্যকিঙ্কর। পাখির ডাকেই ঘুম ভাঙে তার। তরজার ঘরের বেড়ার ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢোকা আলো ফিকে করে দেয় ঘরের আঁধার। বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে শুয়েই বাইরে হরিপদ ও তার বৌর হাঁকডাক শুনতে পান। হরিপদ গোয়াল থেকে গরু বের করে মাঠে বেঁধে আসবে, হরিপদর বৌ খাঁচা থেকে হাঁস মুক্ত করছে। প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসগুলো ছুটছে পুকুরের দিকে। হরিপদের গরুর খাঁটি দুধ, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের সতেজ শাক-সবজি খেয়ে দেহের পরিচর্যা ত হলই, হরিপদের গায়ের আকাশ বাতাস পাখির ডাকেও তার মনের মালিন্য

দূরীভূত হল। সত্যকিঙ্কর নিজেকে এখন অনেক শক্ত সমর্থ ভাবছেন। গাঁ-কে নিয়ে হরিপদের আদিখ্যেতার অন্ত নেই। তার গাঁয়ের মত এত সুন্দর পরিবেশ কোথাও নেই। তার গায়ের আকাশ বাতাস নদী পশুপাখি সবই স্পেশাল। একদিন ত হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে গিয়ে বলেছিল—স্যার, এমন নদী কি আপনি আর দেখেছেন!

সত্যকিঙ্কর মনে মনে হেসে বাঁচেন না। বিশেষত্বহীন এবং সাধারণ গ্রাম্য ছোট নদী। জলের ভাগ কম, বালিই বেশি। দূরে একটা ভাঙা নৌকা মুখ গুঁজে পড়ে আছে বালিতে। একদিন ত হরিপদ রাতে খাওয়ার পর সত্যকিঙ্করকে বাড়ির কাছে একটা ফাঁকা মাঠে দাঁড় করিয়ে মাথার উপরের তারা ভরা আকাশের দিকে দৃষ্ট আকর্ষণ করে বললো—স্যার, আকাশটা দেখুন, তারাগুলো কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। এমন রাতের আকাশ আপনি আর কোথাও পাবেন না!

অন্ধকার, চারদিক নিঝুম। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। হরিপদর কথা মত চোখ তুলে মাথার উপর আকাশের দিকে তাকালেন সত্যকিঙ্কর। রাতের কালো আকাশে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারকা। সার্চলাইটের মত দৃষ্টি বালাতে লাগলেন আকাশের গায়ে। দেখতে দেখতে সত্যকিঙ্করের মনে হল জ্বলজ্বলে সেই নক্ষত্রমণ্ডলী যেন হাতছানি দিয়ে তাকে উর্ধাকাশে আহ্বান করছে। শরীরে একটা শিরশিরানি অনুভব করলেন। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠালো। খামচে ধরলেন পাশে দাঁড়ানো হরিপদর কাঁধ। হরিপদ চমকে উঠে বলেন—স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

সত্যকিঙ্কর মাথা নেড়ে অসফুট স্বরে বললো— না। ঘরে এসে সত্যকিঙ্কর এক গ্লাস জল খেলেন। হরিপদর উৎকণ্ঠা যায় না।

—স্যার, চলুন। একবার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখিয়ে আসবেন।

— না, না, আমি ঠিক আছি। হরিপদকে দৃঢ় স্বরে আশ্বস্ত করেন সত্যকিঙ্কর।

হরিপদ সত্যকিঙ্করের খাস বেয়ারা। ভাগ্যিস, সেদিন হরিপদ ধারেকাছে ছিল।

অফিস ছুটি হওয়ার মুখে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সত্যকিঙ্কর। অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। চেয়ারে বসা, মাথাটা সামনের টেবিলে ঠেকানো, হাত দুটো টেবিলের উপর দুদিকে বিছিয়ে। ব্যাপারটা প্রথম হরিপদরই নজরে পড়ে। অনেক ডেকে সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে ডাকা-ডাকি করে অফিসের কয়েকজনকে জড়ো করে। তারপর তাদের সাহায্যে হরিপদই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সে যাত্রা কদিন হাসপাতালে কাটাতে হয় সত্যকিঙ্করকে। ডাক্তারের ধারণা অত্যধিক পরিশ্রমে এমন হয়েছ। বেশ কিছু দিনের বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। বিপদে না এলেই নয় গোছের সত্যকিঙ্করের গুটি- কতক আত্মীয়-স্বজনের দেখা মিলেছিল, কিন্তু তাদেরও

গা ছাড়া মনোভাব দেখে হরিপদকেই অফিস হাসপাতাল দৌড়ঝাপ করতে হয়েছিল বেশি। সুস্থ হয়ে সত্যকিঙ্কর ফ্ল্যাটে ফিরলে হরিপদ একটু স্বস্তি পায়। সত্যকিঙ্করের দেখভাল করার জন্য বাড়িতে একটি নার্স রাখা হয়েছে।

একদিন অফিস ফেরত ভিজিটে সত্যকিঙ্করের ফ্ল্যাটে এসে হরিপদ তার শোবার ঘরে ঢুকে দেখলো, তার স্যার, দেয়ালে মৃতা স্ত্রীর ছবির দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন।

— স্যার! হরিপদের ডাকে সম্বিৎ ফিরে সত্যকিঙ্কর হরিপদের দিকে তাকান।

সামনে একটা টুলে বসতে ইশারা করে বললেন— বুঝলি হরিপদ, ভাবছি কিছু দিনের জন্য কোথাও হাওয়া বদল করে আসব।

— স্যার, আপনি একা কি করে যাবেন? আপনার ছেলে এলে না হয়... তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? হরিপদ জানে সত্যকিঙ্করের ইঞ্জিনীয়ার ছেলে আমেরিকায় থাকে। একটি বিদেশিনীকে বিয়েও করেছে। প্রথম প্রথম এ জন্যে স্যার চোটপাট করলেও, সময়ে সব থিতিয়ে এসেছে।

সত্যকিঙ্করের অসুখের সময় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

— হ্যাঁ রে, কথা হয়েছে তার সঙ্গে। আমার অসুখের সময় ওর মোবাইল নষ্ট ছিল, তাই যোগাযোগ করা যায়নি। একটু থেমে বললেন—সুগত বলেছে, আমার রিটায়ারের পরে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে এখনকার পাট চুকিয়ে।

— এই দেশ, আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাবেন! হরিপদের মন খারাপ হয়ে যায়।

— একমাত্র ছেলে আমার, ছেলের কাছে থাকতে আমারও ত মন চায়।

হরিপদ মনে মনে হিসাব করে, সত্যকিঙ্কর অবসর নেবেন আগামী মাসে। পেনশান নিয়মিত হতে মাস চারেক লাগবে। সুতরাং আরও মাস ছয়েক সত্যকিঙ্করের সান্নিধ্য পাবে।

কি ভেবে হরিপদ হঠাৎ বলে—স্যার, আপনি চেঞ্জে যাবার কথা বলছিলেন না? আপনি এক জায়গায় যেতে পারেন। আপনার খুব ভাল লাগবে।

— কোথায় রে?

— আমাদের গাঁয়ে, আমার বাড়ি। এমন সুন্দর গাঁ আপনি আর কোথাও পাবেন না। তার গাছপালা নদী নীল আকাশ মুক্ত বাতাস আপনার শরীর মন ভাল করে দেবে। হরিপদ সত্যকিঙ্করকে প্রলুব্ধ করে।

সেই প্রলোভনে পড়ে সত্যকিঙ্কর নিম রাজি হয়ে যান। একদিন সত্যিই পা রাখেন হরিপদের গাঁয়ে।

হরিপদ বেয়ারা হলেও, ওর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, জমি জমা বাড়ি- পুকুর দুধেল আর হালের গরু। কিছু সম্পত্তি পৈতৃক, কিছুটা হরিপদ নিজে বাড়িয়েছে। অফিসের মাসিক বেতন ত খাড়াই আছে। তাছাড়া হরিপদর এক্সট্রা ইনকামও আছে। গাঁয়ের লোককে সে কবজ

মাদুলি দেয়, ঝাড়ফুঁক তুকতাকও জানে। হরিপদের নিজের হাতের কাব্জিতেও ছোট ডুগডুগির মত এক মাদুলি বাঁধা। সকালে অফিসে যাওয়ার আগে এবং অফিস থেকে ফিরে হরিপদ খালি গায়ে লুঙ্গি পরে—বারান্দায় একটা সোফায় বসে, তার মক্কেলদের সামলায়। নীল লুঙ্গির শাসন না মানা হরিপদের উপচানো ভুঁড়ির কোলের উপর ঢলঢল করে।

সত্যকিঙ্কর সন্দেহের বশে একদিন জিজ্ঞেস করেন, তুই কি সত্যিই এসব জনিস? ঝাড়ফুঁক, তুকতাক... কবজ মাদুলি?

হরিপদ জিভ কেটে বলে— আপনার কাছে মিথ্যে বলব না স্যার। আমি কিছুই জানি না, শুধু ভুজং ভাজুং দিয়ে চলি।

— তা হলে এদের ঠকাস্ কেন?

— ওরা যদি নিজেরা ঠকতে চায় কে আটকাবে ?

— তার মানে?

— আসলে এসব আমার বাবা খুব ভাল জানত। বাবার মৃত্যুর পর ওরা আমাকে এসে ধরল। আমি যত বলি বাবার কাছ থেকে কিছু শিখিনি। ওরা বিশ্বাস করে না, শেষে ভাবলাম মন্দ কি! ফোকটে দুটো পয়সা রোজগার হবে। আন্দাজের গুলি দু-একটা লেগেও যায় বৈকি! তখন ওদের বিশ্বাস আরো বাড়ে।

সত্যকিঙ্কর আর কিছু বলেন না। তিনি বোঝেন হরিপদ খুব ঘোড়েল আদমি। এসব উপরি রোজগার ছাড়াও হরিপদ সুদে টাকা খাটায়। নিজের অফিসেও সত্যকিঙ্কর কানা ঘুষোয় শুনেছেন। দু একজন অফিসারও ঠেকা-বেঠেকায় ওর কাছে হাত পাতে। গ্রামে হরিপদের বাড়ি সত্যকঙ্করের দিনগুলো মসৃণ কেটে যায়। দুপুরে খাওয়ার পর লম্বা ঘুম, বিকেলে এদিক ওদিক একটু হাঁটা-হাঁটি। হরিপদের বাবার ঘরেই সত্যকিঙ্করের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

হরিপদ তোলা জলে তার স্নানের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু সত্যকিঙ্কর অনেকদিন ডুব দিয়ে স্নান করেননি। তাই শানবাঁধানো ঘাটের পুকুরে নেমে স্নানটা সারেন। পায়খানাটারই যা একটু অসুবিধা। গ্রামের বাড়ি যা হয়। পায়খানাটা একটু দূরে পুকুরের এক কোণায়। প্রথম প্রথম হরিপদ সঙ্গেই থাকত। পরে নিজেই একা যান। তারপর শৌচের জল রেডি রাখে হরিপদের বৌ এবং তার স্কুলে পড়া ছেলে।

হরিপদের ঘর গৃহস্থালির টুকটাক কিছু দৃশ্য সত্যকিঙ্করের মনে গেঁথে যায়। সকালবেলা হাঁটুতে বালতি চেপে গরুরবাট থেকে চ্যানচুন হরিপরদের দু'হাতে দুধ দোয়া। সন্ধ্যায় ঘোমটা টেনে হরিপদর বৌর উলুধ্বনিসহ তুলসিতলায় প্রদীপ দেখানো। ঘরের মেঝেতে আসন পেতে দুপুরবেলা সত্যকিঙ্করকে যত্নআত্তি করে হরিপদের বৌর খাওয়ানো। দুপুরে অলসগতিতে পুকুরে হাঁসের সাঁতার কাটা। এই সব দৃশ্য মূল্যবান সঞ্চয়ের মত সত্যকিঙ্করের হৃদয়ে জমা হয়ে যায়। প্রায় দিন পনর হরিপদর বাড়ি কাটিয়ে শহরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন

সত্যকিঙ্কর। ফিরে আসার সময় হরিপদর হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিতে চান। দপ্ করে আলো নিবে যায় হরিপদর মুখে— আপনি কি করে ভাবলেন স্যার, আমি টাকা নেবো! 'ছিঃ ছিঃ' শব্দটা আর মুখে উচ্চারণ করল না।

বাড়ি ফিরে তার চাকরি জীবনের শেষ দিনটিতে অফিসে জয়েন করেন সত্যকিঙ্কর।

অবসর নেয়ার ছ মাসের মধ্যে সত্যকিঙ্করের পেনশন নিয়মিত হল। যথা সময়ে তার ছেলে সুগত আমেরিকা থেকে বাড়ি এল। একা। সত্যকিঙ্কর অবাক— বৌমা কোথায়?

সুগত বললো, দেখলে না, সে বার মায়ের মৃত্যুর সময় এসে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। আসলে ইন্ডিয়ার ওয়েদারটা ওর সহ্য হয় না।

মোবাইলে স্যারের কাছ থেকে খবর পেয়ে হরিপদ একদিন দেখা করতে এল। সত্যকিঙ্করের ছেলে কেতাদুরস্ত ভাষায় হরিপদের হাত জড়িয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, সে অসুস্থ বাবর পাশে ছিল বলে।

— আপনার জন্য একটা গিফট এনেছি। সুগত হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ফিরে আসে ছোট একটা পারফিউমের শিশি নিয়ে — এই নিন।

কথা হচ্ছিল সত্যকিঙ্করের বাবার ঘরে। সত্যকিঙ্কর বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন।

বললেন—নিয়ে নে হরিপদ, আমরা যখন এখানে থাকবো না? এই পারফিুমের সুগন্ধ তোকে আমাদের কথা মনে পাড়িয়ে দেবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিপদ উপহারটা গ্রহণ করে।

— স্যার, আপনারা চলে গেলে এই ফ্ল্যাটটার কি হবে?

— সুগত এটা বিক্রি কর দিতে চায়। সত্যকিঙ্কর সোজা হয়ে বসলেন। তোর কি কোন দালালের খোঁজ আছে যে, বাড়িটা তাড়াতাড়ি বিক্রি করে দিতে পারবে?

হরিপদ বলে—স্যার, ভাল করে ভেবে দেখুন, এখনই তা বিক্রি করবেন কি না।

সুগত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠে—আর ভাবাভাবির কি আছে ভাই। আমরা চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি, এদেশে আর ঝামেলা রেখে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

সত্যি হরিপদের খোঁজ দেয়া এক দালালের মাধ্যমে বেশ ভাল দামেই ফ্ল্যাটটা বিক্রি হয়ে যায়। তাও মাস খানেক লেগে যায়।

এর কিছু দিন পর হরিপদ খবর নিতে এল, সত্যকিঙ্করের বিদেশ যাওয়ার কি হল।

ঘরে ঢুকে হরিপদ দেখে, স্ত্রীর ছবি হাতে খাটে বসে , স্ত্রীর ছবিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে সত্যকিঙ্কর। চোখের কোণে বুঝি উপছে পড়ছে জল।

মেঝেতে সত্যকিঙ্করের জিনিসপত্র ভরা গোছানো দুটি ব্যাগ।

— স্যার, আপনি তা হলে সত্যিই চলে যাচ্ছেন ? হরিপদের প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা !

জলে ভরা দুচোখ তুলে সত্যকিঙ্কর বলেন—না রে, আমি দেশেই থেকে যাব।

— তবে ? ব্যাগ দুটির দিকে তাকায়।

—সুগত কাল চলে যাবে। আমি এক বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করেছি। আজই চলে যাব। তুই এসেছিস ভালই হল।

হরিপদ যা বোঝার বুঝল। আসলে এই ফ্ল্যাটটার মতই বৃদ্ধ অসহায় বাপকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে ছেলে।

এমন সময় ব্যস্ত হয়ে সুগত ঘরে ঢুকে হরিপদকে দেখে বললো—একটা ট্যাক্সি ডেকে আনত ভাই ? বলে বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানাটা বলে দিল। হরিপদ স্তাম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুগতর কথার অভিঘাতে দুড়দাড় ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিচে নেমে এল।

খুব যত্নআত্তি করে বাবাকে ধরে উপর থেকে নিচে নামিয়ে ট্যাক্সিতে বসাল সুগত। সে বাবার পাশেই পিছনের সিটে বসেছে। হরিপদ সত্যকিঙ্করের ব্যাগ দুটো ডিকিতে রেখে, সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসল। গাড়ি ছুটল গন্তব্যের দিকে। কিছুদূর যেতেই সুগত হঠাৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলে—এই যে ড্রাইভার, কি হচ্ছে, গাড়ি ত দেখছি ভুল পথে যাচ্ছে ?

ঘাড় ঘুরিয়ে সুগতর চোখে চোখ রেখে হরিপদ দৃঢ় স্বরে বললো—গাড়ি ঠিক পথেই চলছে, স্যারকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বৃদ্ধাশ্রম থেকেও একটা বেশভাল জায়গায়, যেখানে ঘরোয়া পরিবেশে বাকি জীবনটা স্যার আরামেই কাটাবেন।

চুনী দাশ

শুভংকরের ফাঁকি

বাবা, বাবা, এস সি ভাইবোনদের কোন কাজেই লাগলাম না! জয়েন্ট এনট্রান্সে যখন জেনারেল মেরিট লিস্টের মেডিক্যাল গ্রুপে সেকেন্ড পজিশান পেয়েছি, ভেবেছিলাম, এবার এস সি দের একটা মেডিক্যাল সিট বাড়বে। কিন্তু নাঃ, সে গুড়ে বালি! সে আর হল না! সুমনা অত্যন্ত আক্ষেপ করে ওর বাবাকে বলল।

কেন, কী হয়েছে, মা? সুমনার বাবা জিগ্যেস করলেন।

আমি যেমন হায়ার সেকেন্ডারির ফাইন্যাল পরীক্ষায় ছেলে-মেয়ে সবার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, তেমনি জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায়ও পি সি বি (ফিজিক্স, কেমিস্টি, বায়োলজি) মানে মেডিক্যাল গ্রুপে জেনারেল মেরিট লিস্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। তাই ভেবেছিলাম, আমি তো জেনারেল কোটা থেকেই মেডিক্যাল সিট পাচ্ছি। কাজেই এস সি দের এবার মেডিক্যালে একটা সিট বাড়ল। অবশ্য, নিয়ম অনুসারে মেডিক্যালে এবার এস সিদের আরও বেশ কয়েকটা সিটই বাড়ার কথা ছিল।

এস সি দের মেডিক্যাল সিট বাড়বে কেন রে? বাবা জিগ্যেস করলেন।

তাহলে ব্যাপারটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলি। মনে কর, এবার মোট কুড়িটা মেডিক্যাল সিট কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করেছে। তাহলে হানড্রেড-পয়েন্ট রোস্টার অনুযায়ী কুড়িটা সিটের মধ্যে এস সি দের জন্য সিট হবে তিনটি, এস টি দের জন্য হবে চারটি এবং সাধারণ, মানে জেনারেল ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীদের জন্যে হবে ২০— (৩+৪) =১৩ তেরটি।

নিয়ম অনুযায়ী মেরিট অনুসারে জেনারেল মেরিট লিস্ট থেকে সব ছাত্রছাত্রীই সিট পাবার নায্য অধিকারী। সেখানে এস সি, এস টি এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কোন বাছবিচার নেই।

এবার কুড়ি নম্বর পর্যন্ত জেনারেল মেরিট লিস্টের মধ্যে ২ নম্বর, ১০ নম্বর, ১৯ নম্বর দখল করেছে এস সি ছাত্রছাত্রীরা এবং ১৫ নম্বর, ২০ নম্বর দখল করেছে এস টি ছাত্রছাত্রীরা কাজেই (৩+২) = ৫ এই পাঁচটি মেডিক্যাল সিট পাবে মেরিট অনুসারে এস সি ও এস টি ছাত্রছাত্রীরা। সুতরাং এস সি দের ৩টি ও এস টি দের ২টি সিট বাড়ার কথা ছিল। অর্থাৎ এস সি দের মোট (৩+৩) = ৬ টি মেডিক্যাল সিট এবং এস টি দের মোট (৪+২) = ৬টি মেডিক্যাল সিট নায্যত (আইনত) পাবার কথা ছিল। কিন্তু ওরা ওদের নায্যদাবি থেকে বঞ্চিত হল, মানে প্রতারিত হল। সুমনা দুঃখের সঙ্গে ওর বাবাকে বলল।

এস সি এবং এস টি ছাত্রছাত্রীরা কেন এবং কীভাবে বঞ্চিত হল ? সুমনার বাবা ফের জিগ্যেস করলেন।

কাউনসেলিংয়ের মিটিংয়ের শুরুতেই একজন কাউনসেলার অত্যন্ত সহানুভুতির সঙ্গে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার শেষে ঘোষণা করলেন যে, এস সি , এস টি দের সর্বত্রই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার জন্য সরকারি সুব্যবস্থা রয়েছে। তাই এখানেও প্রার্থী নির্বাচনে আমরা এস টি দের প্রথম তিনটে মেডিক্যাল সিট দেব, তারপর এস সি দের তিনটে মেডিক্যাল সিট দেব এবং সর্বশেষে সাধারণ ক্যাটেগরির ছয়জনকে মেডিক্যাল সিট দেব।

ঘোষণা শুনে কাউনসেলিংয়ের সভায় উপস্থিত এস সি , এস টি ছাত্রছাত্রী ও ওদের অভিভাবকগণ তো খুশিতে উৎফুল্ল, আনন্দে ডগমগ। আমিও প্রথমে বেজায় খুশি হয়েছিলাম। ঘোষণা অনুসারে এস টি মেরিট লিস্ট থেকে তিনজন এস টি ছাত্রছাত্রীকে তিনটে মেডিক্যাল সিট দেওয়া হল। তারপর এস সি মেরিট লিস্ট থেকে তিনজন এস সি ছাত্রছাত্রীকে তিনটে মেডিক্যাল দেওয়া হল।

জয়েন্ট এনট্রাস পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রসঙ্গত বলি জেনারেল মেরিট লিস্ট, এস সি মেরিট লিস্ট এবং এস টি মেরিট লিস্ট — এই তিনটি মেরিট লিস্ট আলাদা আলাদা একই বুকলেটে এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় । তাই আমি জেনারেল মেরিট লিস্টে ২য় স্থানে আছি, আবার আমিই এস সি মেরিট লিস্টে ১ম স্থানেও আছি। তেমনি , যে জেনারেল মেরিট লিস্টে ১০ নম্বর, সে-ই এস সি মেরিট লিস্টে ২ নং এবং জেনারেল মেরিট লিস্টের ২০ নম্বরই এস সি মেরিট লিস্টে ৩ নম্বর।

৩ জন এস টি ও ৩ জন এস সিকে মেডিক্যাল সিট দেওয়ার পর ছয়জনকে জেনারেল মেরিট লিস্ট অনুসারে ৬টি মেডিক্যাল সিট দেওয়া শুরু হল। ১ম নম্বর জেনারেল মেরিট লিস্ট থেকে একজন ছাত্রকে ১টি মেডিক্যাল সিট দেওয়ার পর, আমার নাম ২ নম্বর জেনারেল মেরিট লিস্ট থেকে যেই না ডাকা হল, এমনি অন্য একজন কাউনসেলার ঘোষণা করলেন যে, সুমনা দাস ইতিপূর্বে এস সি মেরিট লিস্ট থেকে একটি মেডিক্যাল সিট নিয়ে গেছে। তাই পরবর্তী ৩ নম্বরকে মেডিক্যাল সিট দেওয়া হচ্ছে।

এই ঘোষণা শোনার পরই আমার সম্বিৎ ফিরল,

এ যে দেখি,
শুভঙ্করের ফাঁকি —
দুইশ' থেকে তিন 'স' গেলে
কত থাকে বাকি!

এইভাবে, তারপর, সব মেডিক্যাল সিট বন্টন করা হয়ে গেল। আমরা এস সি ও এস টি ছাত্রছাত্রীরা জেনারেল মেরিট লিস্টে ওপরের দিকে স্থান অধিকার করেও মেরিটের কোন দামই পেলাম না। আমাদের থেকে অনেক কম মেধার অধিকারী হয়েও সাধারণ ক্যাটেগরির ছাত্রছাত্রীরা অধিক মেধার মূল্য পেয়ে গেল। আমরা বঞ্চিতই রয়ে গেলাম, বাবা!

তাহলে, এই একই পদ্ধতিতে কি প্রতিবছরই এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে? এতো দেখি মহাপ্রবঞ্চনা! জ্ঞাতসারে প্রতারণা! সুমনার বাবা খেদ করে বললেন।

নিশ্চয়। এবার যখন হয়েছে, প্রতিবছরই তাহলে তা হয়ে আসছে। কারণ কথায় আছে, লয়ের কামে ভয় নাই। প্রথমবার প্রবঞ্চিত, প্রতারিত করার পরও যখন এস সি, এস টি দের তরফ থেকে কেউই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি, তখন প্রতারক বা প্রবঞ্চকদের সাহস অনেক গুণ বেড়ে গেল। চতুররা ভেবে নিল, এস সি, এস টি দের মধ্যে 'শুভঙ্করের ফাঁকি' ধরার মতো কারো ঘিলুই নেই! সুমনা অনুতাপের সঙ্গে বলল।

কাউনসেলিংয়ে তো এস সি, এস টি দের প্রতিনিধিও থাকেন? ওঁরা তো যথেষ্ট শিক্ষিত। ওঁরাও কি তা বুঝতে পারছেন না! বাবা অবাক সুরে বললেন।

গোটা ত্রিপুরার এস সি, এস টি দের কেউ যখন এই ধাপ্পা ধরতে পারছেন না, তবে আর ওদের দোষ দিয়ে লাভ কী। ওরা তো ত্রিপুরারই এস সি, এস টি দের মধ্যে আছেন। তাছাড়া নকল এস সি, এস টি হলে তো কথাই নেই! ত্রিপুরা তো নকল এস সি, এস টিতে ছয়লাপ। ধরা পড়লেও শাস্তি হয় না। পার্থ দাসের সহোদর বড়ভাই নকল এস সি প্রমাণিত হওয়ায় চাকরি খুইয়েছেন অথচ পার্থ দাস এস সি কোটায় এম, এল, এ হয়ে দিব্যি বহালতবিয়তে আছেন। ত্রিপুরা বিধানসভার শ্রীবৃদ্ধি করছেন।

এই যে বাবা তুমি, গোলবাজারের নামজাদা মাছের আড়তদার, রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী—বিশেষ করে তপসিলি নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে তো তোমার দহরম-মহরম, মোটা অঙ্কের আর্থিক সাহায্যের পৃষ্ঠপোষকও — তুমি কি এই শুভঙ্করের ফাঁকির কথা কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছে? কাজেই গড্ডালিকা প্রবাহ যেমন চলছে তেমনি চলতেই থাকবে, সুমনা হাতাশার সুরে বলল।

কেমন করে সিট বন্টন করা হলে এস সি, এস সি ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হবে না মনে করিস? সুনমার বাবা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন।

সে তো অতীব সোজা। একেবারেই জলের মতন। জেনারেল মেরিট লিস্ট থেকে প্রথমে মেরিট অনুসারে সব সিট বন্টন করে দিলেই তো লেটা চুকে যায়। প্রেফারেন্স এবং মেরিট অনুসারে মেডিক্যাল গ্রুপের বিভিন্ন শাখা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের বিভিন্ন শাখার সিট বন্টন করে দেওয়া শেষ হয়ে গেল, এস টি এবং এস সির মেরিট লিস্ট অনুসারে এস টি এবং এস সি ছাত্রছাত্রীকে সিট বন্টন করে দিলেই তো কেউ আর বঞ্চিত হয় না। অবশেষে, নিয়ম

অনুসারে এস সি যোগ্যপ্রার্থী না থাকলে এস টি এবং এস টি যোগ্যপ্রার্থী না থাকলে এস সি যোগ্যপ্রার্থীর মধ্যে অবন্টিত সিটগুলো বন্টন করে দিলেই হল। তারপরও যদি কিছু সিট থেকে যায়, তখন তা অনায়াসে সাধারণ ক্যাটেগরির যোগ্যপ্রার্থীদের মধ্যে বন্ট করা যেতে পারে।

এস সি বা এস টি ছাত্রছাত্রীরা যদি জেনারেল বা সাধারণ মেরিট লিস্ট থকে সিট নিয়ে যায়, কিন্তু সেই ছাত্র বা ছাত্রীর যদি পছন্দের সিটটি এস সি বা এস টি মেরিট লিস্টে থাকে, তখন তো সে আর ওর পছন্দের সিটটি পাবে না? সুমনার বাবা প্রশ্ন করলেন।

কেন পাবে না? পেতে অসুবিধে কোথায়? কোন এস সি বা এস টির পছন্দের সিটটি যদি যথাক্রমে এস সি বা এস টির মেরিট লিস্টে থাকে, তখন সে তা জেনারেল লিস্ট থেকে পাওয়া সিটটি এস সি বা এস টির মেরিট লিস্টের সঙ্গে অদল-বদল করে নেবে! তাহলেই তো হয়। অর্থাৎ জেনারেল মেরিট লিস্ট থেকে পাওয়া সিটটা এস সি বা এস টি মেরিট সিটে জমা দিয়ে ওর সেই পছন্দের সিটটা নিলেই আর এস সি বা এস টির সিট সংখ্যা কমবে না। তখন মেধার ভিত্তিতে পাওয়া সিটগুলো এস সি বা এস টির নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে যোগ হবে। অর্থাৎ বাড়বে। সুমনা ওর বাবাকে বুঝিয়ে বলল।

তাহলে তো দেখি, সত্যি সত্যি এস সি, এস টি ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে! তাহলে, এখন উপায়? বাবা বললেন।

উপায় একটা নিশ্চয় হবেই হবে। তপসিলভুক্ত জাতির মন্ত্রীকে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এস সি ছাত্রী হয়ে আমি হায়ারসেকেন্ডারি ফাইন্যাল পরীক্ষায় ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তিনি খুশি হয়ে তোমাকে ফোন করেছিলেন এবং আমাকেও অভিনন্দিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে একদিন দেখা করতেও তিনি আমাকে বলেছিলেন। এছাড়া উনি তো রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও। সুমনা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস, মা। উনি আমাদের ডাকসাইটে মন্ত্রীও বটেন। ওঁর মতন এমন বিচক্ষণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী তপসিলিদের ভাগ্যে আর কখনো জুটেনি। মা, কাল সকালই যা। আমিও কি তোর সঙ্গে যাব? বাবা বললেন।

না, না, তোমাকে যেতে হবে না, আমি একাই গিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারব।

পরের দিন সুমনাকে রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে ওর বাবা সেদিন প্রতিদিনকার মতন সকালবেলা মাছের আড়তে আর গেলেন না। সুমনার ফিরে আসার পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর সুমনার ফিরে আসার শব্দ পেতেই তড়িঘড়ি সুমনার কাছে তিনি এগিয়ে

গেলেন।

সুমনার মুখমণ্ডল যেন কালমেঘে ছাওয়া । বিষণ্ণ মলিন। সুমনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে অসহায়ের মতন বললে, নাঃ বাবা, হল না! অ-নেক চেষ্টা করেও মন্ত্রীবাহাদুরকে এ ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও বোঝাতে পারলাম না! সত্যি ,আমাদের তপসিলিদের বড়ই দুর্ভাগ্য।

ক্ষণিকের অতিথি

আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ। ঘননীল মিষ্টি আকাশ। ইতিউতি থোকা থোকা পেঁজাতুলো মেঘ। শরৎকাল। সন্ধের আঁধার নামতে না নামতেই শিউলি ফুলের কলিরা একটু একটু করে পাপড়ি মেলতে শুরু করল। চারদিক শিউলি ফুলের মনমাতানো গন্ধে ম-ম করতে লাগল। শিউলির পাপড়িতে কণা কণা শিশির জমতে আরম্ভ করল। শিউলিগাছের পাতায় পাতায়ও সেই সঙ্গে শিশির কণা জমতে শুরু করল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়ছে। গভীর হচ্ছে। শিউলি ফুল একটু একটু করে পাপড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। শিউলির পাপড়িগুলো ধবধবে শাদা। বোঁটা লালচে হলুদ। ওর যেমন মিষ্টি গন্ধ—দেখতেও ও তেমনি ভারি মিষ্টি।

এরমধ্যে পাপড়িগুলোতে শিশির কণা জমে জমে বেশ বড়সড় ফোঁটর মতন দেখতে হয়েছে। জোছনার আলোয় সেই শিশিরের ফোঁটাগুলোকে হীরে-মুক্তোর মতন মনে হচ্ছে।

গাছের পাতায় পাতায়ও শিশির জমে জমে চাঁদের মধুর আলোয় ঝিকমিক করছে। যেন চাঁদের মতই মুখটিপে হাসছে।

তেমনি ক্ষণে, একটি শিউলি ফুলের একটি পাপড়ির মুক্তোর মতন একটা শিশির ফোঁটা ওর নিচের একটি পাতায় ঝুলন্ত একটি শিশির ফোঁটাকে বলছে, দেখো, দেখো, আমি কেমন সুন্দর একটি পাপড়ির মধ্যে হাওয়ায় দুলছি— দোল-দোল খেলছি! আর তুমি? আমারই পাপড়ির তলে আধো-আধো অন্ধকারে একটা বিবর্ণ পাতার আগায় কোনরকম লটপট করছ! কোথায় আমি, আর কোথায় হে তুমি! যেন রাজকুমারী আর ঘুঁটেকুড়োনি।

পাপড়ির শিশিরফোঁটার এই তাচ্ছিল্যভরা কটাক্ষ শুনে পাতার শিশিরফোঁটা মৃদু হেসে অতি ধীরস্থির শান্তমিষ্ট সুরে বলল, আমরা তো ভাই ক্ষণিকের অতিথি। যে যেখানে থাকি, যে যে-ঘরেই বসবাস করি ওকেই তো তার সাতমহলা প্রাসাদ ভেবে দিন কাটানো

উচিত। বৃথা দুঃখ করে মনোকষ্টে ভুগে ভুগে আনন্দ করার অমূল্য সময়টুকু ফুরিয়ে লাভ কী? কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের সাতমহলা প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুঃখকষ্ট শোকতাপে অশ্রুবিসর্জন করে ভাই কী লাভ, বলো?

কিন্তু এও তো ঠিক, কুঁড়ের বাসিন্দারাই নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঘামের বিনিময়ে এইসব সাতমহলা প্রাসাদ গড়ে এবং প্রাসাদের বাসিন্দাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপকরণ আহরণ করে করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। আহার যোগায়। এই যেমন আমি, যে সবুজ পাতায় মহানন্দে জোছনার মিষ্টি-মধুর আলোয়—মৃদুমন্দ হাওয়ায়—দুলছি—খেলছি—হাসছি—নাচছি—এই সবুজপাতাই তো আলোয় আলোয় সবার প্রাণবায়ু উৎপন্ন করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের পরিত্যক্ত বিষাক্ত নিঃশ্বাসবায়ু দিয়ে সবার খাদ্যবস্তু ও অম্লজান তৈরি করে। এই অম্লজানই তো উদ্ভিদ আর প্রাণীর প্রাণবায়ু। যার ফলে তরুলতাতৃণগুল্ম ও ওদের শাখাপ্রশাখা ফুলে ফলে সবুজ-সতেজ-সুন্দর সুগন্ধের অধিকারী হচ্ছে, শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে, আর পাপড়ি মেলে মেলে সৌরভ সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে।

কিন্তু এই ক্ষণিকের বাসস্থান নিয়ে আমাদের গর্ব করার কী-ই বা আছে! ভোরের সোনার রোদ্দুর ঝরতে না ঝরতেই তো আমরা হয় ঝরে পড়ে মাটিতে বিলীন হয়ে যাব, না হয় বাস্প হয়ে হাওয়ায় মিশে যাব। আমরা তো সবাই ক্ষণিকের অতিথি মাত্র!

ততক্ষণে পুবাকাশ আলোয় ভরে গেছে এবং চারদিকে সোনার রোদ্দুর ঝরতে শুরু করে দিয়েছে, আর এই শিশিরের ফোঁটা দুটিও ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিশে মিশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

একটি ফুলের কাহিনি

একটি ফুলের বাগান। গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ভোর হতে না হতেই অগণিত মৌমাছি ফড়িং ভ্রমর প্রজাপতি সেই ফুলের বাগানে এসে গানে গানে চারদিক মুখরিত করে রেখেছে। আর নেচে নেচে ফুলের মধু, ফুলের পরাগ সাধ মিটিয়ে খাচ্ছে এবং আহরণ করে করে নিয়ে যাচ্ছে। ফুলেরা সৌরভে সৌন্দর্যে ওদের আকৃষ্ট করে ডেকে ডেকে আনছে, আর মধু পরাগ বিলাচ্ছে। ভোরের স্নিগ্ধ মিষ্টি বাতাসে, সোনার রোদ্দুরে মৌমাছি প্রজাপতি ফড়িং ভ্রমর ও ফুল— সবাই আনন্দে আত্মহারা, খুশিতে মাতোয়ারা।

কিন্তু সেই বাগানের একটি গাছের একটি ফুল সারাক্ষণ মুখগোমড়া হয়ে বসে আছে। নিজেকে অতি সাবধানে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে যাতে কেউ ওর মধু পরাগ লুটে

নিতে না পারে।

তাই না দেখে সেই গাছেরই অন্যান্য ফুলেরা ওকে বলল, সোনাবোন, লক্ষ্মীবোন, অমন করে মুখগোমড়া হয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখিসনে, লুকিয়ে রাখিসনে! তোর সৌরভ সৌন্দর্য বিলিয়ে দিতে ওদের সব্বাইকে ডাক। ওরা এসে তোর মধু পরাগ হেসে খেলে নেচে গেয়ে লুটেপুটে নিক। তখন দেখবি, তোর মধ্যে আরও মধু পরাগ উৎপন্ন হবে। তখন তোর সৌরভ সৌন্দর্য আরও বাড়বে, উপচে পড়বে ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তোর সেই সুমধুর সৌরভ হাওয়ায় মিশে মিশে সুদূরে খুশির ঢেউ তুলবে , উদ্ভিদ, প্রাণী সবার হৃদয় ভরে দেবে, প্রাণে প্রাণে দোলা দেবে—সবার মনে সবুজ সুন্দর ফুলময় খুশির স্বপন গড়বে।

তখন তুই আরও—আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবি! তোকে দেখতেও আরও সতেজ সুন্দর মিষ্টি রমণীয় লাগবে! বেলা বাড়ার সাথে সাথে তোকে তখন পরি-পরি দেখাবে!

কিন্তু বেলা পড়ার সাথে সাথে সব কিছুতেই ভাটা পড়তে থাকবে। তারপর শেষবেলা চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসতে থাকবে—মধু পরাগও শুকিয়ে যেতে থাকবে—বুকও শূন্য হয়ে যেতে থাকবে — মৌমাছি ভ্রমরেরাও চলে যেতে থাকবে! এ সৌরভ সৌন্দর্যও তখন আর তোর থাকবে না! তখন কাউকে ডাকলেও কেউই আর সাড়া দেবে না—তোর ডাকে ফিরে তাকাবার জন্যে তখন কেউই আর বসেও থাকবে না! ইচ্ছে করলেও তখন আর তুই কাউকে কিছু দিতেও পারবে না! সন্ধের আঁধারে শূন্যহাতে শূন্যমনে তখন তোকেও ঝরে যেতেই হবে!

কিন্তু সেই মুখগোমড়া ফুল ওদের কারো কথায়ই কর্ণপাত করল না! নিজেকে আড়ালে লুকিয়েই রাখল।

যখন বুঝল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে! চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

সেই আবছা আঁধারে তখন সেই ফুল চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দেখতে থাকল আনন্দের হিল্লোলে নাচতে নাচতে—হাসতে হাসতে—সন্ধের মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলতে দুলতে সব প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়িরাই একটি দুটি করে ঝরে ঝরে পড়ছে!

তা দেখতে দেখতে শেষপর্যন্ত সেই মুখগোমড়া—নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখা ফুলটিকেও — কাঁদতে কাঁদতে শূন্যবুকে শূন্যহাতে ঝরে পড়তেই হল ধরিত্রীর স্নেহকোমল বুকের' পরে!

সাত রাজার ধন

সাগরের গভীর অতলে ছোট বড় পাহাড়-পর্বতের সারি। সেই পাহাড়-পর্বতমালা রঙ-বেরঙের ঝোপঝাড়ে সাজানো-গোছানো। সেখানে অজস্র নানা জাতের ছোট বড় মাছেরা রাতদিন নাচে, গায়, খেলা করে। সেই পাহাড়েই একটা খাদের ভেতর জ্বলজ্বল করছে একটি মানিক। সাত রাজার ধন।

এক কচ্ছপ আর এক কাছিম দুই বন্ধু। সেইখানে মাঝে মধ্যে বেড়াতে যায়। কচ্ছপ ও কাছিম উভয়ই উভচর প্রাণী। ওরা বহুদিন বাঁচে। ওরা দীর্ঘায়ু।

একদিন কাছিম ওর কচ্ছপ বন্ধুকে প্রস্তাব করল, বন্ধু, হাজার হাজার বছর ধরে—এই সাত রাজার ধন একটি মানিক—এখানেই পড়ে আছে। এটা কোন মানুষেরই এতটুকু উপকারে লাগছে না। চল, একদিন এটাকে মুখে করে ডাঙায় নিয়ে যাই। এবং কোন মানুষের চোখের সামনে তা মুখ থেকে বার করে রেখে আসি। তখন এই মানিক সেই মানুষটি নিশ্চয় কুড়িয়ে নেবে। তাহলে তা মানুষের বড় উপকারে লাগবে।

সেই কাছিম বন্ধুর কথা শুনে কচ্ছপ বলল, এতে আমাদের দুটি বিপদ হতে পারে।

এক ঃ লোকটি যদি ছুটে এসে আমাদের ধরে ফেলে, তখন আমাদের মৃত্যু অনিবার্য!

দুই ঃ মানিক পেয়ে লোকটি ভাববে, এই সমুদ্রের কচ্ছপ ও কাছিমের পেটে নিশ্চয়ই আরও মানিক পাওয়া যাবে এবং এ খবর চাউর হতে বেশি সময় লাগবে না। তখন সমুদ্রের চরায় ডিম পাড়তে এলেই কচ্ছপ ও কাছিমদের ধরে ধরে মানুষ গণহারে নিধন করতে থাকবে। তাছাড়া সমুদ্রে জাল ফেলে, লড়বড়শি ফেলে আমাদের ধরে ধরে পেট চিরে হত্যা করতে থাকবে, আমাদের পেটে আরও মানিক পাবার লোভে।

তাহলে তো দেখছি ভীষণ ভয়ের কথা! এই মানিক কীভাবে মানুষের উপকারে লাগানো যায়? কাছিম ওর কচ্ছপ বন্ধুকে জিগ্যেস করল।

তখন কচ্ছপ বললে, এই মানিক মানুষের কখনো কোনো উপকারেই লাগবে না। বরং এতে মানুষের চরম অপকার হবে। সাত রাজার ধন এক মানিক, এ কী চাট্টিখানি মুখের কথা! যদি তা কোন সাধারণ লোকে পায় এবং মানুষ যখন জানাবে যে, এই সাধারণ লোকটার হাতে এ ধন আছে, তখন চোর বাটপাড় তা নিতে রাতদিন ওর পেছন পেছন ঘুরঘুর করতে থাকবে—ওত পেতে থাকবে। আবার চোর বাটপাড় তা হাতাতে পারলে ওদের থেকে ডাকাত একদিন তা লুটে নেবে। ডাকাত তা বিক্রি করতে কোনো মণিমাণিক্যের ব্যবসায়ীর কাছে নিশ্চয় যাবে। আর তা শেষপর্যন্ত রাজার কানে গিয়ে পৌঁছোবে।

রাজা তা রাজকোষে নিয়ে রেখে দেবে। তাতে মানুষের কী আর উপকার হবে, বল? বরং সেই রাজা সেই মানিকের গর্বে গর্বিত হয়ে চারদিকে প্রচার করে নিজেকে সব রাজার থেকে ধনবান বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকবে। তাতে দেশের অন্য রাজারা সেই সাত রাজার ধন এক মানিক ছিনিয়ে নিতে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যুদ্ধ মানেই তো হাজার হাজার মানুষ নিধন! দেশের প্রজাসাধারণের চরম দুর্দশা! দুঃখ-কষ্ট!

ময়ূরসিংহাসন নিয়ে কত যে রক্ত ঝরল, তা তো নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করলাম। এটা তো মাত্র সেদিনের ঘটনা। শেষপর্যন্ত সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে ময়ূরসিংহাসন এখন পরম শান্তিতে আছে। ওকে নিয়ে রাজরাজড়াদেরও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বন্ধ হয়েছে।

কাজেই এইসব ধনরত্ন মণিমাণিক্য মানুষের কোনো উপকারেই আসে না। বরং এতে মানুষের চরম সর্বনাশ হয়। ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই অধিকাংশ মানুষের এই পৃথিবীর মায়া-মমতা, ধন-দৌলত, বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি, রাজ্য-রাজত্ব সবকিছু ছেড়ে চলে যেতেই হয়। তবু মানুষ নিজেকে অমর ভেবে ধন-দৌলত, জায়গা-জমি আর জাতি-ধর্ম-বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নিয়ত নেশায় মত্ত হয়ে থাকে! খুন-খারাপি করতেও কসুর করে না!

বন্ধু আমরা কাছিম-কচ্ছপ—এই মানিক—মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে —এই দুপেয়ে মানুষের আর কী -ই বা উপকার করতে পারব, বল? এসব চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেল। বরং এই সাত রাজার ধন এক মানিক—এখানেই থাকুক, এখানকার অগণিত জলজপ্রাণীদের মনে রোশনাই বিতরণ করুক। ওদের মন আলোকিত করুক। এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি এতকাল যেমন এই মানিক করছিল—অনাদিকাল তেমনিভাবে করতে থাকুক। এই সুদীর্ঘ ভাষণের পর কচ্ছপ থামল।

এতক্ষণ এই ভাষণ তন্ময় হয়ে শুনে কাছিম আস্তে আস্তে বললে, বন্ধু, এই অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো কখনো ভাবিনি, কোনদিন তা মনেও হয়নি! তোমাব কথা শুনে আজ আমি সত্যি সত্যি আমার মত বদলাম। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শাহজালালের কবুতর

মোহাম্মদ শাহজালাল গেলেন মক্কা-মদিনা। হজ করতে। একদিন রাত্রে কবুতরের মধুর কণ্ঠসঙ্গীতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুয়ে শুয়ে কবুতরের সেই মধুর সঙ্গীত একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন। কবুতরেরা আল্লাহ্‌র নাম জপছে আর তাঁর অমৃতবাণী প্রচার করছে। তা শুনে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর যতদিন মক্কা ও মদিনা ছিলেন, ততদিনই নামাজের ফাঁকে ফাঁকে কবুতরের সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহ্‌র সুললিত অমৃতবাণী শুনলেন।

তারপর, আসার সময় তিনি একজোড়া সেই কবুতর ভারতবর্ষে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেই কবুতর দুটিকে কিছুদিন খাঁচায় রেখে লালপালন করে—আশেপাশের চারদিক পরিচিত করিয়ে — শ্রীহট্টে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত পিরের দরগায় ছেড়ে দিলেন।

সেই দুই কবুতর থেকে কালক্রমে বহু কবুতরের জন্ম হল। একদিন সেই দুটি কবুতর—যাদের তিনি হজযাত্রা শেষে দেশে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিলেন — শাহ্‌জালালকে আল্লাহ্‌র অমৃতবাণী শোনাতে শোনাতে বললে, পির সাহেব, আমাদের সন্তান-সন্ততি বেড়ে বেড়ে এখন এ-ত্তো হয়েছে যে, এই দরগায় আর কুলোচ্ছে না! এ অবস্থায় আমরা এখন কী করব, কোথায় যাব?

তখন, অনেক ভেবেচিন্তে জালাল সাহেব বললেন, তোমরা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আস্তানা গাড়। যেখানেই যাবে—প্রথমেই সেখানকার দরগা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও গুরুদ্বারে নীড় বাঁধবে। তারপর প্রাসাদ, অট্টালিকা ও গৃহের ওপর দিকের নিরাপদ স্থানে নীড় গড়ে বসবাস করতে থাকবে। ভুলেও পাখিদের মতন কোন গাছে, গাছের খোঁড়লে বা ঝোপঝাড় জঙ্গলে নীড় গড়বে না। পালিত কবুতরের মতন মানুষের গড়া কোন খাঁচা বা খোপেও বন্দি হয়ে থাকবে না। সব সময় মনে রাখবে, সুললিত কণ্ঠে আল্লাহ্‌র অমৃতবাণী প্রচার করাই তোমাদের একামাত্র কাজ। আর, সেজন্যেই আমি তোমাদের এই ভারবর্ষে এনেছি। কারণ, আমার একার পক্ষে তো সর্বত্র গমন ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র অমৃতবাণী প্রচার করা সম্ভব নয়! আমার দূত হিসেবে তোমরা তা সম্পূর্ণ করবে।

আল্লাহ্ একদিন তাঁর রাতুল চরণে আমাকে ঠাঁই দেবার পরও তোমরা তাঁর অমর অমৃতবাণী বংশপরম্পরায় প্রচার করে যাবে। তোমরাও একদিন তাঁর চরণে নিশ্চয় আশ্রয় পাবে। মনে রেখো, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

এক ঃ ঈশ্বর-আল্লাহ্-গড্-এর কোন্ পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নেই। ওঁরা এক। একমেবদ্বিতীয়ম্।

দুই ঃ সব ধর্মই সমান। সব ধর্মেরই সার এক। পরধর্মে সহিষ্ণুতা পরমধর্ম। সব ধর্মের মূলেই মানবতা। মুনষ্যত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

তিন ঃ মানুষ দুই জাতি। নারী ও পুরুষ। তাছাড়া মানুষের আর কোন জাত নেই।

চার ঃ কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ ও মাৎসর্য—মানুষের দেহস্থ এই ছয় রিপু। ওদের থেকে মুক্ত থাকার নিরন্তর সাধনা করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। অপরের অনিষ্ট সাধন ও অনিষ্ট চিন্তা মহাপাপ।

পাঁচ ঃ দুঃস্থের সেবা, অসহায়ের সহায়, পরমধর্ম।

ছয় ঃ ধন-দৌলত, জীবন-যৌবন, মান-সম্মান সবই ক্ষণস্থায়ী। ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরকণিকার মতন।

সব শুনে—সেলামআলায়কুম জানিয়ে—মক্কা-মদিনা থেকে আনা সেই দুটি প্রবীন কবুতর উড়ে গেল। আর সমস্ত কবুতরকে গিয়ে পির জালালসাহেরেব নির্দেশ জানাল। সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র অমর অমৃতবাণী প্রচার করতে প্রত্যেকটি কবুতরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিল।

সেই থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে সেই কবুতরেরা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আর, আল্লাহ্‌র অমর অমৃতবাণী সুধা প্রচার করতে লাগল।

পবিত্র হৃদয় ও মনের অধিকারী যিনি—তিনি যে ধর্মের লোকই হোন না কেন—শাহজালাল সাহেবের কবুতরের কণ্ঠসঙ্গীতে আল্লাহ্‌র সেই অমর অমৃতবাণী আজও রাতদিন শুনতে পান।

মক্কা শরিফ থেকে আনা শাহজালাল সাহেবের সেই কবুতরেরা এখন জালালের কবুতর বা জালাইল্যা কবুতর নামে পরিচিত।

সাহেব

বর্ষাকালে—রামজীবনপুর সমীপুর ভাটিপাড়া গাজিরগাঁও — এইসব অঞ্চলের মাঠঘাট খেতখামার নদীনালা খালবিল জলে ডোবা থাকে। গাঁ-গুলোকে কচুরিপানার মতন জলে ভাসমান মনে হয়। আর চারদিকে সাগরের মতন জল থইথই করে।

হেমন্তকালে আবার মাঠঘাট খেতখামার নদীনালা খালবিল ভেসে ওঠে। ডাঙা উঁকি দেয়।

সেই অঞ্চলের প্রধান ফসল বোরোধান। গাঁয়ের চাষিদের সবারই কমবেশি বোরোখেত আছে। বোরোচারা যখন বেড়ে উঠতে থাকে, তখন যদ্দূর চোখ যায়—কেবল সবুজ আর সবুজ, সবুজ আর সবুজ! যেন সবুজ তুলিতে টানা মাঠের পর মাঠ তখন হাওয়া যেন সবুজ সাগরে ঢেউ তুলে নৃত্য করে!

সেই সময় কোড়াপাখি এসে ফনফনিয়ে বাড়ন্ত সেই সবুজ বোরাধানের আড়ালে আড়ালে বিচরণ করে, আর ডাহুকের মতন রাতদিন ঢুক-ঢুক ঢুক-ঢুক ঢুক-ঢুক করে বুলতে থাকে — মানে ডাকতে থাকে। কোড়াপাখি দেখতেও অনেকটা ডাহুকেরই মতন। তবে

আকারে ডাহুকের চাইতে অনেক বড় এবং অনেক শক্তিধর।

সেই অঞ্চলের অনেক সৌখিন চাষি এই কোড়াপাখি পোষে। বড় বড় পিঞ্জিরা, গামলার জলে দুতিন ইঞ্চি ডুবিয়ে, সেই পিঞ্জিরায় কোড়াপাখিকে রাখা হয়। এক একটা পিঞ্জিরায় একেকটা কোড়াপাড়ি পোষা হয়। জংলি কোড়ার মতন এরাও রাতদিন ঢুক-ঢুক ঢুক-ঢুক ঢুক-ঢুক করে বোলে।

এই পোষা কোড়াদের দিয়ে সৌখিন চাষিরা জংলি কোড়া শিকার করে। জংলি কোড়াদের ডাক অনুসরণ করে শিকারিরা পোষা কোড়াকে পিঞ্জিরাসুদ্ধ জংলি কোড়ার কাছে নিয়ে যায়। একটা খালি পিঞ্জিরাও সঙ্গে নিয়ে যায়। জংলি কোড়াকে শিকার করে ওটাকে পিঞ্জিরাবন্দি করে রাখার জন্যে।

জংলি কোড়ার কাছাকাছি গিয়ে শিকারি, পোষা কোড়ার পিঞ্জিরাটা ধানগাছের আড়ালে চুপি চুপি রেখে দিয়ে পিঞ্জিরার দুয়ার খুলে দেয়। তারপর সেই সৌখিন কোড়া শিকারি চলে আসে। এসে ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দুয়ার খোলা পেয়ে পোষাটা বুলতে বুলতে—মানে ডাকতে ডাকতে পিঞ্জিরা থেকে একসময় বেরিয়ে পড়ে।

তখন জংলি ও পোষা কোড়া দুটোই বুলতে বুলতে একটা অন্যটার কাছে উড়ে উড়ে যায়, আর ডাকতে থাকে। কাছে গিয়ে একটা অন্যটাকে নখ দিয়ে খামচে ধরে, আর ঠোঁট দিয়ে বারবার পরস্পর আঘাত করতে থাকে। এই অবস্থায় দুটোই উত্তেজনায় বারবার উড়ে উড়ে খানিকটা ওপরে উঠে আবার নিচে নামে। এবং পাখা ঝাপটাতে ঝা' 'টাতে ওরা নিচে ধাতখেতের ভেতর ধপাস ধপাস পড়তে থাকে। অবশ্য জংলি বা পোষা কোড়া কোনটাই বেশি উড়তে পারে না। ডাহুকের মতই সামান্য উঁচু দিয়ে পতর পতর করে উড়ে উড়ে যায়।

কোড়াদের স্বভাব বা ধর্ম হল, একটাকে অন্যটা একবার পায়ের নখ দিয়ে খামচে ধরতে পেলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেউ কখনো ছাড়বে না—যতক্ষণ না একটাকে অন্যটা খতম করতে পারে। এদের এই ধর্মকে পুঁজি করেই শিকারিরা জংলি কোড়া শিকার করে—মানে বন্দি করে। পোষা কোড়া জংলি কোড়াকে নখ দিয়ে ভালো করে খামচে ধরতে পেরেছে বুঝতে পেলেই—অধিক ঘায়েল করার আগে—শিকারি গিয়ে পোযা সহ জংলিটাকে ধরে ফেলে। এবং সঙ্গে আনা খালি পিঞ্জিরায় জংলিটাকে বন্দি করে, আর পোষাটাকে পোষার পিঞ্জিরায় পুরে বাড়ি নিয়ে আসে। একদিন জংলি কোড়াটাও পোষ মেনে যায়।

প্রতি বছরই এই পোষা কোড়াদের নিয়ে আশেপাশের বিভিন্ন গাঁয়ের সৌখিন কোড়াপালকেরা বেশ জাঁকজমক করে কোড়ার লড়াইয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। তখন সব গাঁয়ের লোক দলে দলে এসে কোড়ার লড়াই উপভোগ করে—আনন্দ করে।

গাজির গাঁয়ের এক কোড়াশিকারির সঙ্গে তখনকার চা বাগানের এক সাহেবের খুউব

ভাব। একদিন সাহেব বললে, ব্রাদার, টোমাদের এরিয়াটে টো আই শিপের ফাইট, বুলের ফাইট সীন করেছে, বাট কোড়া ফাইট টো সীন করটে পারছে না! ওয়ান ডে কোড়া বার্ডের ফাইট ডেখাও না?

ঠিক আছে সাহেব, আমি তোমাকে একদিন খবর পাঠাব। তখন তুমি এসো। আমি অবশ্যই তোমাকে কোড়ার লড়াই দেখাব।

তারপর অন্য গাঁয়ের কোড়ার সঙ্গে ওর নিজের পোষা কোড়ার লড়াইয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে একদিন সাহেবকে খবর পাঠানো হল। খবর পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সাহেব ঘোড়ায় চড়ে এলেন।

একটা মাঠে কোড়ার লড়াইয়ের নির্দিষ্ট স্থানটির চারদিকে দর্শকরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাহেবের জন্যে আগেই একটা চেয়ারে পাতা ছিল। সাহেব সেখানে এসে সেই চেয়ার বসলেন। দুই কোড়ার লড়াই শুরু হল।

কোড়ারা মোরগের মতই লড়াই করে। পরস্পর পায়ের নখ দিয়ে খামচে ধরে। কখনো ডানা মেলে দুটোই একসঙ্গে মাটি থেকে একটু ওপরে উঠে, আবার কখনো মাটিতে ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটে ঝাপটে লড়াই করে। ঠোঁট দিয়েও একে অন্যকে বারবার আঘাত করতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে দুটো কোড়ার মরণপণ লড়াই এভাবে চলল। দর্শকরা একটু পর পরই উল্লসিত হয়ে হর্ষধ্বনি করে উঠতে লাগল। হাততালি দিয়ে লড়াই রত কোড়াদের উৎসাহিত করতে লাগল। বিশেষ করে, যে গাঁয়ের কোড়া অন্য গাঁয়ের কোড়াকে বেকায়দায় নিচে ফেলে ওপর থেকে চেপে ধরে—সেই গাঁয়ের দর্শকরা হাততালি আর হর্ষধ্বনি করতে করতে উত্তেজনায় লাফাতে থাকে।

একসময় সাহেবের পরিচিত শিকারির কোড়াটা অন্য কোড়াটাকে অমন চেপে ধরল আর ঠোঁট দিয়ে বারবার অমন আঘাত করতে লাগল যে, নিচের কোড়াটা আর উঠতে তো পারলই না, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে হতে পা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে—মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত—মরেই গেল!

কোড়ার লড়াইয়ের নিয়মই হল, একটা কোড়া অন্যটাকে বধ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। যে কোড়া বধ করতে পারল—সেই কোড়াই বিজয়ী বলে স্বীকৃত।

সাহেব নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ এই দুই কোড়ার লড়াই নিরীক্ষণ করছিলেন। যখন বুঝলেন, একটা কোড়া অন্যটাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলেছে, তখন সাহেব ওর প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন এবং বিজয়ী কোড়াটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী কোড়াটা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সব দর্শক তখন অবাক বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাহের ওর পরিচিত কোড়া শিকারিকে জিগ্যেস করলেন, এই উইনার কোড়া বার্ডটা কার আছে?

এই উইনার কোড়াটা আমার সাহেবে, সাহেবের পরিচিত শিকারি এগিয়ে এসে বলল। আপনার কাস্টের এনিমেলকে যে এনিমেল প্লে করটে করটে ডেড না কোড়ে লিভ করে না, সেই কাস্টের এনিমেলের দিস ওয়ার্ল্ডে বেঁচে ঠাকার নো দরকার আছে! এই কথা বলে সাহেব ওর পরিচিত সৌখিন কোড়া শিকারির হাতে কোড়াটার তখনকার মূল্যের বহুগুণ মূল্য গুঁজে দিয়ে ঘোড়ায় উঠে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

ধর্মের ষাঁড়

তখন গভীর রাত। আকাশে থোকা থোকা পেঁজাতুলো মেঘ। মেঘের ফাঁকে আধখানা বাঁকা চাঁদ আর তারারা জোছনা ছড়াচ্ছে। নিচে আকাশের তলে — উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ। ১৯০১ সালে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাজপ্রাসাদের নামকরণ করেছিলেন 'উজ্জয়ন্ত'।

এই 'উজ্জয়ন্ত' রাজপ্রাসাদের সামনে দুটি বিরাট দিঘি। সেই দিঘির স্ফটিকজলে সেই প্রাসাদের প্রতিবিম্ব — হাওয়ায় হাওয়ায় জোছনা ছড়ানো ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্য করছে।

পুবদিকের দিঘির দক্ষিণপারে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। সেইজন্যে পুবদিকের দিঘিটি 'লক্ষ্মীনারায়ণ দিঘি' নামে খ্যাত। সেই লক্ষ্মীনারায়ণ দিঘির পুবপারে একটি পিচমোড়া চাওড়া রাস্তা। রাস্তার পুবদিকে বহুলোকের বাস। সবাই তখন গভীর ঘুমের অতলে।

মাঝ রাস্তায় শুয়ে শুয়ে দুটি ধর্মের ষাঁড় আপন মনে যাবার কাটছে। একটি ষাঁড় বুড়ো। অন্যটি তরুণ। ওদের চোখে শুধু ঘুম নেই।

বুড়ো ষাঁড়টি তরুণ ষাঁড়টিকে বললে, কেমন আছিস রে? দিনগুলো তোর কেমন কাটছে?

খুউব ভালো আছি। বড়ই আরামে আর মহানন্দে আমার দিনগুলো কাটছে। কত জন্মের পুণ্যের ফলে যে এই ধর্মের ষাঁড় হতে পেলাম, সে একমাত্র বিধাতাই জানেন। মানুষেরা আমাকে ক-ত ভক্তি করে, ক-ত শ্রদ্ধা করে। মানুষেরা মহাদেবের ভক্ত বলে আমাকেই

দেবজ্ঞানে পুজো করে। কত কিছু যে ভক্তিভরে খেতে দেয়, এর তো আর লেখা জোখাই নেই! আম জাম কলা লিচু কাঁঠাল আনারস কমলা আঙুর আপেল — কোন ফলমূলই বাদ যায় না। হরেকরকম আনাজপাতি তরিতরকারি, রকমারি মিষ্টি—যেমন রসগোল্লা সন্দেশ জিলিপি বোঁদে কাঁচাগোল্লা বরফি ইত্যাদি। চাল ডাল গম যতকিছু মুখরোচক লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী, কত আর বলব! সে কি আর বলে কয়ে শেষ করা যাবে।

ঘাসপাতায় আর মুখ ছোঁয়াতেই হয় না। ভক্তিভরে দেওয়া ভক্তদের এসব খেতে খেতেই পেট ভর্তি হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে রুচি পাল্টাতে ইচ্ছে করলে—তাতেও কোন বাধা নেই। চাষিরা ভক্তিভরে আমাকে ওদের খেতের ফসল খেতে দেয়।

একদিন, এক চাষির কচিধান খেয়ে খেয়ে পেট ভরলাম। ভক্তিভরে চাষি খেতের আইলে দাঁড়িয়ে রইল, আর বলতে লাগল, বাবা মহাদেব! তুমি সাধ মিটিয়ে খেয়ে যাও। আমি আবার ধানচারা পুঁতব। শুধু আশীর্বাদ করে যেয়ো, আমার সব খেতে যেন এবার সোনার ফসল ফলে।

আর একদিন। এক চাষির খেত থেকে ফুলকপি বাঁধাকপি পালংশাক পেট ভরে খেলাম। সেই চাষি আমাকে তো তাড়ালেই না, বরং পরমভক্তের মতন দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বারবার বললে, বাবা মহাদেব! প্রাণভরে খেয়ে যাও, আমি আবার এসব চাষ করতে পারব। শুধু দয়া করে যেয়ো, এবার যেন ফসলের প্রচুর দাম হয় এবং আমার খেতগুলোতে যেন প্রচুর ফলন হয়।

একবার, খেতে খেতে পেটে আর জায়গা নেই। তখন হাগু করে, পেচ্ছাব করে পেট খালি করলাম। চাষি আর চাষিগিন্নি করলে কী—সেই হাগু আর পেচ্ছাব মাটিতে মিশিয়ে ওদের সমস্ত খেতে ভক্তিভরে ছড়িয়ে দিলে—সব খেতে সোনার ফসল ফলার জন্যে!

এর চাইতে সার্থক, ধন্য, মধুময় জীবন আর কী হতে পারে, দাদু! এ তো বহু জন্মের পুণ্যেরই ফল! তরুণ ষাঁড় আনন্দে উদ্বেল হয়ে বললে।

বুড়ো ষাঁড় এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তরুণ ষাঁড়ের কথা শুনছিল। এবার আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ ভাই, আমারও একদিন তাই মনে হতো। তোর মতই ভেবে ভেবে আমিও একদিন আনন্দ পেতাম, আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। কিন্তু আজ আর আনন্দ পাইনে। আত্মপ্রসাদের বদলে কান্নায় বুক ফেটে যায়।

কেন? কেন দাদু? তরুণ অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে জানতে চাইল।

আজ আর বলে কী হবে। শুধু তোকে অনর্থক এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা। জীবনে যতটুকু আনন্দ কুড়নো যায় — সে-ই তো লাভ। পরম পাওয়া। বাদ বাকি সবই তো লোকসানের ঘরে, বুড়ো বললে।

তবু বল, আমি শুনতে চাই, আমি শুনব। তরুণ বয়সে শুনলে হয়ত তোমার অভিজ্ঞতা

আমার একদিন কাজে আসবে। হয়ত ভবিষ্যতে আমার অনেক উপকারে আসবে, তরুণ বলল।

দেখ্ ভায়া, আজ এই বুড়ো বয়সে মরণের দিন গুনছি। যার জন্ম হয়, মৃত্যুও তার অনিবার্য। কিন্তু আমার এ জীবন কি কারো কোন কাজে লাগল ? কারো কি এতটুকু উপকারে লাগতে পারলাম ? খাচ্ছি-দাচ্ছি দিব্যি আছি। মানুষের পুজো পেয়ে পেয়ে, মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে পেয়ে সারাটা জীবন শুধু গায়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঘুরে ফিরে ঘুমিয়ে গড়িয়ে কাটিয়েই দিলাম, নিঃশেষ করে দিলাম। অহেতুক পৃথিবীর বোঝা—নিষ্ফলা ব্যর্থ এ জীবন। আমিও একদিন মানুষের ফলন্ত শস্য, শাকসবজি কতই না খেয়েছি, মানে প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসই তো করেছি!

একবার, জন লেগারডো নামক এক কৃষকের কপিখেত খেয়ে খেয়ে ধ্বংস করেছিলাম। সেও আমাকে ভক্তিভরে খেতে দিয়েছিল। ধর্মে সে খ্রিস্টান। কিন্তু হিন্দুর দেবতা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি সে ছিল শ্রদ্ধাশীল, অনুরক্ত।

আরেকবার, দিলাল মিয়ার ফলন্ত ধানখেত খেয়ে খেয়ে সাবাড় করেছি। দিলাল মিয়া মুসলমান হয়েও—আমি শিবঠাকুরের ভক্ত বলে আমাকে সম্মান করেছে, খাতির করেছে । আমাকে না তাড়িয়ে সাধ মিটিয়ে খেতে দিয়েছে।

আবার একবার, নৃপেন বড়ুয়ার ডাঁটা খেতের বেড়াগোড়া ভেঙেচুরে সেই কচি কচি ডাঁটা খেয়েখুয়ে গোটা ডাঁটা খেত তছনছ করে দিয়েছিলাম। সে ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তবু সে আমাকে যথেষ্ট খাতির করেছে। লাঠি হাতে তাড়া করা তো দূরের কথা, সাধ মিটিয়ে খেতে দিয়েছে।

অমনিতে ধর্মে-ধর্মে, বর্ণে-বর্ণে জাতিতে-জাতিতে মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। কিন্তু আমার বেলা সব মানুষই যেন এক —সবাই যেন সব ধর্মে নত। হয়ত ওরা ভেবেছে, আমি খেয়ে সন্তুষ্ট হলে ওদের খেতে সোনার ফসল ফলবে। ওদের আশাতীত লাভ হবে। আসলে ওরা সবাই ধর্মীয় সংস্কারের বশীভূত। ধর্মান্ধ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোনার ফসল কি ফলেছিল ? কোন লাভ কি ওদের হয়েছিল ?

এ হল ধর্মান্ধ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস। বাস্তবে তো ওদের ক্ষতিই হয়েছে। আর আমিই সেই ক্ষতির মূল কারণ। এই যে মানুষ আমাদের ফলমূল শাকসবজি রসগোল্লা-সন্দেশ ভক্তিভরে মন উজাড় করে দুহাত ভরে খেতে দেয়। এতে কি ওদের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয় ? অন্ধ-বিশ্বাসের কূপমন্ডুক ধারণার বশবর্তী মানুষ আমাদের দেবজ্ঞানে, শিবজ্ঞানে ভক্তি করে যাচ্ছে, পুজো করে যাচ্ছে। এতে আমরা মানুষের ক্ষতি বই কোন উপকারেই আসছি না । রাস্তার বখাটে ষাঁড় হয়েও —দেবতার ভান করছি, নৈবেদ্য কুড়োচ্ছি, পুজো গ্রহণ করছি।

যদি কোন চাষি আমাদের কাঁধে জোয়াল তুলে হালচাষ করাত, কোন গাড়োয়ান গাড়ি টানাত, তবে তো হালচাষ করতে পেতাম, মাল টানতে পেতাম—সওয়ারি বইতে পেতাম! তাহলে তো জীবনটা পূর্ণতা লাভ করত!

আমাদের তো কসাইরাও স্পর্শ করবে না! আমাদের মাংস—মানুষ খাবে তো দূরের কথা — কেউ ছোঁবেও না!

অমন কি, আমরা মরলে শেয়াল-কুকুর কাক-শকুনও খেতে পাবে না! গায়ের চামড়া পর্যন্ত কেউ ছোঁবে না! চর্মকার চামড়া দিয়ে নানা বস্তু, ব্যাগ, জুতো গড়বে তো দূরের কথা!

আমরা মরলে ভক্তরা ফুল-চন্দন দিয়ে ধূপধুনো প্রদীপ জ্বালিয়ে ভক্তিভরে যথাযোগ্য সম্মান পূর্বক গাড়িতে উঠিয়ে — লবণ-টবন যথেষ্ট পরিমাণে ঢেলে কবরস্থ করবে । এবং যাতে শেয়াল-কুকুরে সন্ধান না পায়, সেজন্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে কবরের মাটি উঁচু করে দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করে দেবে!

তবেই ভেবে দেখ্ ভায়া, আমাদের জীবনের মতন অমন ফেলনা জীবন কি আর এ জগতে কারো আছে? এই বলে বুড়ো ষাঁড় দুঃখ-কষ্ট শোক-তাপ অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে ডুকবে ডুকরে কাঁদতে লাগল। আর বুড়ো ষাঁড়ের মুখে এসব কথা শুনে তরুণ ষাঁড়ও হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

ষাঁড়ের ডুকরে ডুকরে কাঁদা আর হাউমাউ করে কাঁদা—সবই চিৎকারের সামিল। সেই দুই ধর্মের ষাঁড়ের চিৎকারে পাশের বাড়িঘরের মানুষদের কাঁচাঘুম ভেঙে গেল। একতলা দোতলা তিনতলা দালানকোঠার রুমে রুমে আলো জ্বলে উঠল। কেউ জানালা খুলে, কেউ দুয়ার খুলে, কেউ বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই রাত্রি নিশীথে এই দুই ধর্মের ষাঁড়ের গগনভেদী চিৎকার অবাক হয়ে শুনতে লাগল!

তাই দেখে বুড়ো ষাঁড় কান্না থামিয়ে তরুণ ষাঁড়কে বললে, থাম্, থাম্, এবার থাম্ রে ভাই! কাঁদতে কাঁদতে মানুষের রাতের আরামের ঘুমটা পর্যন্ত ভেঙে দিলাম! মানু[illegible] আর কত ক্ষতি করব রে, বল? সারাজীবন যে শুধু মানুষের সর্বনাশই করে গেলাম, আজ হাতে হাতে এর প্রমাণ পেলি তো?

হ্যাঁ, দাদু!

এই বলে ধর্মের তরুণ ষাঁড়টাও চুপ মেরে গেল। তখনো দুই ষাঁড়ের চোখ দিয়ে আঝোরে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছিল ।

কাকভুশুণ্ডির কড়চা

জনপ্রিয় নেতা অর্থাৎ কাকপ্রিয় নেতা একদিন দুপুরে রাজ্যের সব কাককে এক জরুরি কাকসভায় হাজির হতে আহ্বান করল। তাই সেদিন দুপুরে ত্রিপুরা রাজ্যের বগাফার গাছে গাছে খালি কাকা আর কাক! কাকে কাকে সমস্ত গাছ কালো হয়ে গেছে! গাছের পাতা ফুল ফল সব কাকে কাকে ছয়লাপ! কাক ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কাকপ্রিয় নেতা সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একটা সব চাইতে উঁচু গাছের মগডালে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল।

কাক-সমাজের ভদ্র মহোদয়, ভদ্র মহিলাগণ, উপস্থিত সাথি,আত্মীয়স্বজন, মা-ভাই-বোন সব, আমার প্রত্যেকটি কথা অনুগ্রহ পূর্বক সহানুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করে সবাই তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন। তাছাড়া আমাদের এই দলিত কাকদের আর লাঞ্ছনা গঞ্জনা বঞ্চনা হেনস্তা দমন-পীড়ন— মোট কথা দুঃখ কষ্ট ও দুর্দিন ঘুচবার নয়! আমরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে, সবার মঙ্গলের জন্যে সামান্য একটি পাখি হয়ে — কী না করি, আর করে যাচ্ছি! আজ, এইবেলা, দয়া করে ধৈর্য ধরে প্রিয় সাথিরা আমার কথা একটু শ্রবণ করুন, আমি একটি একটি করে আমাদের দুঃখ ও বঞ্চনার কাহিনি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

এক ঃ প্রতিদিন ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টিবাদল বরফ জমানো হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে করে ভোর হতে না হতেই সবার দুয়ারে দুয়ারে আমরা কাকেরা ভোরের খবর পৌঁছে দিই। ভোরের খবর পৌঁছে দিই কিনা?

সভায় উপস্থিত সব কাক একসঙ্গে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, হ্যাঁ ,হ্যাঁ, আমরা সবার দুয়ারে দুয়ারে ভোরের খবর পৌঁছে দিই, ভোরের খবর পৌঁছে দিই।

দুই ঃ রাজ্যের যত পচাগলা নোংরা আবর্জনা স্তূপীকৃত অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে গোটা রাজ্য আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখি, রাজ্যকে দূষণমুক্ত করে বায়ুদূষণের হাত থেকে রক্ষা করি। রক্ষা করি কিনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজ্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখি, রাজ্যকে বায়ুদূষণের হাত থেকে রক্ষা করি, বায়ুদূষণের হাত থেকে রক্ষা করি। সভার মধ্যে থেকে সমবেত কাকের কণ্ঠে তীব্র চিৎকারে তা ধ্বনিত হল।

তিন ঃ লোকালয়ের সন্নিকটের কোন ঝাড়জঙ্গলে কোন হিংস্র জন্তুজানোয়ার যেমন, বাঘ সিংহ ভল্লুক অজগর ইত্যাদি তাঁবু গাড়লে — সেই তাঁবুর ওপরে উড়ে উড়ে চিলচিৎকারে আমরা সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিই। সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিই কিনা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিলচিৎকারে আমরা সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিই, হুঁশিয়ার করে দিই। সভার ভেতর থেকে সমবেত কাকের কণ্ঠে সচিৎকারে তা ধ্বনিত হল।

চার ঃ উই পিঁপড়ে সব্বোনেশে প্রাণী। দিন দিন বংশবিস্তার করে করে সব্বোনাশের মাত্রাও বাড়াতে থাকে। তারপর আকাশটাকেও দখল করার মতলবে পাখা মেলে মেলে আকাশে সগর্বে সদলবলে উড়তে থাকে। তখন সেই পাখা গজানো উড়ন্ত উই পিঁপড়েদের খেয়ে খেয়ে নির্মূল করে রাজ্যর যত মূল্যবান ধন-সম্পদ রক্ষা করি। রক্ষা করি কিনা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাখা গজানো উড়ন্ত বেয়াদপ উই পিঁপড়েদের খেয়ে খেয়ে রাজ্যের যত মূল্যবান ধন-সম্পদ রক্ষা করি, মূল্যবান ধন-সম্পদ রক্ষা করি। সভার ভেতর থেকে সমবেত কাকের কণ্ঠে সুতীব্র চিৎকারে তা ধ্বনিত হল।

পাঁচ ঃ কারো কোন অমঙ্গলের হদিশ পেলে ঠিক দুপুরবেলা নিরিবিলি সময় কা- কা কা -কা কা -কা কা-কা করে বারবার ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে আমরা কাকেরা তাদের আগাম পূর্বাভাষ দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিই। আগাম পূর্বাভাষ দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিই কিনা ?

হ্যাঁ , হ্যাঁ, আগাম পূর্বাভাষ দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিই, হুঁশিয়ার করে দিই। সভার ভেতর থেকে সমবেত কাকের কণ্ঠে সুতীব্র চিৎকারে তা ধ্বনিত হল।

ছয় ঃ এই যে কোকিল—যার গান শোনার জন্যে সারা রাজ্যের আবালবৃদ্ধবণিতা তরুলতা তৃণগুল্ম সারা বছর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে, সেই কোকিলের ডিম কিন্তু আমরাই তা দিয়ে দিয়ে ফোটাই এবং আমাদের নিজের প্রিয় ছানাদের খাবারের ভাগ দিয়ে কোকিলের বাচ্চাদের লালনপালন করে বড় করে মানুষ করি। কোকিলের বাচ্চাদের লালনপালন করে বড় করে মানুষ করি কিনা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোকিলের বাচ্চাদের লালনপালন করে বড় করে মানুষ করি, লালনপালন করে বড় মানুষ করি। সভার ভেতর থেকে সমবেত কাকের কণ্ঠে তা সুতীব্র চিৎকারে ধ্বনিত হল।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বেদনার উপাখ্যান, খুবই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, আমাদের এই পরোপকারী পরহিতৈষী কাকেদের কেউই দেখতে পারে না। কেউই সহ্য করতে পারে না। আমরা কাকেরা যেন সবাই—সবার দুই চক্ষের বালি।

তদুপরি আবার আমাদের কেউ খেতেও দেখতে পারে না। কেউ আমাদের খেতে

দেওয়া তো দুরস্থ। অথচ শালিক চড়াই কবুতরকে কত কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেতে দেয়। মুঠো ভর্তি করে করে আদরে সোহাগে ওদের খেতে দিতে থাকে। সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া খাবার থেকে কখনো যদি দু'একটা দানা মুখে তুলতে যাই,অমনি দূর-দূর করে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে, কুকুর লেলিয়ে দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে! নোংরা আবর্জনা পচাগলা খেতে গেলেও তেড়ে আসে! আমরা নাকি ঘরদোর উঠোন বাড়ি রাস্তাঘাট সব নোংরা করে ফেলছি!

দুপুরবেলা কোন অমঙ্গলের পূর্বাভাষ দিয়ে কাউকে সাবধান করে দিতে গেলেও আমাদের 'অলক্ষুণে কাক' বলে তিরস্কার করতে করতে হায়—ঢিল ছুঁড়ে মারে ! ভাগ-ভাগ করে ভাগিয়ে দেয়।

ভাই সব, সাথি সব, মা-বোন সব, আমরা এত অপমান, এত নির্যাতন, এত হেনস্তা, এত পদদলন আর সহ্য করব না, সব কিছুই সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে! ওদের লাগাতর পদদলন নিষ্পেষণেই আজ আমরা অপাঙক্তেয়— শূদ্র—দলিত!

রাজ্যের মাননীয় জনদরদী মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাব। আমাদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগকে, জনসেবাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের কাকেদের নায্য পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে। আমাদের কাকেদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। নতুবা আমরা কাকেরা লোকালয় ত্যাগ করে গভীর বনে চলে যাব। কোনদিন সেই গভীর বন থেকে আর লোকালয়ে ফিরে আসব না। দু'পেয়ে মানুষের উপকার করতে নেই! ওরা অন্যের কাজের প্রকৃত মূল্য দেয় না, দিতে জানে না! নিজেদের স্বার্থ ছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে না, বুঝতে চায় না! অমন কি, ওরা নিজেদের মধ্যকার জ্ঞানী গুণী সৎ মহৎ লোকদেরও যথাযোগ্য মূল্য দেয় না! ওদের আত্মচিন্তা চমৎকারম্!

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এ-ত যে বছর হয়ে গেল, ওরা কি মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে? জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ ঘোচাতে পেরেছে? বরং ব্যবধান আরও হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে! সেদিকে কি নেতাদের কোন দৃষ্টি আছে? না, দৃষ্টি দেবার ইচ্ছে আছে? দেশের লোটেরা নেতারা বুলি সর্বস্ব! মুখোশ পরা! আত্মসুখী!

কাজেই, চাপ সৃষ্টি করে ওদের কাছ থেকে নায্যদাবী আদায় করতে হবে। চাপ সৃষ্টি না করলে, একজোট হয়ে শক্তি প্রদর্শন করতে না পারলে, ওদের টনক নড়বে না। কিছুই পাওয়াও যাবে না! এরা সজ্ঞানে আমাদের এক কপর্দকও ছুঁড়ে দেবে না! আমরা—দলিত কাকেরা—অনাদিকাল ওদের পদদলিত হয়েই থেকে যাব!

কিন্তু এও ঠিক, আমরা নিজের থেকে কোনদিন ওঁর কাছে—মানে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাবও না— কিছু চাইবও না। ওকে নিজেই উদ্যোগী হয়ে দূত পাঠিয়ে আমাদের কাকেদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে সমাদর করে নিয়ে যেতে হবে। তবেই কেবল যাব। না হলে নয়।

সেটা কী করে সম্ভব ? যদি আমাদের সমস্যার কথা, দুঃখ-কষ্টের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতেই না পারেন, তবে আমাদের সমস্যা সমাধান করবেন কেমন করে ? দুঃখ-দুর্দশাই বা দূর করবেন কী উপায়ে ? সভার ভেতর থেকে বেশ কিছু সংখ্যক কাক চিৎকার করে বলে উঠল।

আছে, আছে, এরও সুগম পথ আছে। শোনেন তবে, তাহলে বলি ঃ

প্রথম ক'দিন আমরা কাকেরা আর দুয়ারে দুয়ারে ভোরের খবর পৌছে দেব না। তাতে যদি কাজ না হয়, আমরা লোকালয়ে হিংস্র জন্তুজানোয়ার ওত পেতে বসে থাকলেও— উড়ে উড়ে ডেকে ডেকে ওদের কাউকে হুঁশিয়ার করে দেব না। উড়ন্ত উই পিঁপড়ে ধরে ধরেও খাব না। কোন অমঙ্গল জেনেও কাউকে আগাম হুঁশিয়ার করে দেবে না। কোকিলের ডিমেও তা দিয়ে দিয়ে কোকিলের বাচ্চা ফোটাব না।

আর, তাতেও যদি কাজ না হয়, আমরা পচাগলা নোংরা-আবর্জনা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে রাজ্যের দুর্গন্ধ দূর করব না, রাজ্য পুঁতিগন্ধময় নরক হয়ে উঠুক। রাজ্যের নির্মলবায়ু বায়ুদূষণে দূষিত হতে থাকুক। মানুষের মধ্যে মড়ক লাগুক।

তবে আমরা কী খেয়ে বাঁচব ? সভার মধ্যে থেকে কয়েকটি কাক গলাফাটানো চিৎকারে বলে উঠল।

কাকপ্রিয় নেতা তখন সভাকে শান্ত করে, সবাইকে আশ্বস্ত করে বলল, আমরা গাছের ফল খাব, খেতখামারের শস্যদানা খাব, শাকসবজি ফলমূল খাব। শঙ্খচিল চিল গাঙশালিক মাছরাঙাদের মতন খালনালা বিলঝিল নদনদীর মাছ ধরে ধরে খাব। বনজঙ্গলের নানা বুনোফল খাব, পোকামাকড় ধরে ধরে খাব। বনের পাখিরা কি অনাদিকাল ধরে বনজঙ্গলে বেঁচে আছে না ?

আ-র, তাতেও যদি কাজ না হয়, লোকালয় ত্যাগ করে চিরকালের মতন বনে চলে যাব। তবুও কোনমতেই আগ বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছুতেই মুখ খুলতে যাব না, হাত পাততে যাব না! কোনভাবেই কাকেদের মাথা হেঁট হতে দেব না!

তরপর, কাকপ্রিয় নেতা সভায় উপস্থিত সমস্ত কাকদের উদ্দেশে বলল, এই প্রস্তাব যারা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন, অনুগ্রহ করে হাততালি দিয়ে সমর্থন প্রকাশ করুন। এবং হাত তুলে দাঁড়ান!

তখন সভার প্রতিটি কাক হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। হাততালির ঝড়োশব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। তারপর সবাই হাততুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সবাইকে হাততুলে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে—কাকপ্রিয় নেতা ভরসা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জোরগলায় ঘোষণা করল, আগামীকাল থেকেই দুয়ারে দুয়ারে আমাদের ভোরের খবর পৌছে দেওয়া বন্ধ থাকবে।

সুতরাং পরের দিন থেকেই কাকেরা দুয়ারে দুয়ারে ভোরের খবর পৌঁছে দেওয়া বন্ধ করে দিল।

এদিকে আবার রাজ্যের অন্যান্য পাখিরাও এ ব্যাপারে কাকেদের পূর্ণ সমর্থন জানাল। অতএব পরের দিন ভোর থেকে গাছে গাছে পাখিদের কলকাকলিও বন্ধ হয়ে রইল।

অপরদিকে, ভোরের কাকের ডাক শুনে, পাখিদের কলকাকলি শুনে, ভোর হয়ে গেছে বুঝে, ঘুম থেকে উঠে রাজ্যের যত চাষিরা খেতখামারে যায়, জেলেরা, শাকসবজি ও মাছ বিক্রেতারা, রাজ্যের কামলারা, রাজ-জোগাড়েরা—যে যার নিজের নিজের কাজে যায়—কাজের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। আবার সাধারণ মানুষ ও অফিস-কাছারির কর্মচারী থেকে হাকিমসাহেব পর্যন্ত অনেকেরই এই কাকের ডাক আর পাখির কলকাকলি শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙার অভ্যেস । তা শুনে কারো কারো আবার প্রাতঃভ্রমণে বেরোবারও অভ্যেস।

অমন কি, যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী —ওঁরও এই কাকেদের ভোরের সঙ্গীত ও পাখিদের কিচিরমিচির গান শুনতে শুনতেই ঘুম থেকে ওঠার সেই ছোটবেলার অভ্যেস।

ভোরে কাক না ডাকায় , গাছে গাছে পাখিরা কিচিরমিচির মধুর সঙ্গীত বন্ধ করে দেওয়ায়, গোটা রাজ্য জুড়ে সর্বত্র সবারই একটা মহা অসুবিধের সৃষ্টি হল। রাজ্যজুড়ে আপামর জনসাধারণ মহাদুশ্চিন্তায়, দুর্ভবনায় পড়ল।

এইভাবে একদিন দুদিন তিনদিন যখন পেরিয়ে গেল, তখন গুপ্তচর নিয়োজিত করে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাকেদের সংগ্রামের সব তথ্য অতি গোপনে সংগ্রহ করলেন। এবং চতুর্থ দিনের দিনই ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গুপ্তচর দ্বারা সংগৃহীত কাকেদের সংগ্রামের সমস্ত গোপনীয় তথ্য ফাঁস করলেন। তারপর , তা মন্ত্রীগণ সেই সভায় বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এবং সিদ্ধান্তও নিলেন।

মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সর্বসম্মত সেই সিদ্ধান্তক্রমে ক্যাবিনেটে আরও একটি মন্ত্রীপদ সৃষ্ট করা হল। কাকেদের দলপতি কাকপ্রিয় নেতার জন্যে। সেদিনই দূত মারফৎ যথাযাগ্য সম্মান পূর্বক পত্রদ্বারা কাকেদের দলপতি কাকপ্রিয় নেতাকে তা জানিয়েও দেওয়া হল।

কাকপ্রিয় নেতাও কালবিলম্ব না করে সেই শুভসংবাদ তখন-তখনই কাকেদেরও জানিয়ে দিলে।

পঞ্চম দিন থেকে আন্দোলন উঠে গেল। আর পঞ্চম দিন থেকেই কাকেরা আবার

আগের মতন ভোর হতে না হতেই দুয়ারে দুয়ারে ভোরের খবর পৌঁছে দেওয়া শুরু করে দিল। গাছে গাছে পাখিরাও আবার আগের মতন কিচিরমিচির মনমাতানো সুরে সুর মেলে গান গাইতে শুরু করল।

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার এই কাকপ্রিয় দলিত নেতার দলিত দরদী আত্মত্যাগী ও বহুবিধ মহৎগুণের জন্য ওকে 'কাকভুশুণ্ডি' অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী-কাক উপাধিতে ভূষিত করল।

কাকেদের এই কাকপ্রিয় নেতার 'কেবিনেট মন্ত্রীপদ' ও 'কাকভুশুন্ডি' সম্মান পাওয়ার আনন্দে আনন্দে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

তারপর, নানা অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট দমন-পীড়ন অত্যাচার-অনাচারের করুণ কাহিনির মর্ম বেদনা জানানোর জন্যে ও উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য মাননীয় কাকভুশুন্ডির কাছে কাকেরা দলে দলে আসতে লাগল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, নানান অসুস্থতার অছিলায়, আর কাকেদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়ের আষাঢ়ে সগ্‌পো ফেঁদে মাননীয় কেবিনেট মন্ত্রী কাকভুশুন্ডি প্রায়ই রাজ্যের বাইরে কাটায়! নিন্দুকেরা বলে কাকভুশুণ্ডি আসলে সরকারি অর্থে, মানে কাক সাধারণের অর্থে, সপরিবারে প্রমোদভ্রমণের আনন্দ লোটায় মশগুল হয়ে দিন যাপন করে!

আর, যখনই বা কাকভুশুন্ডি রাজ্যে অবস্থান করে, গেটে ঝুলানো সাইনবোর্ডে উল্লেখিত সকালের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লাইন দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে করে কাকেরা হয়রাণ হয়ে বিফল মনোরথ হয়ে বিষণ্ণ মলিন মুখে ফিরে যায়! কারণ, মাননীয় কেবিনেট মন্ত্রী কাকভুশুন্ডির তখনো ঘুমই ভাঙে না!

কাজেই কাকেদের জীবন আগে যেমন চলছিল এখনো তেমনি চলছে। কোন হেরফের নেই। এ জন্যে অবশ্য এখন আর কেউ উচ্চবাচ্যও করে না। কারণ যেহেতু এই দুঃখ-কষ্ট হতদরিদ্র দুর্দশাময় বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-দলিত জীবন অনাদিকাল ধরে সহ্য করতে করতে কাকেদের তা গা- সওয়া হয়ে গেছে।

চুনী দাশের 'হুকুমচাঁদের পরমকথা' সম্পর্কে

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
REGIONAL OFFICE
4 D L Khan Road, Kolkata 700 025
Phone : (033) 24191683, 24191706
Fax : (033) 24191684
E-mail : regsecy @ vsnl.net
Website : http:/www.sahitya-akadami.org.

ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায়
আঞ্চলিক সচিব

এস. এ. ই. ১২২/আর. কে. এম./৭৭০৮ ৮ অক্টোবর, ২০১০

শ্রীচুনী দাশ
ধলেশ্বর নতুন পল্লী
রোড নং ৭
আগরতলা ৭৯৯ ০০৭
পশ্চিম ত্রিপুরা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার লেখা লোকগল্পের বইটি পড়লাম। পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। যা বেশি ভাল লেগেছে তা হল আপনি কথনগদ্যের আসল রূপটি বজায় রেখেছেন। আপনার এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

নমস্কার জানাবেন।

ইতি
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৩০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত দেড়শো বছরের বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের ধারাবাহিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাসম্ভারে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলোর ফুলকি নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে। সেই সংকলনে চুনী দাশের ছড়া সংকলিত হয়।

•

সন্দেশে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ রচনারাজিতে অলংকৃত সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায় ১৩৮৮ সালে সেরা সন্দেশ প্রকাশিত হয়। তাতে চুনী দাশের ছড়াও স্থান পায়।

•

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ছোটদের ত্রৈমাসিক ছড়াপ্রধান পত্রিকা টুকলু-তে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের ছড়াকার ও কবিদের চার শতাধিক ছড়াও কবিতার মধ্যে ১৯৯৭ সালে চুনী দাশের ছড়া সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়।

•

চুনী দাশের পরিচালনায় আগরতলা থেকে ছোটদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা কাকলি ১৯৭০ থেকে ১৯৯১ একটানা ২১ বছর প্রকাশিত হয়।

•

২০০৭ সালে কাব্য ও শিশু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ত্রিপুরা সরকার চুনী দাশকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে।

•

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিক বিখ্যাত ছোটদের কথা-র 'শারদ সংবর্ধনা ২০১১' দিয়ে চুনী দাশকে সম্মানিত করা হয়।

•

১৯৫৮ থেকে চুনী দাশের ছড়া, কবিতা ও গল্প— চুনী দাশ ও প্রবীর দাশ এই দুই নামে নিম্নে উল্লেখিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সন্দেশ, রামধনু, ছোটদের কথা, কিশোর জগৎ, পাঠশালা, শিশুসাথী, মৌচাক, শ্রীচরণেষু, কিশোর ভারতী, শুকতারা, শিক্ষক, টুক্‌লু, কেকা, সঞ্চিতা, তেপান্তর, সুসাথী, ছোট নদী, অদল-বদল, ছোটদের কচিপাতা, যুগান্তর (পাততাড়ি), দৈনিক বসুমতী (ছোটদের পাতা), মাসিক বসুমতী (কিশোর জগৎ) প্রভৃতি।

ত্রিপুরা ঃ কাকলি, উদিতি।